প্রকাশক ঃ
শ্রীবিধুভূষণ দাসগুপ্ত
দাসগুপ্ত প্রকাশন
৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কতিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ ঃ
অক্টোবর ১৯৫৯

মুদ্রক ঃ
শ্রীরাধারমণ বসাক
শ্রীকান্ত প্রেস
১৭৫ বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা ৯

৺হৃদয়নাথ দত্ত

আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব

গান্ধীজির প্রতি বিরূপ থাকা সত্ত্বেও

আমাকে গান্ধী অনুরাগী করিয়া মানুষ করিয়াছেন

সেই পুণ্য

পিতৃ-স্মৃতির

উদ্দেশ্যে

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি

বিনম্র শ্রদ্ধায়

উৎসর্গ করিলাম।

সূচীপত্র





প্রার্থনারত গান্ধীজী

শিল্পী—শ্রীনন্দলাল বসু

ছাত্রজীবন

স্কুলে পড়িবার সময়েই গান্ধীজি শিক্ষালাভ করেন— সত্য যে বলিতে চাহে এবং সত্য যে পালন করিতে চাহে তাহার অসাবধান হওয়া চলে না। ব্যাপারটা এই ঃ গান্ধীজির ব্যায়ামের অভ্যাস ছিল না। প্রচলিত ব্যায়াম করিতে তিনি উৎসাহ পাইতেন না। কিন্তু তিনি যে স্কুলে পড়িতেন সেখানে ব্যায়ামের ক্লাসে যোগদান করা আবশ্যিক ছিল। একদিন গান্ধীজি ঐ ক্লাস হইতে ছুটি চান। প্রধান শিক্ষক দোয়াবজী এতুলজী গীমী খুব কড়া লোক ছিলেন। ছুটি মঞ্জুর হইল না। কিন্তু বর্ষাবাদলের মধ্যে সময় ঠিক করিতে না পারিয়া গান্ধীজি ঐ দিন ব্যায়াম-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, ছুটি হইয়া গিয়াছে। তিনি অনুপস্থিত হইয়া গেলেন এবং ইহার জন্য তাঁহার এক আনা কি দুই আনা জরিমানা হয়। প্রধান শিক্ষক গান্ধীজির কথা বিশ্বাস করিলেন না। গান্ধীজির মনে হইল এ জরিমানা জমা দেওয়ার অর্থ হইল নিজেকে মিথ্যাবাদী বলিয়া স্বীকার করা। তিনি বেদনাহত চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন ঃ "কেমন করিয়া প্রমাণ করিব—আমি মিথ্যা কথা বলি না?" এই বেদনাবোধ হইতেই তাঁহার প্রত্যয় হইল—সত্যাশ্রয়ীর অসাবধান হওয়া চলে না।

গান্ধী-জীবনের ভিত্তিমূলে রহিয়াছে এই জাগ্রত সত্যবোধ। তাঁহার সর্বকর্ম সত্যের অপরিম্লান উজ্জ্বলতায় ভাস্বর। তাঁহার সবকাজের উৎস ও

নিয়ামক ছিল এই অখণ্ড সত্যবোধ। ইহা আমরা ক্রমে জানিতে পারিব। মহাত্মার হস্তাক্ষর আমার তো বেশ সুন্দরই লাগে। তবুও মহাত্মা গান্ধীর নিজের ক্ষোভ ছিল স্বীয় হস্তাক্ষরের শ্রীহীনতার জন্য। তিনি আত্মজীবনীতে এই সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন—"প্রত্যেক যুবক ও যুবতী আমার এই উদাহরণ হইতে এ কথা জানিয়া রাখিবেন যে, ভাল হস্তাক্ষর বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যক অঙ্গ।" গান্ধীজির স্কুল-জীবনে ধারণা ছিল—শিক্ষার সঙ্গে সুন্দর হস্তাক্ষরের কোন সম্পর্ক নাই। দক্ষিণ আফ্রিকায় মুক্তার মত হস্তাক্ষর দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারেন খারাপ হস্তাক্ষর অসম্পূর্ণ শিক্ষার চিহ্ন বলিয়া গণ্য করা উচিত।

এ ব্যাপারে পিতা-মাতা ও শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে গান্ধীজি একটা পরামর্শ দিয়াছেন—লিখিতে শিক্ষা করিবার পূর্বে আঁকিতে শেখা দরকার। যেমন পাখি বা অন্য বস্তু দেখিয়া তাহা স্মরণে রাখিয়া বালক উহা আঁকিতে শেখে, তেমনি প্রথমে অক্ষর পরিচয় করিয়া তাহার পর শিশুদের চিত্রের ন্যায় অক্ষর আঁকিতে শিক্ষা করা সঙ্গত। তাহা হইলে অক্ষর ছাপার লেখার মতই হইতে পারে।

গান্ধীজির সময় অনেক বিষয় ইংরাজিতে পড়ানো হইত। সেই জন্য প্রতিভাধর মানুষেরও ইংরাজি ভাষার বেড়া ডিঙাইয়া পাঠ্য বিষয় অধিগত করা যে সহজসাধ্য হইত না তাহা তিনি নিজে স্বীকার করিয়াছেন। "এই ক্লাস (চতুর্থমান) হইতে কোন কোন বিষয় ইংরাজিতে শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হয়। আমি উহার কিছুই বুঝিতাম না। জ্যামিতি চতুর্থমানে আরম্ভ হয়। আমি তাহাতেও পিছনে পড়িয়া থাকিতাম, বিশেষতঃ ইংরাজিতে বলিয়া মোটেই বুঝিতাম না।"

গান্ধীজির জীবনে সংস্কৃতও এক মহাসমস্যা ছিল। সংস্কৃত শিক্ষা দুরূহ বোধ হওয়ায় তিনি সংস্কৃত ছাড়িয়া ফারসী ক্লাসে যোগদান করেন। পরে অবশ্য তাঁহার শ্রদ্ধাভাজন সংস্কৃতশিক্ষক কৃষ্ণশঙ্করজি তাঁহাকে সংস্কৃত ক্লাসে ফিরাইয়া আনেন। এ বিষয়ে গান্ধীজি লিখিয়াছেন, "তখন যতটুকু সংস্কৃত শিখিয়াছিলাম তাহাও যদি না শিখিতাম, তাহা

হইলে আজ সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে যে রস লইতে পারিতেছি, তাহা পারিতাম না। আমার এই অনুতাপ রহিয়া গিয়াছে যে, ভাল সংস্কৃত শিখিতে পারি নাই। কেননা পরে আমি বুঝিয়াছিলাম যে, কোন হিন্দু বালকেরই সংস্কৃত খুব ভাল না জানিলে চলে না।”

ভারতবর্ষে রাষ্ট্রভাষার সমস্যা সমাধানের জন্য ত্রি-ভাষা সূত্র গ্রহণ করাতে নানা স্থান হইতে বিবিধ আপত্তি উঠিতেছে। ইহার প্রধান কথা হইতেছে,—তিন-চারটা ভাষা শিক্ষা করা ছাত্রদের পক্ষে বিশেষ ভার স্বরূপ হয়। কিন্তু সে আশঙ্কা কি সত্য? গান্ধীজি ভাষা-শিক্ষা বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহা এই ঃ “ভারতবর্ষের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থায় নিজের ভাষা ছাড়া রাষ্ট্রভাষা হিন্দী, সংস্কৃত, ফারসী, আরবী ও ইংরাজির স্থান দেওয়া দরকার। এতগুলি ভাষার সংখ্যা দেখিয়া কাহারও ভয় পাওয়ার কারণ নাই। ভাষা যদি উপযুক্ত ভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় এবং অন্য সকল বিষয় ইংরাজির সাহায্যে পড়িবার বোঝা যদি না চাপানো হয়, তবে ঐ ভাষাগুলি শিক্ষা করা বোঝা বলিয়া বোধ হইবে না। বরঞ্চ উহাতে অতিশয় রস পাওয়া যাইবে। আর, একটা ভাষা যে-ব্যক্তি শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে শিক্ষা করে, তাহার পক্ষে অন্য ভাষার জ্ঞান সুলভ হইয়া পড়ে।” স্কুল-জীবনে লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গান্ধীজি ইহা বলিয়াছেন। অতএব, পরীক্ষিত সত্যের ন্যায়ই ইহার গুরুত্ব।

গান্ধীজি স্কুল-জীবনের কথা বলিতে গিয়া তাঁহার কোন কোন সহাধ্যায়ী মিত্রের কথা যথোচিত প্রীতির সহিত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার জনৈক বন্ধুকে ভাল করিবার চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া তিনি বেদনাবিদ্ধ কণ্ঠে বলিয়াছেন, “কাহাকেও শুদ্ধ করিতে গিয়াও গভীর জলে নামিতে নাই।...সমান গুণযুক্ত লোকের মধ্যেই মিত্রতা শোভা পায় ও টিকিয়া থাকে। মিত্র একে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করেই। এই জন্য মিত্রত্বে সংশোধন করার অবকাশ খুবই কম। আমার বিশ্বাস অঙ্গাঙ্গী-ভাবে মিত্রতা করা অনিষ্টকর, কেননা মানুষ চট করিয়া দোষ গ্রহণ করে। গুণ গ্রহণ করিতে অনেক প্রয়াস করিতে হয়।”

স্কুলের বিবিধ তথ্য সংকলনের জন্য এ লেখা নয়। গান্ধীজির ছাত্র জীবন হইতে আমরা অনেকটা সরিয়া আসিয়াছি। স্কুল-জীবনে যে-সব ঘটনা গান্ধীজির চিত্তে বিশেষ্ প্রভাব বিস্তার করিয়া পরবর্তীকালের গান্ধীজীবন-গঠনে ও মানস-বিকাশের সহায়ক হইয়াছে তাহারই কিছু আমাদের আলোচ্য। গান্ধীজি স্কুলে কৃতী ছাত্র ছিলেন। বৃত্তি ও পুরস্কার দ্বারা তিনি ভূষিত হন। আমাদের আলোচনায় বৃত্তি ও পুরস্কার গৌণ। মুখ্য হইতেছে গান্ধীজির চিত্তে ইহার প্রতিক্রিয়া। তিনি লিখিয়াছেন—"আমার স্মরণে আছে আমার কৃতিত্ব সম্বন্ধে আমার কোন অভিমান ছিল না।"

বহু বিরূপ সমালোচনার দ্বারা গান্ধীজিকে আমরা বিদ্ধ করিয়াছি। কিন্তু তিনি যে মানুষকে সৎ ও সত্যনিষ্ঠ উন্নত চরিত্রের অধিকারী করিতে আগ্রহী ছিলেন—এ বিষয়ে বোধ হয় কেহ দ্বিমত প্রকাশ করিবেন না। দেবতা দেখি নাই। তবে মনে করি, এই সব গুণ থাকিলে মানুষ দেব চরিত্রের অধিকারী হয়। ইহার জন্য যে আকুতির প্রয়োজন গান্ধী-জীবনের ছাত্রাবস্থায় তাহার বিকাশ স্বরু হয়। "আচরণে দোষ হইলে আমার চোখে জল আসিত। শিক্ষক গালি দিতে পারেন এমন কাজ করিলে, অথবা এইরূপ কোন কাজ আমি করিয়াছি বলিয়া শিক্ষক মনে করিলে তাহা আমার অসহ্য হইত। একবার মার খাইতে হইয়াছিল বলিয়া স্মরণ আছে। মার খাওয়ার ব্যথায় দুঃখ হয় নাই, কিন্তু আমি যে দণ্ডের যোগ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছি তাহাতেই মহা দুঃখ হইয়াছিল।" সকল সৃষ্টির মূলে বেদনা, তীব্র বেদনা লক্ষ্য করি। বেদনা ছাড়া সৃষ্টি নাই, দুঃখের মূল্যে ব্যথার মূল্যে ভিন্ন সত্যিকার মূল্যবান কোন কিছু পাইবার উপায় নাই। স্কুল জীবন হইতে গান্ধীজি এই শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই—পরবর্তীকালের বহু দুঃখের তীব্রবেদনা ও তিক্ত আঘাত সহাস্যে পার হইয়া তিনি মহামানব মহাত্মা বলিয়া স্বীকৃতি পাইয়াছেন।

২

গান্ধীজির শৈশবকালটা জন্মস্থান পোরবন্দরেই অতিবাহিত হয়। এইখানে অনাড়ম্বরে প্রচলিত দেশীয় রীতিতে তাঁহার বিদ্যারম্ভ হইয়াছিল। আজিকার জগদ্বিখ্যাত গান্ধীজি শৈশবে একান্তই সাধারণ মানুষ ছিলেন। তিনি আত্মজীবনীতে এ কথা বারবার অকপটে বিবৃত করিয়াছেন। প্রথম স্কুল সম্পর্কে তাঁহার স্মৃতি মলিন। সামান্য দুই একটা কথা মাত্র উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন: "...আমার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ছিল না এবং স্মরণশক্তিও কাঁচা ছিল।" সমগ্র ছাত্রজীবনে গান্ধীজির অসামান্য প্রতিভার অনুভবগ্রাহ্য প্রকাশ ঘটে নাই এ কথা ক্রমে ক্রমে আমরা জানিতে পারিব।

গান্ধীজি বিদ্যার্জনের জন্য অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই পোরবন্দর হইতে পিতার নিকট রাজকোটে আসেন এবং সেই স্থানে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। বার বৎসর বয়সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ করিয়া তথাকার উচ্চ বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। এই দুইটি বিদ্যালয়ের অধ্যয়নকাল গান্ধী-জীবনের ভিত্তি রচনার সময়। পরবর্তী-কালের সত্যসন্ধ গান্ধী চরিত্রের বনিয়াদ এইখানেই গঠিত হয়। বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র বৃহৎ বিবিধ ঘটনার মধ্যে গান্ধী জীবন ও চরিত্রের বিকাশধারাটিও আমাদের নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠে। সাধারণ ছাত্রের যত রকম দোষ ও গুণ থাকিতে পারে গান্ধী চরিত্রে তাহা কমবেশি দৃষ্ট হইত। ইহার মধ্যে গান্ধীজির যে বিশিষ্টতা তাহাও পাঠকের দৃষ্টিতে সহজেই ধরা পড়ে।

স্কুল-জীবনে গান্ধীজির আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল। ঠাট্টা-বিদ্রূপকে তিনি ভয় করিতেন এবং সচেতনভাবে এড়াইয়া চলার চেষ্টায় যত্নবান ছিলেন। শ্রদ্ধা-ভক্তির ব্যাপারে গান্ধীজির এই সময়কার আচরণ অনেকটা যন্ত্রবৎ ছিল। বয়স ও সম্বন্ধানুসারে যাহার যেমন শ্রদ্ধা পাইবার কথা তাহাকে তাহাই দিতেন; গুণাগুণ বিচার করিতেন না। যাহাকে শ্রদ্ধা করিবার কথা তাহার আচার-আচরণের ত্রুটি বা

ব্যবহার বৈগুণ্যের জন্য তিনি তাহাকে কখনও অশ্রদ্ধা করেন নাই। আত্মজীবনীর "কেটলি বানানের" আখ্যানটি কোন কোন পাঠ্য পুস্তকে সংকলিত হইয়াছে বলিয়া আজ অপেক্ষাকৃত বহুবিদিত। ঘটনাটি বিশেষ অর্থব্যঞ্জক এবং গান্ধী-জীবন-বৈশিষ্ট্যের অপূর্ব প্রকাশে শ্রীমণ্ডিত বলিয়া এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

"হাই স্কুলের প্রথম বৎসরেই পরীক্ষার সময় একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহা উল্লেখযোগ্য। শিক্ষা বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর জাইলস্‌ স্কুল দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে পাঁচ-ছয়টা শব্দের বানান লিখিতে দিলেন। এই শব্দগুলির মধ্যে একটা শব্দ ছিল কেটলি (Kettle)। উহার বানান আমি ভুল লিখি। মাষ্টার মহাশয় জুতার ডগা দিয়া আমাকে সাবধান করিয়া দিলেন। ...আমি ইহা ধরিতেই পারি নাই যে, মাষ্টার মহাশয় আমাকে সামনের ছেলেটির শ্লেট দেখিয়া বানান শুদ্ধ করিতে বলিতেছেন। ...সমস্ত ছেলেই ঠিক বানান লিখিল, আমি একাই বোকা বনিয়া গেলাম। ...আমি অপর ছেলেদের নিকট হইতে নকল করিয়া লিখিতে কখনও শিখি নাই।

তাহা হইলেও এ ঘটনায় মাষ্টার মহাশয়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধার ভাব নষ্ট হয় নাই। গুরুজনদের দোষ না ধরার গুণ ছিল আমার ভিতর সহজ ও স্বাভাবিক। এই মাষ্টার মহাশয়ের অনেক দোষ পরে জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা সমানই ছিল। গুরুজনদের আজ্ঞা পালন করিব ; এতটুকুই আমি জানিতাম।"

আজকালকার অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী যুবক-যুবতী গান্ধীজির এই উক্তির যাথার্থ্য হয়তো স্বীকার করেন না। তাহারা নিজেদের ধ্যান-ধারণা অনুসারে যাহা ভাল বোঝেন তাহাই করেন, এই রকম একটা ভাব দেখান। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের মনে অলক্ষ্যে সত্য-অসত্য ভাল-মন্দের একটি আত্মবাদী ধারণা সৃষ্টি হয়। সেই ধারণার আলোকে তাহারা সব কিছু বিচার করেন। সুতরাং সেই বিচারে যাহা সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয় তাহা প্রায়ই স্বার্থপরতারই নামান্তর মাত্র। ঐ

বিচারের মানদণ্ড সচরাচর নিরপেক্ষ হইতে পারে না। এই মানদণ্ড হইতেছে বোধ। যুগে যুগে সময়ের ব্যবধানে যেমন ইহা বদলায় তেমনি ইহা দেশে দেশে পৃথক; মানুষের গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে ভিন্ন—তা সে রাজনৈতিক গোষ্ঠী হোক্ বা ধর্মীয় গোষ্ঠী হোক্ অথবা অন্য কিছু হোক্। অতি সাধারণ ছাত্র গান্ধীজি যে, পরবর্তী জীবনে অতীব অসাধারণ হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহার মূলে তাঁহার এই নির্বিচার শ্রদ্ধা অনেকখানি রস ও রসদ যোগাইয়াছে, বলিয়া আমার বিশ্বাস। ইহার ফলে বর্তমান সময়ের বিচারে শ্রদ্ধা যাহার প্রাপ্য নহে এমন কোন কোন লোক হয়তো শ্রদ্ধা পাইয়াছেন সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধার আসনটিতে যাহাদের ন্যায্য অধিকার তাহারা কেহ কিন্তু বঞ্চিত হন নাই। শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা না জানাইবার মূঢ়তা হইতে রক্ষা পাইবার ইহাই তো প্রকৃষ্ট উপায়। শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তের অধিকারী না হইলে যথার্থ জ্ঞান লাভ সম্ভব নহে। শিক্ষা কেবল যে আমরা শিক্ষকের নিকট হইতেই পাই তাহা নহে। চাণক্য শ্লোকে আছে—

সিংহাদেকং বকাদেকং যট গুণস্ত্রীনি গর্দ্দভাৎ
বায়সাৎ পঞ্চ শিক্ষেতচত্বারি কুক্কুটাদপি॥

সিংহ বক কুকুর গর্দভ মোরগ ইহারা সামান্য প্রাণী মাত্র। মানুষ ইহাদিগকে শ্রদ্ধা করে না। কিন্তু ইহাদের নিকট হইতে যে কিছু শিক্ষণীয় আছে তাহা শ্রদ্ধা সহকারে না লক্ষ্য করিলে কি জানা যায়? ভারতীয় ঋষির ধ্যানলব্ধ জ্ঞান—'শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্' গান্ধীজির ছাত্রজীবনে বাঙ্ময় হইয়া উঠিয়াছে।

পরিবেশের প্রভাব গান্ধীজির চিত্তে শ্রদ্ধা-ভক্তির গুণটিকে উজ্জ্বলতর করিয়াছিল। একটি নিষ্ঠাবান ভক্ত বৈষ্ণব পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অনেক ভারতীয় হিন্দুর মত গান্ধীজির পিতামাতাও কেবলমাত্র স্বীয় সম্প্রদায়ের ধর্মচর্চার মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রাখেন নাই। তাঁহারা "···হাবেলী (বিষ্ণু মন্দির) যাইতেন, শিবালয়ে যাইতেন, রাম মন্দিরে যাইতেন।" পুত্রগণও তাঁহাদের সঙ্গী হইতেন।

সম্প্রদায়ের গোড়ামিহীন ভক্তির এই নির্মল পরিমণ্ডল গান্ধীজির জীবনকে ছাত্রজীবন হইতেই বিপুলভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। আর গান্ধীজি তো স্বীকার করিয়াছেন - "বাল্যকালের সংস্কার তাহা শুভই হোক্ আর অশুভই হোক্, মনের ভিতর খুব গভীরভাবে বদ্ধমূল হয়।"

স্কুল-জীবনে পাঠ্যাতিরিক্ত পড়াশুনার প্রতি গান্ধীজির বিশেষ কোন অনুরাগ ছিল না। তাঁহার পিতৃদেব 'শ্রবণের পিতৃভক্তি' নামক একখানি নাটক আনেন। গান্ধীজি বইখানির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং পাঠ করেন। পিতা-মাতার প্রতি শ্রবণের ঐকান্তিক ভক্তি তাঁহাকে মুগ্ধ করে। তিনিও পিতামাতার প্রতি বিশেষ ভক্তিমান ছিলেন। এই বইখানি পড়িয়া শ্রবণের মত হইবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে জাগ্রত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় গান্ধীজি পিতা-মাতার সাহচর্য দীর্ঘকাল পান নাই। দেশে ছাত্রাবস্থাতেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয় এবং বিলাতে প্রবাসকালে মাতৃদেবী পরলোক গমন করেন। পরবর্তী-কালে কয়েকখানি পুস্তক মহাত্মাজির জীবনে গভীর ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইহার অনেকগুলির দ্বারা তাঁহার রাজনৈতিক মতামত ও সাংগঠনিক কাজকর্ম ইত্যাদি বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। কিন্তু গান্ধীজির চরিত্র গঠনে এই শ্রবণের পিতৃভক্তি নাটকখানির প্রভাব বোধ হয় যথার্থভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নহে।

হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান। ভারতের হিন্দুমাত্রেই গল্পটি মোটামুটি জানেন। মহারাজা হরিশ্চন্দ্র রাজ্যপাট স্ত্রী-পুত্র সর্বস্ব হারাইয়া শ্মশানে ডোমের কাজ স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি সত্যভ্রষ্ট হন নাই। এই উপাখ্যান পড়িবার সময় চক্ষুটি সজল হয় না এমন পাঠক নাই বলিলেই চলে। গান্ধীজি হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যানের অভিনয় দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন "হরিশ্চন্দ্রের মত সত্যবাদী সকলে কেন হয় না?" সেই সময় হইতেই তাঁহার মনে জাগ্রত হইল: "হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় বিপদে পড়িয়া তাঁহারই ন্যায় সত্য পালন করিব।" স্কুলের সাধারণ ছাত্র

গান্ধীজির পরবর্তী জীবনে সত্যের যে বীর্যময়-সত্যময়-শুভময় প্রকাশ ঘটে তাহার বনিয়াদ বহুলাংশে এইভাবে গঠিত হইয়াছিল।

গান্ধীজি একান্ত সাধারণ স্তরের ছাত্র ছিলেন। জীবনের কোন দিকেই তখন তাঁহার এমন কোন বিশেষত্ব দেখা যায় নাই যাহার প্রতি কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারে। অপর দিকে খুব অল্প সময়ের জন্য হইলেও নানা দুষ্প্রবৃত্তির তিনি শিকার হন। দলে পড়িয়া, দুষ্ট বন্ধুর প্রভাবে তিনি বিড়ি খাওয়া, চাকরের পয়সা চুরি করিয়া বিড়ি কেনা, নিরামিষাশী বৈষ্ণব হইয়াও মাংসাহার, মিথ্যা ভাষণ প্রভৃতি বিবিধ অপরাধ করেন। প্রলুব্ধ হইয়া দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত হইলেও তাঁহার জাগ্রত হৃদয়, পিতা-মাতার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি এবং সত্যের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ তাঁহাকে সর্বদাই অনুতাপে বিদ্ধ করিয়া রাখিত। আত্মজীবনীতে তিনি ইহার সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন। ন্যায়-অন্যায় সকল কর্মকেই সকলেই আমরা একটি নীতি ও কল্যাণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিতে উৎসুক। অন্যায় ও অসত্যকর্মকে নীতির মোড়ক পরাইতে কুযুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। গান্ধীজিও স্বীয় ছাত্রজীবনের এই সকল 'অপরাধ' তাঁহার তৎকালীন মনোভাবের দ্বারা কল্যাণকর বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্নবান ছিলেন। কিন্তু সত্যাশ্রয়ী মনের নিকট কুযুক্তি টেঁকে না। তাই গান্ধীজি একদিন একখানি পত্রে অকপটে সর্ববিধ অপরাধ স্বীকার করিয়া পিতার নিকট শাস্তি প্রার্থনা করেন। এইভাবে তিনি প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। তিনি লিখিতেছেন—"যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নিজের দোষ, যাঁহার শোনার অধিকার আছে তাঁহার নিকট খুলিয়া বলে এবং আর না করার প্রতিজ্ঞা করে, সে শুদ্ধতম প্রায়শ্চিত্ত করে।" সাধারণ মানুষ এইভাবেই অসাধারণ হন। আমার মনে হয়, যে গান্ধী-পথের অপূর্ব বিকাশের দ্বারা পুরাতন ধারণা নবীন হইয়াছে, তাহার সূচনা ছাত্রজীবনের এই ঘটনার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। গান্ধীজি এই সময় পনের-ষোল বৎসর বয়সের কিশোর মাত্র।

অনেক কষ্টকর সংগ্রামের বিজয়ী ও দুঃসাহসী নায়ক গান্ধীজি ছাত্রজীবনে ভীরু ছিলেন। কথাটা শুনিলে চমকিত হইতে হয়। তথাপি ইহা সত্য। গান্ধীজি অকপটে স্বীকার করিয়াছেন "...আমি ভীরু ছিলাম। চোরের ভয়, ভূতের ভয়, সাপের ভয়, আমাকে পাইয়া বসিত।...রাত্রে কোথাও একলা যাওয়ার সাহস আমার ছিল না। ...বাতি না জ্বালাইয়া শোওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল।"—ভীরু ভীতু ছেলেটি পরবর্তী জীবনে কিসের জোরে এমন নির্ভয় হন যে ইংরাজের গুলিগোলার সামনে নিরস্ত্র হইয়া বুক পাতিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন? ভগবদ্বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত ও নৈতিক বলে বলীয়ান না হইলে কোন মানুষের পক্ষেই এবম্বিধ দুঃসাহসিক আচরণ করা সম্ভব নহে। ভগবদ্বিশ্বাসরূপ অমোঘ শক্তি তিনি সহজ ও সাধারণভাবে লাভ করেন দাই রম্ভা বাঈয়ের নিকট হইতে। গান্ধীজি লিখিতেছেন—"রম্ভা আমাকে বুঝাইত যে রাম নাম উহার (ভয়ের) ঔষধ। বাল্যকালে ভূতপ্রেতের ভয় হইতে বাঁচার জন্য রাম নাম জপ করি।...রাম নাম আমার কাছে অমোঘ শক্তি।" উক্তিটি আমাদের গান্ধীজির প্রার্থনা সভার বিখ্যাত রামধুন্ সঙ্গীতের কথা মনে করাইয়া দেয়। গভীর বেদনার সঙ্গে আরো স্মরণে আসে ৪৮ সনের ৩০শে জানুয়ারি বুলেটবিদ্ধ গান্ধীজির শেষ উক্তি—"হে রাম!"। এই প্রসঙ্গে মনে করা যাইতে পারে, বালক বয়সে মহাত্মাজি বিল্লেশ্বর প্রসাদের রামায়ণ গান শুনিয়া আত্মহারা হইয়া যাইতেন। এই ঘটনাটি আলোচনা করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—"আজও আমি তুলসীদাসের রামায়ণ ভক্তিমার্গের সর্বোত্তম গ্রন্থ বলিয়া মনে করি।" ঈশ্বরবিশ্বাসী ভক্ত মানুষ চিরকালই ভয়হীন। ঈশ্বরে অখণ্ড বিশ্বাসের জন্য যুগে যুগে প্রহ্লাদের ন্যায় বহু মানুষ সহাস্যে সহস্র অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন। আমাদের জীবনকালে আমরাও গান্ধীজির মধ্যে তেমনি একজনকে দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি!

ঘটনাটি হইতে ভগবানে শিথিল বিশ্বাসী আমরা সাধারণ মানুষ এই

আশা করিতে পারি যে, বাল্যকালে ভীরুতা বা ছোটখাটো ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিয়া নিরাশ হইবার কারণ নাই। গান্ধী মহাজীবনের পুণ্যালোকে এ কথা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, বালক বয়সে, স্কুল জীবনে যাহারা ভীরু, যাহাদের আচার-ব্যবহারে বিবিধ বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, বা কাজকর্মে প্রতিভার তিলেক স্পর্শও লক্ষিত হয় না তাহারাও আদর্শনিষ্ঠ সত্যাশ্রয়ী ও ভগবদ্বিশ্বাসী হইয়া যদি কর্মে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে সাফল্য লাভ করা সম্ভব। লোকশিক্ষার জন্য, সাধারণ মানুষের প্রাণে আশা ও আস্থা সঞ্চারের জন্য, মনে হয়, গান্ধী-মহাজীবন এমন একান্ত সাধারণ ভাবে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া শৈশব ও কৈশোরে বিকশিত হইয়াছে।

ছাত্রাবস্থায় গান্ধীজির মানসিক বিবর্তনের এই ধারায় আরও দুই তিনখানি বই খুবই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইহার মধ্যে সর্বাগ্রে মনুসংহিতার নাম করিতে হয়। "এই জগৎ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, আবার নীতি মাত্রেরই সমাবেশ সত্যে রহিয়াছে"—এই মহৎ ভাব তাঁহার চিত্তে সুদৃঢ় হয় ঐ পুস্তক পাঠে। এই সময় হইতে তিনি সত্যসন্ধও হইয়া উঠেন।

শ্যামল ভট্টের নীতি কবিতার মধ্যে গান্ধীজি যেন তাঁহার প্রত্যাশিত পথের সন্ধান পাইলেন। আত্মজীবনীতে যে কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন গান্ধী-মানস উপলব্ধির জন্য তাহার মূল্য অপরিসীম বলিয়া এখানে তুলিয়া দেওয়া হইল।

"পান করিবার জল যদি পাও,
অন্ন করিও দান,
মিষ্টি কথাটি ভাগ্যে জুটিলে
মাটিতে নোয়াও শির,
কড়ির বদলে দান করে যেও,
তুমি মোহরের থান;
পরাণ বাঁচালে—জীবন দিবার
দুঃখ বরিও বীর।

জ্ঞানী যারা—করে কথা ও কাজের
এমনি করেই মিল,
যে কোন ক্ষুদ্র সেবার তাঁহারা
দশ গুণ দেয় ফিরে
সকল মানুষ এক বলে জানে,
মহৎজনের দিল,
অপকার যারা করে তাদেরও
উপকারে রাখে ঘিরে।

পরবর্তী জীবনে তিনি পণ্ডিত প্রবর মদনমোহন মালব্যজির ভাগবত পাঠ শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করেন!

একজন সত্যিকারের বিদগ্ধ মানুষের নিকট হইতে ভাগবত শুনিবার সুযোগ এখন সংকুচিত হইয়া গিয়াছে। অতএব এখনকার ছাত্র যুবকেরা বোধ হয় উপলব্ধি করিতে পারিবেন না ভাগবত পাঠ শ্রবণের দ্বারা সত্যই কি পাওয়া যায়।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে আঠার বৎসর বয়সে গান্ধীজি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং উচ্চতর শিক্ষার জন্য ভবনগরের শ্যামলদাস কলেজে ভর্তি হন।

৩

ছাত্রাবস্থায়ই যে গান্ধীজির বিবাহ হয় সে কথা পূর্ব প্রসঙ্গে বলা হয় নাই। মাত্র ১৩ বৎসর বয়সে প্রায় সমবয়সী একটি বালিকার সহিত তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। ইহা ৮৭ বৎসর পূর্বেকার ঘটনা। সেই সময় অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বালিকার বিবাহ সমাজে প্রচলিত ছিল। এই বিবাহের ঝামেলায় গান্ধীজির পড়াশুনায় গুরুতর ক্ষতি হয়। পুরা একটি বৎসর তাঁহার নষ্ট হইল। পরে বিশেষ পরিশ্রম করিয়া তিনি ডবল প্রমোশান পান এবং সময়ের ক্ষতিটা পোষাইয়া লন। ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ লিখিয়াছেন "মাঝারি রকমের

ছাত্র হলেও একবার তিনি ডবল প্রমোশান পান, পুরস্কার এমন কি কাথিয়া- ওয়াড়ের সোরঠ বিভাগের উত্তম ছাত্র হিসাবে দুইবার মাসিক চার টাকা ও দশ টাকা বৃত্তি পান।” এই ঘটনাটির মধ্যে গান্ধী-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সহজেই লক্ষ্য করা যায়। তিনি আন্তরিকতার সহিত যাহা আরম্ভ করিতেন তাহা সুসম্পন্ন না করিয়া ছাড়িতেন না। এই আন্তরিকতা বা ঐকান্তিকতা গান্ধীজির সাফল্যের অন্যতম চাবিকাঠি।

গান্ধীজি কাথিয়াওয়াড় হাই স্কুল হইতে ১৮৮৭ সনে ম্যাট্রিকুলেশান (তখন এনট্রানস্ বলা হইত) পরীক্ষায় পাস করেন। পরীক্ষার ফল ভাল হয় নাই। মোট ৬২৫ নম্বরের মধ্যে তিনি ২৪৮ পান। বিশ্ববিদ্যালয়ে গুণানুসারে তাঁহার স্থান ছিল ৪০৪ তম। তাঁহার স্কুলে অবশ্য তিনি পঞ্চম স্থান লাভ করেন। উচ্চতর শিক্ষার জন্য তিনি শ্যামলদাস কলেজে ভর্তি হন। কলেজের পড়াশুনার ধরণ-ধারণ তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। ইংরাজিতে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ছিল না বলিয়া অধ্যাপকদের পড়ানো বুঝিতে বা ধরিতে পারিতেন না। রাজকোটের হাই স্কুলে ইংরাজি পড়ানোর মান খুব নীচু ছিল। সে জন্যই যে গান্ধীজি ইংরাজিতে খুব কাঁচা রহিয়া গিয়াছিলেন তাহা বলাই বাহুল্য। এই ইংরাজি জ্ঞানের স্বল্পতার জন্য তাঁহাকে অনেক দিন নানা দুর্ভোগ পোহাইতে হইয়াছিল।

বিলাতে ব্যারিষ্টারি পড়িতে যাইবার সময় ভাল ইংরাজি বলিতে পারিতেন না এই লজ্জায় প্রায় কেবিনের বাহিরই হইতেন না। ভাষার অসুবিধা সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন: “তাহাদের (জাহাজের অভারতীয় যাত্রী) সহিত কথা বলিতে পারিতাম না।···তাহাদের কথা বুঝিতাম না। বুঝিতে পারিলেও জবাব দিতে পারিতাম না। প্রত্যেকটি বাক্যই উচ্চারণ করিবার পূর্বে মনে মনে আমাকে গঠন করিয়া লইতে হইত।” এ কথা অবশ্য আজ সর্বজনবিদিত যে পরবর্তীকালে গান্ধীজি প্রকৃষ্টরূপে ইংরাজি ভাষার জ্ঞান আয়ত্ত করেন। ইংরাজি ভাষায় দক্ষতার জন্য যে কয়জন ভারতীয় বিদেশে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন গান্ধীজি

তাঁহাদের অন্যতম প্রধানরূপে এখন স্বীকৃত। গান্ধীজির ইংরাজি রচনা-শৈলী বা স্টাইলের বিশিষ্টতা লইয়াও পরে বেশ আলোচনা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নির্মলকুমার বসু তাঁহার 'গান্ধী চরিত' গ্রন্থে লিখিয়াছেন "লেখকদের তিনি একটিমাত্র উপদেশ দিতেন, সংক্ষেপ কর, আরও সংক্ষেপ কর।" তাহার ফলে চিন্তার স্পষ্টতা বৃদ্ধি পায় এবং অপরের পক্ষেও গ্রহণ করা আরও সহজ হয়। ভাষা ও বিষয় উভয়ের উপর অসামান্য দখল না থাকিলে এই সংক্ষেপীকরণ কখনই সম্ভব হয় না।

গান্ধীজির পিতৃদেব অসুস্থ না হইলে প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল বোধ হয় অতটা খারাপ হইত না। আর ইংরাজির হাঙ্গামা না থাকিলে তিনি অনেক ভালভাবে পাস করিতে সমর্থ হইতেন—একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। এই ইংরাজি ভাষার যূপকাষ্ঠে আমাদের কত ছেলেমেয়ে যে বলি হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। স্বাধীনতা লাভের একুশ বৎসর পরেও মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে পড়াশুনার আয়োজন হইল না! আর কোন স্বাধীন দেশ মাতৃভাষার মাধ্যমে পড়াশুনার সুযোগ হইতে বঞ্চিত কি না জানি না। তবে আমাদের দেশে এই দুঃখজনক অবস্থা চলিতেছে। এবং, তাহার ফলে হাজার হাজার প্রতিশ্রুতিময় জীবন বিকশিত হইতে না পারিয়া ব্যর্থ বা নষ্ট হইতেছে। ভগবান বোধ হয় গান্ধীজির জীবনে ইংরাজির সমস্যা সৃষ্টি করিয়া ভারতবাসীর চোখ খুলিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত ভগবানের সে প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। ইংরাজির খাচায় বন্দী বিদ্যাকে মুক্ত করিবার সাধনা গান্ধী শতবর্ষের অন্যতম সাধনা হোক্।

গান্ধীজি কালক্রমে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইংরাজি লিখিয়ে বলিয়া স্বীকৃতি পান, এ কথা একটু আগে বলিয়াছি। দুই শত বৎসর ধরিয়া আমরা ইংরাজি পড়িতেছি—তথাপি শতকরা পাঁচজন লোকও ইংরাজি লেখাপড়া শেখেন নাই। গান্ধীজি একবার ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নিকট নাকি বলিয়াছিলেন সারা ভারতবর্ষে তিনজন মাত্র লোক নির্ভুল ইংরেজি লিখিতে পারেন। এই তিনজনের একজনের মাত্র

তিনি নাম করেন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গান্ধীজির কথাটার মধ্যে অতিশয়োক্তি আছে এ কথা স্বীকার করা শক্ত। ইংরাজির মোহ সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। ইহার ক্ষতিকারিতা সম্পর্কে তিনি লিখিতেছেন "দেশের যুবসম্প্রদায়ের উপর এই সর্বনাশা বিদেশী মাধ্যম চাপাইয়া দেওয়া বিদেশী শাসনের অন্যতম প্রধান অন্যায় বলিয়া ইতিহাসে স্বীকৃত হইবে। জাতির উদ্যম ইহার দ্বারা ধ্বংস হইয়াছে এবং ছাত্রদের পরমায়ু হইয়াছে সংক্ষিপ্ত। ইহার ফলে তাহারা জনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং শিক্ষা অহেতুক ব্যয়বহুল হইয়াছে। এই পদ্ধতির উপর এখন যদি জোর দেওয়া হয় তাহা হইলে আশঙ্কা হয় ইহা জাতির আত্মাকেই ধ্বংস করিবে। তাই যত শীঘ্র শিক্ষিত ভারতবাসী বিদেশী মাধ্যমরূপ এই মায়াজাল হইতে মুক্ত হয় ততই জনসাধারণ এবং তাহাদের নিজেদের মঙ্গল।"

ইহা ইংরেজি বর্জন নহে। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ভারতবাসীর নিকট ইংরেজি ভাষার অনুপযোগিতার কথাই এখানে বিশেষ করিয়া উচ্চারিত হইয়াছে। অন্যত্র তিনি আরও সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন—"আমি নিশ্চিত মনে করি দেশের যে সমস্ত ছেলে নিজের ভাষার পরিবর্তে অন্য ভাষার মাধ্যমে পড়াশুনা করে তারা সোজাসুজি আত্মহত্যা করছে।···বালকদের মানসিক বিকাশের জন্য মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষা তার উপর জোর করে চাপাবার প্রচেষ্টা আমি মাতৃভাষার প্রতি দ্রোহ বলেই মনে করি।"

বিলাতে গিয়া গান্ধীজি প্রকৃষ্টরূপে ইংরাজি জ্ঞান লাভের জন্য লণ্ডন ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষা দেন। এই পরীক্ষা ছয় মাস অন্তর হইত। গান্ধীজির হাতে তখন মাত্র পাঁচ মাস সময়। পরীক্ষার বিষয় দেখিয়া তিনি ঘাবড়াইয়া যান। লাটিন ও অন্য কয়েকটি ভাষা শিক্ষা আবশ্যক ছিল। লাটিন জানিলে ইংরাজি ভাষার উপর দখল বাড়ে এবং আইনের বই সহজে বুঝা যায়। এই যুক্তির প্রভাবে তিনি লাটিন শিখিতে উদ্যোগী হন। ইতিপূর্বে কোর্স লইয়া নাড়াচড়া

আরম্ভ করিয়াছেন। সুতরাং ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া গান্ধীজি পরীক্ষায় বসিলেন। পাস হইলেন না। লাটিনেই ফেল করিলেন। পরের বার অবশ্য পাস করেন। এই পরীক্ষা তাঁহার ইংরাজি ভাষার ভিত্‌টি গড়িয়া দেয় বলা চলে। এই সময়ে তাঁহাকে সামান্য বিজ্ঞানও পড়িতে হয়। রসায়ন শাস্ত্রের খানিকটা এবং পদার্থ-বিদ্যার আলো ও তাপ তিনি ঐ পরীক্ষার জন্য পড়েন।

গান্ধীজি বিজ্ঞান পড়িয়াছিলেন এ কথা অনেকেই সহজে স্বীকার করিতে দ্বিধা করেন। কেন তা বোধ হয় তাহারাও জানেন না!

শ্যামলদাস কলেজে গান্ধীজি অথৈ জলে হাবুডুবু খাইতেছিলেন। অবস্থাটা তাঁহার নিজের কথায় শুনা যাক: "সেখানে গিয়া আমি কিছুই বুঝি না; সব মুস্কিল বোধ হয়। অধ্যাপকরা যাহা পড়ান তাহাতে না পাই আস্বাদ, তাহা না পারি বুঝিতে। ইহাতে অধ্যা-পকদের দোষ ছিল না। তখনকার দিনে শ্যামলদাস কলেজে যাঁহারা অধ্যাপনা করিতেন তাঁহারা প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপক বলিয়া গণ্য ছিলেন।" কলেজে গান্ধীজির পড়াশুনা তাঁহার অস্বাস্থ্যের জন্যও ব্যাহত হইতেছিল। প্রথম গ্রীষ্মাবকাশে যখন তিনি বাড়ি আসেন তখন নাক হইতে রক্তক্ষরণ প্রভৃতি ব্যাধিতে তিনি পীড়িত। এই সময়কার একটা ঘটনায় যেমন গান্ধীজির জীবনের মোড় ফিরিয়া গেল তেমনি তিনি কলেজ হইতেও মুক্তি পাইলেন।

গান্ধী পরিবারের বন্ধু ও উপদেষ্টা পণ্ডিত মাভজী গান্ধীজিকে ব্যারিষ্টারি পড়িতে বিলাত পাঠানোর পরামর্শ দিলেন। কারণ দেওয়ান হইতে হইলে ব্যারিষ্টারি উপাধি সহায়ক হইবে। গান্ধীজির বাবা এবং কাকা উভয়েই দেওয়ান ছিলেন। সুতরাং গান্ধী পরিবারের কাহারো পক্ষে দেওয়ান হওয়া সহজ বলিয়া তখন মনে করা হইত। কলেজে "একবারে পাস হইবার কোন সম্ভাবনা নাই", অপর দিকে 'ambition' বা উচ্চভিলাষের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া গান্ধীজি বিলাত যাইতে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেন। গান্ধীজির মতামত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন

"আমাকে বিলাতে পাঠাইলে তো খুব ভালই হয়, কলেজে তাড়াতাড়ি পাস করিতে পারিব বলিয়া মনে হয় না। তবে আমাকে ডাক্তারী শিখিবার জন্য পাঠান না কেন?" ডাক্তার হইলে তো আর দেওয়ান হওয়া যায় না, সুতরাং সে প্রস্তাব সরাসরি নাকচ হইয়া গেল। অন্য কারণও ছিল। গান্ধী পরিবার বৈষ্ণব ছিলেন। "বৈষ্ণবদের হাড় মাস কাটিবার কাজ করিতে নাই।" গান্ধীজির পিতৃদেবের ইচ্ছা ছিল তাঁহাকে উকিল করা। ব্যারিষ্টারি পড়িতে পাঠাইবার সিদ্ধান্তে স্বর্গত পিতার ইচ্ছাও প্রভাব বিস্তার করে।

গান্ধী পরিবারের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি সত্ত্বেও বিলাত যাত্রার ব্যাপারে সমাজের রক্ষণশীল অংশের বিরূপতা কাটাইয়া উঠিতে গান্ধীজিকে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। স্ত্রীর গহনা বিক্রয় ও ধার দেনা করিয়া তিনি প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করেন। সমাজের নেতারা নানাবিধ উপায়ে চেষ্টা করিয়া তাঁহার বিলাত যাত্রা বন্ধ করিতে না পারিয়া গান্ধী পরিবারকে জাতিচ্যুত করে। সে সময়ে ইহা সহ্য করা কম কথা নয়। এই সমাজনেতাদের ষড়যন্ত্রে নির্দিষ্ট দিনে গান্ধীজির যাত্রা সম্ভব হয় নাই। সমাজপতিদের ভয়ে পূর্বে যাঁহারা গান্ধীজিকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন তাঁহারা পিছাইয়া গেলেন। গান্ধীজির এই বিপদে সমাজের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করিয়া রণছোড় দাস পাটোয়ারি প্রয়োজনীয় অর্থ ধার দেন। গান্ধীজি ইঁহাকে চিরকাল অগ্রজতুল্য শ্রদ্ধা করিতেন। ইনি পরে গণ্ডাল রাজ্যের দেওয়ান হন।

অনেক মাৎসর্য-পরায়ণ আত্মীয়-স্বজন হিতৈষী বন্ধুর বেশে নানা অর্ধ সত্য ও মিথ্যা কাহিনী গান্ধীজির মাতৃদেবীকে শুনাইতে লাগিলেন। সে সব কথা শুনিলে কোন মা না তাহার পুত্রকে এক নাগাড়ে তিন বৎসরের জন্য অচেনা অজানা দেশে পাঠাইতে শঙ্কিত হইবেন! পুতলী বাঈও বিচলিত হইলেন। গান্ধীজি তাঁহার মাতৃদেবীকে বলিলেন, "তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না?" মাতৃদেবী বুঝিলেন আত্মীয়স্বজন অপেক্ষা পুত্রকেই বিশ্বাস করা সঙ্গত। গান্ধীজি

মদ্য মাংস ও স্ত্রীলোক পরিহার করিয়া চলিবেন অর্থাৎ মদ মাংস খাইবেন না এবং নারীর সহিত শুদ্ধ ব্যবহার করিবেন—এই প্রতিশ্রুতি লইয়া মাতৃদেবী তাঁহাকে বিলাত যাত্রার অনুমতি দিলেন। ১৮৮৮ সনের ৪ঠা সেপ্টেম্বর গান্ধীজি বোম্বাই হইতে ক্লাইড জাহাজ যোগে লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। গান্ধীজির চোখে লণ্ডন তখন স্বপ্ন—Land of philosophers and poets, the very centre of civilization.

১৮৮৮ সনে রাজকোটের এক যুবক বিলাত যাইতেছেন—ইহা এক আশ্চর্য ঘটনা। সুতরাং সকল প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও গান্ধীজির বিদ্যালয় তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে। অভিনন্দনের জবাব দিবার জন্য গান্ধীজি পূর্বেই একটি বক্তৃতা লিখিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু জবাব দেওয়ার সময় তাহা পড়াই হইল না। মাথা ঘুরিতে লাগিল, শরীর কাঁপিতে লাগিল। ইহা গান্ধীজির নিজের স্বীকারোক্তি। প্যারেলাল লিখিয়াছেন—'All he could fumble was that he hoped that some of them would follow in his footsteps and on their return work wholeheartedly for big reforms in India.' গান্ধীজি থতমত খাইয়া যাহা বলিলেন তাহার মর্মার্থ হইল—ঐ স্কুলের ছাত্রদের অনেকে গান্ধীজির মত বিলাত যাইবে এবং ফিরিয়া আসিয়া ভারতবর্ষে বড় রকম সংস্কার কর্মে আন্তরিকতার সহিত ব্রতী হইবে। ইহার পরেও অনেকবার গান্ধীজির বক্তৃতা দিবার চেষ্টা সফল হয় নাই। বিলাতে নিরামিষ-ভোজী সংঘে বা প্রত্যাগমনের পূর্বে তিনি যে ভোজসভার আয়োজন করেন সর্বত্রই বক্তৃতা দিতে তিনি ব্যর্থ হন। এমন কি ব্যারিষ্টার হিসাবে বোম্বাইয়ের ছোট আদালতে প্রথম যে মামলার জন্য তিনি দাঁড়ান সেখানেও তিনি তাঁহার কর্তব্য করিতে সমর্থ হন নাই। "আমি তো উঠিলাম, কিন্তু গা কাঁপিতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল, মনে হইল কোর্ট ঘুরিতেছে।" তিনি প্রথম বক্তৃতা করেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিটোরিয়াতে। যে বিষয়ে বলিবার জন্য মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব সেই সম্পর্কে বলার সুযোগ হইয়াছিল

বলিয়াই সম্ভবত তিনি এবার তাঁহার বক্তব্য সহজেই উপস্থিত করিতে পারেন। "ইহাই আমার জীবনের প্রথম বক্তৃতা বলা যায়। আমি সত্য সম্বন্ধেই কিছু বলিব স্থির করিয়াছিলাম।"

গান্ধীজি পরবর্তীকালে কথার যাদুকর হন। লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে তিনি অবিচলিত ভঙ্গি এবং শান্ত কণ্ঠে স্বীয় বক্তব্য উপস্থিত করিয়াছেন। বিদগ্ধতম মানুষের সঙ্গেও তাঁহার কথাবার্তায় জৌলুষের অভাব ঘটে নাই। নিত্য নিরন্তর প্রচেষ্টার দ্বারাই তিনি এই শক্তি অর্জন করেন—এ কথাটা আমরা, শিক্ষার্থীগণ মনে রাখিলে হতাশ হইবার কারণ ঘটিবে না। অভিনন্দনের উত্তরে যে সংস্কার কার্যের কথা বলিয়াছেন তাহাও গভীর অর্থবহ। গান্ধীজি অপেক্ষা বড় সংস্কারক ইদানীংকালে ভারতবর্ষে আর কে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? কিন্তু বিলাত যাত্রার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি এক কথায় তখন উত্তর দিয়াছিলেন—ambition. ইহাকে কি বলিব?—বিধিলিপি!

বিলাত যাইবার প্রস্তাব যে দিন হয় তখন হইতে যাত্রারম্ভের সময় পর্যন্ত পর্বত প্রমাণ বাধা ও বিরূপতার সঙ্গে গান্ধীজি শান্তভাবে মোকাবিলা করেন। এ কথা আমরা এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছি ছাত্র-জীবনে গান্ধীজির প্রতিভার স্ফুরণ হয় নাই। তবে সকল সমস্যা সম্পর্কে তাঁহার নিজস্ব মতামত ও সমাধান থাকিত। সহজে সেই সিদ্ধান্ত হইতে তিনি প্রত্যাবর্তন করিতেন না। সকলে উহার সহিত একমত হইতে না পারিলেও তাহার পশ্চাতে যে নিষ্ঠা ও সত্যবোধ থাকিত তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিতেন না। সাম্যবাদী নেতা অধ্যাপক হীরেন মুখার্জী Gandhiji: A study গ্রন্থে লিখিয়াছেন: **As a student either at school at Guzrat or at the Inns of court in London, he showed no particular brilliance, no out-standing ability.** কিন্তু এই সাধারণ মানুষটির কাজে-কর্মে অসাধারণ যে কিছু একটা ছিল তাহা সহজেই ধরা পড়িত। বিলাত যাত্রা প্রসঙ্গে তাঁহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ও বিরামহীন নিরন্তর কর্মপ্রচেষ্টা আমরা দেখিয়াছি।

সমাজের বিরুদ্ধতা, মাতৃদেবীর আশঙ্কা, অর্থের অনটন, স্ত্রীর অশ্রু ও আত্মীয় স্বজন অনেকেরই বিপক্ষতা তিনি শান্ত চিত্তে সামলাইয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছেন। জীবন প্রভাতে যে গান্ধীজিকে আমরা এইখানে প্রত্যক্ষ করিলাম জীবন সায়াহ্নের গান্ধীজি তাহা হইতে গুণগতভাবে বড় বেশি ভিন্ন নহেন। ইহার সহিত, হীরেনবাবুর ভাষায়, যুক্ত হইয়াছিল—A certain mysticism had perhaps entered his composition—a mysticism which in later life linked with a vivid practical sense to make the most formidable of all contributions······He had capacity for hard work, with penchant for details···he had sincerity and the spirit of confessing wrongs which, though apparently naive, betokened latent strength.

হীরেনবাবু বিদগ্ধ মানুষ কিন্তু গান্ধী অনুরাগী নন। পরন্তু তিনি গান্ধী মত ও পথের কঠোর সমালোচক। অথচ তাঁহার উপরের কথাগুলির মধ্যে গান্ধী চরিত্রের অন্তর্নিহিত শক্তির উৎস প্রকটিত হইয়াছে। আমরা ছাত্রজীবনের কথা এখানে আলোচনা করিতেছি। সুতরাং এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনার অবকাশ নাই। কিন্তু গান্ধী চরিত্রের মূল শক্তির উৎসটি কি তাহা যথার্থভাবে জানিলে ছাত্র গান্ধীজিকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করা সহজতর হইবে। ছাত্রজীবনের নানা কর্মের মধ্যেই ভাবীকালের ভারত-নায়ক মহাত্মা গান্ধীর সঞ্চার এবং তাহার ক্রমিক বিকাশ ঘটিয়াছে। ইহাতে দৈব প্রতিভার নাম গন্ধ নাই। অখণ্ড মানব প্রেম, সত্যবোধ ও সতত যত্নশীলতার সঙ্গে অপরিসীম ধৈর্য ও শ্রমশক্তি সেই ছাত্রজীবন হইতেই গান্ধী জীবন গঠনের চাবিকাঠি। গান্ধী জীবনের এই সার সত্য, গান্ধী চরিত্রের এই বিশিষ্টতা বিলাতে ব্যারিষ্টারি পড়িবার সময় আরও উজ্জ্বল হইয়া আমাদের নিকট প্রকটিত হইবে।

৪

ক্লাইড জাহাজ এক শনিবার অপরাহ্ণে সাউদাম্পটন্ বন্দরে নোঙর ফেলিল। গান্ধীজি বিলাতে পদার্পণ করিলেন। জাহাজে তিনি সুস্থই ছিলেন। তথাপি সমুদ্রজীবন তাঁহার আনন্দে কাটে নাই। আত্মীয় পরিজনের স্নেহচ্ছায়ার বাহিরে ইতিপূর্বে বস্তুতঃ তাঁহাকে কাটাইতে হয় নাই। পিতৃপ্রতিম দাদা, স্নেহশীলা মাতা, স্ত্রী ও পুত্রাদি রাখিয়া তিন বৎসরের জন্য একপ্রকার নির্বাসিতের জীবন যাপন করিতে চলিয়াছেন বলিয়া স্বাভাবিক মনোকষ্ট তো ছিলই পরন্তু তাঁহার লাজুক স্বভাবের জন্য তিনি জাহাজে নানা অসুবিধা ভোগ করেন। ধরিত্রীর ক্রোড়ে আমরা নিজেদের যেমন নিরাপদ ও স্বচ্ছন্দ মনে করি এমন আর কোথায়ও বোধ করি না। জাহাজ যত নিরাপদই হউক না কেন সমুদ্রের বুকে ভাসিয়া যাইতে একটা অজানা দুর্বোধ্য আশঙ্কায় আমাদের চিত্ত উদ্বেল হইয়া পড়ে এবং মাটির স্পর্শ পাইবার জন্য আমরা ব্যাকুল হই। সুতরাং আত্মীয়-বিরহ-বেদনা সত্ত্বেও আশা করা যায়, গান্ধীজি বিলাতের মাটিতে পদার্পণ করিয়া স্বস্তিবোধ করিয়াছিলেন। অনেক-দিনের কষ্টকর সমুদ্রযাত্রার পর বাঞ্ছিত ভূমি বিলাতের মাটির উপর দাঁড়াইয়া গান্ধীজির চিত্ত নিশ্চয়ই অপরূপ অব্যক্ত আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছিল।

বিলাস-বহুল ভিক্টোরিয়া হোটেলে গান্ধীজি প্রথম আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেখানকার রীতি নীতি ধরণ ধারণ তাঁহার অজ্ঞাত ছিল। নিরামিষ আহারের ব্যবস্থা নাই। দুই রাত্রি এখানে থাকেন। এক গাদা টাকা ব্যয় করিয়াও তাঁহাকে প্রায় অনাহারে কাটাইতে হয়। বিদেশ বিভূঁইয়ে এমন অবস্থার সম্মুখীন অনেকেরই হইতে হয়। সম্ভবতঃ ইহা অনুমান করিয়াই গান্ধীজি তৎকালীন লণ্ডন প্রবাসী চারজন খ্যাতিমান ভারতীয়ের নামে পরিচয় পত্র সঙ্গে করিয়া আনেন। ইহারা হইলেন—ডাঃ প্রাণজীবন মেটা, দলপৎরাম শুক্ল, দাদাভাই নৌরজী এবং রণজিৎ সিংজী।

ডাঃ মেটার সঙ্গেই গান্ধীজির প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। আত্মকথায় এই সাক্ষাৎকারের একটি অপূর্ব সুন্দর বিবরণ আছে। "তিনি আমাকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন।......আমি খেয়াল না করিয়াই তাহার রেশমের রোয়াদার টুপি নামাইয়া লইলাম এবং তাহার উপর উল্টাভাবে হাত বুলাইতে লাগিলাম। ইহাতে সেখানকার টুপির রোয়া খাড়া হইয়া গেল। ......তাড়াতাড়ি আমার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। কিন্তু দোষ যাহা হওয়ার তখন তাহা হইয়া গিয়াছে। তবে ইহার ফলে আমি ভবিষ্যতে সতর্ক হইবার শিক্ষালাভ করিয়াছিলাম।" ইহাই বোধ হয় বিলাতে গান্ধীজির প্রথম শিক্ষালাভ। ডাঃ মেটা বুঝিলেন গান্ধীজির সহবৎ শিক্ষার প্রয়োজন রহিয়াছে। কাহারও জিনিস ছুঁইও না; পরিচয় না থাকিলে কোন প্রশ্ন করিও না; উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিও না ইত্যাদি সচরাচর দরকার হয় এমন কয়েকটি নেতিবাচক বিষয় ডাঃ মেটা আলোচনা করিলেন। তৎকালে ভারতবর্ষে সাহেবদের সহিত কথা বলিতে 'স্যার' বলিয়া সম্বোধন করিবার রীতি ছিল। বিলাতে কেবল মাত্র মনিব ও উপরওয়ালাকে স্যার বলা হয়। অতএব স্যার বলার ব্যাপারেও তিনি গান্ধীজিকে সাবধান করিয়া দিলেন। এমনি ভাবে বিলিতি সমাজের আদব কায়দা ও চাল চলন সম্পর্কে গান্ধীজি প্রথম পাঠ গ্রহণ করিলেন। ইহার বহু বর্ষ পরে এই গুরু শিষ্যের সম্পর্কের বদল হয়। অর্থাৎ ডাঃ মেটা গান্ধীজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

বিলাতে গান্ধীজি অথৈ জলে পড়িলেন। হোটেল হইতে নিজে বাসা করিয়া উঠিয়া গেলেন। নিরিবিলিতে নিজের ঘরে বসিয়া গান্ধীজি স্বীয় মনের মুখোমুখি হইলেন। গান্ধীজির তৎকালীন মানসিক অবস্থার একটি চিত্রকল্প বর্ণনা এই: "দেশের কথা কেবল মনে হইত। মায়ের ভালবাসা মূর্তি ধরিয়া দেখা দিত। রাত হইলে চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে। ঘরের কথা মনে হইলে ঘুম আর আসে না।...... এখানকার লোক বিচিত্র, জীবনযাত্রা বিচিত্র, ঘরও বিচিত্র। বাড়ীতে

থাকার রীতি নীতিও অজানা। কি বলিলে কি করিলে রীতি ভঙ্গ হয় সে সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছিল না।" ইহার উপর নিরামিষ আহার্যের দুষ্প্রাপ্যতা তাঁহার পক্ষে বিশেষ বিড়ম্বনার কারণ হইল।

কিন্তু গান্ধীজি তো হটিবার পাত্র নন। **Owen Meredith** বলিয়াছেন, **Genius does what it must.** গান্ধীজির বেলায় এ কথা খুব খাটে। মহাত্মা গান্ধী কয়েক দিনেই মনটা শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিলেন। তিনি মনের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করিয়া কিরূপে চিত্তের চাঞ্চল্য দূর করিতেন তাহার একটু বিবরণ এই ঃ "এখন ভাল লাগুক আর নাই লাগুক দেশে ফিরিয়া যাওয়া চলিতেই পারে না। তিন বৎসর এখানে পূর্ণ করিয়া যাইতেই হইবে।" বিলাতে তিন বৎসরের জীবন গান্ধীজির ব্যারিষ্টারি পড়িবার কাল। সুতরাং সময়টা তাঁহার ছাত্র জীবনের অন্তর্ভুক্ত এবং সেই হেতু ইহা আলোচ্য প্রবন্ধের বিষয়বস্তু রূপে গৃহীত হইয়াছে। একথা আজ স্বীকৃত, যে সকল মূল আদর্শ ও বিশ্বাস ভবিষ্যতের মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও কর্মকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করিয়াছে তাহার অনেকগুলি এই আইন অধ্যয়নকালের বিলাত-প্রবাস জীবনে গান্ধী চরিত্রে ও চিন্তায় সঞ্চারিত হইয়াছিল।

ডাঃ মেটা নানাভাবে গান্ধীজিকে সাহায্য করেন। তাঁহার মতে "এদেশে আসিয়া পড়াশুনা করা অপেক্ষা অভিজ্ঞতা লাভ করার দরকার বেশী। এই জন্য কোন পরিবারের সহিত থাকা আবশ্যক।" যেমন ভাবনা তেমনি কাজ। গান্ধীজি রীচমণ্ডে ডাঃ মেটার বন্ধুগৃহে স্থিত হইলেন। গৃহস্বামী সজ্জন মানুষ। গান্ধীজি বলেন "তাঁহার ব্যবহার সদয় ছিল। আমাকে নিজের ভাইয়ের মত রাখিলেন, ইংরেজি রীতি নীতি শিখাইলেন ও ইংরাজিতে কথা বলার অভ্যাস করাইলেন।" নিরামিষাশী হইবার জন্য খাওয়াটা গান্ধীজির একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আসিবার সময় মাতৃদেবীর নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছেন আমিষ ভোজন করিবেন না। বিলাতে নিরামিষ ভোজ্য

সহজলভ্য নহে। নূন মশলা ছাড়া বিলিতি ধরনে রান্না করা সব্জি — সে কি ভারতবাসীর মুখে সহজে রোচে? "সকালে ওট মিলের জাউ (porridge) দিত উহা দিয়া পেট ভরাইতাম। দুপুরে ও সন্ধ্যায় প্রায় না খাইয়াই থাকিতে হইত।"

প্রায় অনাহারের এই কষ্টকর দিনগুলিতে মাংস খাইবার জন্য গান্ধীজির উপর নিত্য নিয়মিত চাপ সৃষ্টি হইত। দেশে স্কুলে পাঠদ্দশায় গান্ধীজি এক বিচিত্র যুক্তির ছলনায় মাংসাহারে প্রলুব্ধ হন। যুক্তিটি ছিল এই রকম: ইংরেজ শক্তিমান কারণ তাহারা মাংসাহারী। ভারতবর্ষ হইতে তাহাদের তাড়াইতে শক্তি চাই। সুতরাং শক্তিমান হইবার জন্যই মাংস খাওয়া দরকার। সে সময়ে স্কুলের ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক গীত একটি ছড়ার উল্লেখ পাই গান্ধীজির আত্মকথা গ্রন্থে:

"ইংরেজ রাজত্ব করে
দেশীকে রাখিয়া দাবিয়া
লম্বায় সে পাঁচ হাত পুরা
মাংসাহারী বলিয়া।"

বিলাত প্রবাস কালে গান্ধীজির মাংস আহারের প্রতিবন্ধকতা মাংসের প্রতি অনীহা নহে। স্বেচ্ছায় হোক আর ঘটনাচক্রেই হোক গান্ধীজি মাতৃদেবীকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তাহা কখনই ভঙ্গ হইতে পারে না; জীবনের বিনিময়েও নহে। ইহাই গান্ধী চরিত্র। এই চরিত্রই তাঁহাকে বড় করিয়াছে। দিনের পর দিন ক্ষুধার জ্বালা, অনেক শুভানুধ্যায়ী সজ্জন মানুষের শুভবুদ্ধি প্রযুক্ত অনুরোধ ও উপদেশ এবং পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ চাপ কোনটাই গান্ধীজিকে মাংস আহারে প্রবৃত্ত করাইতে পারে নাই। এমন কি জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়াও গান্ধীজি মাংসের সরুয়া পান করিবার জন্য ডাক্তারের সানুনয় অনুরোধ সবিনয়ে উপেক্ষা করিয়াছেন। সত্যরক্ষা যে গান্ধী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তাহা এমনই দুঃখ দহনের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে উদ্ভাষিত হইয়াছে। এ শক্তি ইচ্ছা মাত্র লাভ করা যায় না। দুঃসহ দুঃখের মূল্য ভিন্ন

অন্য কোন উপায়ে ইহা লভ্য নহে। ইহার জন্য নিত্য নিরন্তর প্রচেষ্টা থাকা চাই। গান্ধী জীবন এই নিরন্তর প্রচেষ্টার ইতিহাস। গান্ধীজি লিখিতেছেন ঃ "নিজেকে ঠিক রাখিবার জন্য রোজ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতাম।" গান্ধী জীবনে এই প্রার্থনারও একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। ইহা যথাস্থলে আলোচিত হইবে।

বিলাতে গান্ধীজি ঘন ঘন বাসস্থান বদলাইতেন। ডাক্তার মেটা ও দলপৎরামের উপদেশে তিনি রীচমণ্ড হইতে ওয়েষ্ট কেনসিংটনে জনৈকা ভারতীয় ফিরিঙ্গির গৃহে উঠিয়া গেলেন। এখানেও খাওয়ার অসুবিধা কিছু কমিল না। কিন্তু এই গৃহস্বামিনী গান্ধীজিকে লণ্ডনের নিরামিষ ভোজনালয়ের সন্ধান দিলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি একদিন একটি নিরামিষ ভোজন গৃহ পাইলেন। ইহা পাইয়া গান্ধীজির মনের অবস্থা হইল ঃ "ছেলেরা মনের মতন জিনিস পাইলে যেমন আনন্দ পায় আমারও তাহাই হইল!......বিলাতে আসার পর এই প্রথম পেট ভরিয়া খাইতে পারিলাম। ঈশ্বর আমার ক্ষুধা মিটাইলেন।" এইখানে নিরামিষ ভোজনের উপকারিতার উপর লিখিত অনেকগুলি পুস্তিকা দেখেন। তখনই তিনি বিখ্যাত হেনরি সল্টের A Plea for Vegeterianism বইখানা ক্রয় করেন। হেনরি জে. সল্ট ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করেন। কিশোর বয়সেই সমাজের ধন বৈষম্য দেখিয়া তিনি তাঁহার মাতৃদেবীর নিকট ইহার কারণ জানিতে চান। মাতা ধরাবাঁধা উত্তর দেন ঃ ইহাই হইতেছে পৃথিবীর নিয়ম। ধনী সঞ্চয়ের মাধ্যমে ধনবান হইয়াছে এবং দরিদ্র মানুষ মদ্যপান করিয়া ধনহীন হইয়াছে। জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই যুক্তির কোন মিল পাইলেন না ক্রমে ক্রমে তিনি মানবতাবাদী হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মানব-কল্যাণ ব্রত তাঁহাকে নিরামিষাশী করে। এডওয়ার্ড কার্পেণ্টারের লেখা পড়িয়া তিনি সরল সহজ জীবনযাত্রার প্রতি আকৃষ্ট হন। স্যাণ্ডাল বা চটি জুতা মুক্তির প্রতীক বলিয়া তাঁহার নিকট বিবেচিত হয়।

এতদিন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়াই মহাত্মা গান্ধী আমিষ আহার বর্জন

করিয়া চলিতেছিলেন। বিশ্বাসের জোর না থাকিলে নিবৃত্তিমূলক কোন কাজ করা খুবই কষ্ট-সাধ্য হয়। বিলাতের পরিবেশে গান্ধীজির নিরামিষ আহার এমনই একটা কষ্টসাধ্য কাজ হইয়া পড়ে। এই রকম সময়ে সল্ট সাহেবের বইখানি তাঁহাকে নূতন দিগন্তের সন্ধান দিল। এই বইখানি পড়িয়া তিনি লিখিয়াছেন—"বিচার পূর্বক নিয়ামিষ আহার সমর্থন করিতে লাগিলাম। মায়ের দেওয়া প্রতিজ্ঞা বিশেষ আনন্দ-দায়ক হইয়া উঠিল।" যাহা তিনি চাপে পড়িয়া স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা এখন বুদ্ধির আলোকে কল্যাণকর বিবেচিত হইল। এক কথায় গান্ধীজি নিরামিষ আহারের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইলেন। কাজের সমর্থন হৃদয় হইতে না পাইলে তাহা কখনই সুচারুরূপে সম্পাদন করা যায় না। উহা অনুষ্ঠানসর্বস্ব প্রাণহীন আচারে পর্যবসিত হয়। নিরামিষ আহার গান্ধীজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার জীবনধর্ম হইয়া ওঠে।

এই সকল ডামাডোলের মধ্যেও ব্যারিষ্টারি পড়িবার উদ্যোগ চলিতেছিল। ইনার টেম্পল, মিড্‌ল টেম্পল, লিঙ্কনস্ ইন এবং গ্রেজ ইন এই চারিটি স্থলে তৎকালে ব্যারিষ্টারি পড়িবার ব্যবস্থা ছিল। গান্ধীজি ১৮৮৮ সনের ৬ই নভেম্বর ইনার টেম্পলে ভর্তি হইলেন। কিন্তু পড়াশুনা রীতিমত সুরু হইতে তখনও দেরি ছিল। গান্ধীজি চুপচাপ বসিয়া থাকিবার লোক নন। তিনি এই সময় যে ফরাসী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাস করিয়াছিলেন তাহা আমরা ইতিপূর্বে অবগত হইয়াছি। এই সময়ে তিনি আরও যে সব কাজে হাত দেন তাহার মধ্যে নিম্নের তিনটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ

১ সংবাদপত্র পাঠাভ্যাস

২। নিরামিষ ভোজন প্রসারের আয়োজন, ও

৩। পাকা সাহেব বনিবার সাধনা।

দেশে থাকিতে গান্ধীজি খবরের কাগজ পড়েন নাই। এখনকার মত সেই সময়ে এত খবরের কাগজও ছিল না। ঐ সময়কার বিলিতি সংবাদপত্র তাঁহাকে একটি নূতন জগতের সন্ধান দিল। তিনি 'ডেলি নিউজ', 'ডেলি টেলিগ্রাম', 'পেলমেল' 'গেজেট', ইত্যাদি নানাবিধ কাগজ পড়িতে লাগিলেন। উনিশ শতকের শেষ-পাদের বিলিতি জীবনের সকল স্তর নূতনতর চিন্তার উত্তেজনায় অশান্ত ও অস্থির। ইহার পূর্ণ প্রকাশ ঘটিত সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়। বিশ্ব আলোড়নকারী আইরিশ হোমরুল, পার্ণেলিজিম, আইরিশ অপরাধ কমিশন, এমন কি স্বামী হত্যার জন্য মেব্রিকের বিচার প্রভৃতি ঘটনা যেমন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে তেমনি রাজনীতি ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রসার, নৈরাজ্যের প্রচার, ফেবিয়ানদের চিন্তা-আন্দোলন, থিয়োসফিষ্টদের প্রসার—সাহিত্য সঙ্গীত নৃত্যকলার ক্ষেত্রে নূতন চিন্তাধারার দ্বারা নূতন মূল্যবোধ জাগ্রত হইতেছে। উইলিয়াম কার্পেণ্টার ইহার একটি চমৎকার বিবরণ দিয়াছেন তাঁহার My Days and Dreams গ্রন্থে:

The whole structure of civilization and morality is being rapidly undermined. The moral aspect of property, commerce, class relations, sex relations, marriage, patriotism and so forth are shifting like dissolving views.

নূতন জীবন-পথের অনুসন্ধানের ফলে প্রকৃতি ও মানবতার প্রতি আকর্ষণ এবং অনুরাগ বৃদ্ধি পায়। ব্যক্তি জীবনের সম্পূর্ণতার প্রতি গুরুত্ব আরোপিত হইতে থাকে।

প্যারেলাল লিখিয়াছেন: The habit of newspaper reading that he had formed brought him in close touch with all these trends, conditioned his thinking on those questions in later years.

পরবর্তীকালে গান্ধীজি নিজে অনেকগুলি পত্রপত্রিকার সহিত

কখন প্রত্যক্ষভাবে কখনও বা পরোক্ষ ভাবে জড়িত হইয়া পড়েন। দক্ষিণ আফ্রিকার ইণ্ডিয়ান ওপীনিয়ন, ভারতবর্ষের নবজীবন, হরিজন, ইয়ং ইণ্ডিয়া প্রভৃতি কাগজ আজ ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করিয়াছে। গান্ধীজি লিখিয়াছেন—'সংবাদপত্র একটি প্রচণ্ড শক্তি।' এখানেও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গান্ধী উক্তিঃ "উচ্ছৃঙ্খল লেখার স্রোত ধ্বংসকারী। বাহিরের শাসনে যদি উচ্ছৃঙ্খল লেখা সংযত হয় তবে তাহা উচ্ছৃঙ্খলতা অপেক্ষাও অধিক বিষ ছড়ায়। ভিতর হইতে যে শাসন আসে তাহাতেই শুভ হয়।"

বিলাতে সংবাদপত্রের সহিত গান্ধীজির যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাহা চিরকাল বজায় ছিল। তিনি যখন অহোরাত্র কর্মব্যস্ত তখনও সংবাদপত্রে চোখ বুলাইবার সময় করিয়া লইতেন এবং পত্রপত্রিকার জন্য প্রবন্ধাদি রচনা করিতে বিরত হন নাই। আর বহুবর্ষ ধরিয়া তিনি ভারতবর্ষের তো বটেই, বিশ্বেরও বলা চলে, সংবাদ পত্রের প্রধান সংবাদ ছিলেন। একা গান্ধীজি সারা জীবনে সংবাদপত্রের যতটা স্থান জুড়িয়া রহিয়াছেন অন্য কোন মানুষ অতটা আছেন বলিয়া মনে হয় না।

গান্ধীজির প্রিয়তম বিষয়গুলির মধ্যে নিরামিষ আহার অন্যতম। ইতিপূর্বে জানিয়াছি ঘটনাচক্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ না হইলে হয়তো তিনি মাংসাশীই হইতেন। গান্ধী-জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি বিচার করিলে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে ঘটনার আবর্তে তিনি ভাসিয়া চলিয়াছেন। যাহা সামনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে সর্বশক্তি দিয়া তাহাই তিনি করিয়াছেন!

তিনি স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বেশি কাজ আরম্ভ করেন নাই। নিরামিষ আহারে আগ্রহের ফলে তিনি তৎকালে বিলাতের কয়েক-জন আদর্শনিষ্ঠ মানুষের সংস্পর্শে আসেন। সল্টের বইয়ের কথা একটু আগে বলা হইয়াছে। অন্য যে সব বই তাঁহাকে এ বিষয়ে প্রভাবিত করে তাহার মধ্যে পাই হাউওয়ার্ড উইলিয়মের— দি

এথিকস্ অব ডায়েট বা আহার নীতি; অ্যানা কিংসফোর্ডের উত্তম আহারের রীতি বা পারফেক্ট ওয়ে ইন ডায়েট।

বিলাতে এই সময়ে যাহারা নিরামিষ আহারের প্রতি আকৃষ্ট হন তাহাদের মধ্যে এডওয়ার্ড কার্পেন্টার একটি উজ্জ্বল নাম। তিনি অতি সাধারণ জীবন যাপন করিতেন। প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিতে পারে এমন অভ্যাস তিনি ত্যাগ করেন। যতটা সম্ভব খোলা মেলায় কাটাইতেন। দেহটিকে অনাবশ্যকভাবে আবৃত করিয়া রাখিবার অভ্যাস তিনি ত্যাগ করিবার পক্ষপাতি হন। কার্পেন্টারের এই মত দ্বারা গান্ধীজি বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হইলেন। ঐ সময়ে অনেক ইংরেজ যুবকও এই মতবাদের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া কাজকর্ম ত্যাগ করিয়া প্রকৃতির সান্নিধ্যে থাকিয়া শরীর শ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জনে প্রবৃত্ত হন। ইহাও যে গান্ধীজির মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য।

গান্ধীজি লোককল্যাণে নিরামিষ আহারের প্রচারে আত্মনিয়োগ করিলেন। যে অঞ্চলে তিনি থাকিতেন সেইখানেই নিরামিষ আহারের একটি মণ্ডলী স্থাপন করেন। ডাঃ ওল্ডফিল্ড ইহার সভাপতি হন। সহকারী সভাপতি ও সম্পাদক হইলেন যথাক্রমে গীতার বিখ্যাত অনুবাদক এডুইন আর্ণল্ড এবং আমাদের গান্ধীজি। সংস্থাটি বেশি-দিন চলে নাই। কিন্তু সেই ছোট এবং স্বল্পকাল স্থায়ী সংস্থার মাধ্যমে সাধারণ প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় গান্ধীজির হাতেখড়ি হইল। ঐ বিদ্যারম্ভ যে সার্থক হইয়াছিল তাহা আমরা আজ সহজেই বুঝিতে পারি। প্রকৃত প্রস্তাবে সমগ্র ভারতবাসীকে তিনি একদা পরিচালনা করিয়াছেন। গান্ধীজি লিখিতেছেন: "জনসেবার জীবনে আমার হাতে লাখো লাখো টাকা পড়িলেও তাহা যোগ্যতার ও সতর্কতার সহিত খরচ করিতে পারিয়াছি। যত আন্দোলন আমার হাত দিয়া হইয়াছে তাহাতে কখন আমি কর্জ করি নাই! বরঞ্চ দেখিয়াছি কার্যশেষে প্রত্যেকটিতে কিছু না কিছু জমাই আছে।" পরবর্তী

কালে ডাঃ ওয়েষ্ট ও পোলক সাহেব প্রভৃতি যোগ্য সহকর্মীদের তিনি নিরামিষ ভোজনের সূত্র ধরিয়াই পাইয়াছিলেন। অনেক অর্থও তিনি ইহার জন্য ব্যয় করিয়াছেন।

বিলাতে নিরামিষ আহারের প্রসারের জন্য মণ্ডলই থাকুক, আর এ বিষয়ে যত পুস্তকাদিই রচিত হোক, সাধারণ মানুষ নিরামিষাশীদের করুণার দৃষ্টিতেই দেখিত। গান্ধীজি পাকা সাহেব সাজিয়া প্রমাণ করিতে চাহিলেন মাংস না খাইলেও সাহেব হওয়া যায়। তাঁহাকে করুণা করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। "ইংরেজ ভদ্রলোক" হইবার এই প্রচেষ্টায় তিনি সেরা সেরা বিলিতি পোষাক কিনিলেন। যে গান্ধীজিকে আমরা সর্বপ্রকার বাহুল্য বর্জিত কটি মাত্র বস্ত্রাবৃত দেখিয়াছি তিনি এই সময়ে বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া চিমনি টুপি, সেরা সান্ধ্য পোষাক, ঘড়ির ভাল চেন, টাই ইত্যাদি সংগ্রহ করিলেন। কেশ বিন্যাসের দিকেও মনোযোগ দিলেন। পোষাক আষাক মাত্র হইলেই পুরা সভ্য হওয়া যায় না! নাচিতে জানা চাই। অতএব যোগ দিলেন নাচের স্কুলে। সুর তাল মান বোধ না থাকিলে নাচ শেখা যায় না। সুতরাং কেনা হইল বেহালা। নিযুক্ত লইলেন বেহালা শিক্ষিকা। হঠাৎ একদিন গান্ধীজির চৈতন্য হইল: "আমি বিদ্যার্থী। আমার যে বিদ্যাধন সঞ্চয় করা দরকার।" পোষাক আষাক নাচ গান দিয়া তো তাহা হইবে না। চেতনায় একবার কোন কিছু ধরা পড়িলে তাহা কার্যে রূপান্তরিত করিতে বিলম্ব গান্ধীজির অসহ্য ছিল। সেই মুহূর্তে তিনি তথাকথিত সভ্য হইবার ঝোঁক ত্যাগ করিলেন। "সভ্য" হইবার বাসনা তাঁহাকে সম্মোহিত করিয়া রাখিয়াছিল। পাকা সাহেব হইবার সাময়িক খেয়ালের ক্রিয়াকর্ম তুচ্ছ মনে হইল। দামী পোষাক মানুষকে রক্ষা করিতে পারে না। গান্ধীজির উপলব্ধি হইল: "আমার আচারের শুদ্ধতাই আমাকে রক্ষা করিবে।" এই আচারের শুদ্ধতার মধ্যেই গান্ধীজীবনের রহস্য নিহিত তাহা আমরা চর্মচক্ষে দেখিয়া ধন্য হইয়াছি।

শুদ্ধ আচরণের দ্বারা রক্তমাংসের দেহধারী মানুষও দেব চরিত্রের অধিকারী হইতে পারেন। গান্ধীজি কোটি কোটি মানুষের নিকট দেবতা বলিয়া বিবেচিত হইতেন—যে পথে তিনি হাটিয়া গিয়াছেন তাহার ধুলিমুঠি সংগ্রহ করিয়া রাখিতে বহুজনে ব্যাকুল হইতেন। ইহা সামান্য কথা নহে। ইহার মূল উৎসটি শুদ্ধ আচরণের মধ্যে নিহিত। ইহা কোন ম্যাজিক বা যাদু প্রভাবে ঘটে না।

ভারতবর্ষের ভক্ত মানুষের আচরণ লইয়া অনেকে বক্রোক্তি করিয়াছেন। কিন্তু সকলের জন্য সাধারণ মানুষ এই রকম আচরণ করেন না। সামান্য যে কয়েকজনের জন্য অনুরূপ করিয়াছেন, তাঁহাদের চরিত্রে দেবত্ব বিকশিত হইয়াছিল বলিয়াই করিয়াছেন। এই সত্যে সন্দেহ পোষণ করিলে মানুষের প্রতি সুবিচার করা হয় না।

আলোচ্য ঘটনার পর হইতে গান্ধীজির জীবনে গভীর পরিবর্তন আসিল। তিনি পড়াশুনায় মন দিলেন। আত্মকথায় লিখিতেছেন: "আমি সভ্য হইবার প্রযত্ন ত্যাগ করিয়া কঠোর পরিশ্রমী ছাত্র হইয়া উঠিলাম।" কার্যক্রম স্থির করিয়া দিনচর্যার মিনিট পর্যন্ত বাধিয়া ফেলিলেন। ইহার বহুবর্ষ পরে উন্মত্ত হিংসার শ্মশানভূমি নোয়াখালিতে জীবন সায়াহ্নে ৭৭ বৎসর বয়সে মানব অভ্যুদয়ের সাধনায় গান্ধীজি যখন নিজকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন সেই সময়ে তাঁহার দিনচর্যার উপাদেয় বিবরণ দিয়াছেন অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু, শ্রীমতী মানু গান্ধী প্রভৃতি। এখানেও দেখি সেই ঘণ্টা মিনিট বাধা। আমরা যাহারা কোন একটা কাজ হাতে আসিলেই আর পারি না বলিয়া কাতরাইতে থাকি অথবা সময় নাই বলিয়া এড়াইতে চাই তাহাদের এই দিনচর্যাটি জানা প্রয়োজন। অন্যদেরও ইহা প্রেরণা স্বরূপ হইবে নিশ্চয়।

নোয়াখালিতে দিনচর্যা

ভোর ৪॥০ টা। ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে নিত্যকর্মের সুরু। হাত মুখ ধোওয়া। প্রার্থনা।

প্রার্থনার পরেই কর্মারম্ভ। [নোয়াখালিতে এই সময় সাধারণতঃ বাঙলা শিক্ষা করিতেন। পড়া এবং হাতের লেখা।]

৭ টা। প্রাতর্ভ্রমণ। [ভ্রমণ করিবার সময় সাক্ষাৎ-প্রার্থীদের সহিত আলাপ করিতেন।] ফিরিয়া আসিয়া শৌচাগারেই সংবাদপত্র পাঠ সারিয়া লইতেন। শৌচের পর তৈলমর্দন। একদিন অন্তর একদিন দাঁড়ি কামানো। অপর লোকে তাঁহাকে তৈল মাখাইয়া দিত। ইহার জন্য একঘণ্টা সময় লাগিত। তৈলমর্দনের পর একবার শৌচাগারে যাইতেন। অতঃপর স্নান।

স্নানের পরই খাইবার পালা। গান্ধীজি খুব ধীরে ধীরে অনেক সময় ধরিয়া খাইতেন, অন্যলোকে এই সময় তাঁহাকে প্রয়োজনীয় চিঠি পত্র পড়িয়া শুনাইতেন। খাইবার পর বিশ্রাম।

বারটা নাগাদ দুপুরের কাজ আরম্ভ হইত। তিনি তখন প্রয়োজনীয় চিঠি পত্রের উত্তর লিখিয়া দিতেন। ইহার পর আবার একবার বিশ্রাম এবং পেটে মাটির পুলটিস্ গ্রহণ।

তিনটায় চরকা কাটিতে বসিতেন। চরকা কাটিবার সময় বিভিন্ন খবরের কাগজের প্রয়োজনীয় অংশ শুনিতেন।

সূতাকাটার পর অভ্যাগতদের সহিত সাক্ষাৎকার। ৫॥ টার পূর্বে দিনের শেষ আহার।

৫॥ টায়—প্রার্থনা সভা বা সমবেত প্রার্থনা। প্রার্থনার পর আধ ঘণ্টা সান্ধ্য ভ্রমণ। ফিরিয়া আসিয়াই চিঠি পত্র বা 'হরিজনে'র জন্য প্রবন্ধ লিখিতে বসিতেন। কখন কখন অন্তরঙ্গ লোকজনের সহিত আলাপ আলোচনাও করিতেন।

৯॥ টায় শুইয়া পড়িতেন। শুইবার পূর্বে একবার পায়খানায় যাইতেন।

সেই বিলাতে ছাত্রাবস্থায় যে ঘণ্টা মিনিট বাধিয়া কাজ করা সুরু হইয়াছিল মৃত্যু পর্যন্ত তাহাতে ছেদ পড়ে নাই। সময় কখন অকারণে নষ্ট হয় ইহা তিনি বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। এ সম্পর্কে নির্মল

বাবু একটি নির্ভরযোগ্য খবর দিয়াছেন গান্ধী চরিত গ্রন্থে। জনৈকা আমেরিকান মহিলা গান্ধীজির দর্শন প্রার্থী হইয়া আসেন। অপ্রয়োজনে অনেকটা সময় নষ্ট করার পর তিনি গান্ধীজীর নিকট প্রশ্ন করেন "আমি আপনার ব্রত উদ্‌যাপনে কি করিয়া সাহায্য করিতে পারি?" গান্ধীজির উত্তর হইল ঃ "আমার সময়ের প্রতি মুহূর্ত বাঁচাইতে দিয়া"। সময় সম্পর্কিত এই রকম অনেক কথা অনেকে লিখিয়াছেন। প্রতিটি মিনিটের সদ্ব্যবহারের দিকে তাঁহার সজাগ দৃষ্টি ছিল। লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের সময় তিনি সাধারণত দিনে ২১ ঘণ্টা খাটিতেন। কাজের চাপ অনুসারে খাটুনি বাড়িত বা কমিত। কিন্তু শৃঙ্খলার অভাব কখনও ঘটিত না।

লোক লজ্জার ভয়—হয়তো বা খানিকটা লোভও ব্রাইটনে গান্ধীজিকে একদা মিথ্যাকথনে প্রলুব্ধ করিয়াছিল। একটি অকপট চিঠি লিখিয়া তিনি এই দুঃখজনক ঘটনার অবসান ঘটান। গান্ধীজির বিচারশীল মন এবং সত্যের প্রতি সদাজাগ্রত চেতনা তাঁহাকে পতনের হাত হইতে চিরকাল রক্ষা করিয়াছে।

হরিজন পত্রিকায় মহাদেব দেশাইয়ের প্রবন্ধে এ সম্পর্কে গান্ধীজির একটি চমৎকার কথা উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা এই ঃ "একটি জিনিস ছিল এবং তাহাই আমাকে চালাইয়া নিয়াছে। ইহা সত্যের বর্মাচ্ছাদন। ইহাই আমাকে রক্ষা করিয়াছে এবং বাঁচাইয়াছে। আমার জীবনের মূল ভিত্তিই সত্য। সত্য হইতে ব্রহ্মচর্য এবং অহিংসা পরে উৎপন্ন হইয়াছে।"

ইতিমধ্যে গান্ধীজি প্যারিস ঘুরিয়া আসিয়াছেন। উপলক্ষ ১৮৯৯-এর প্রদর্শনী। এবার ব্যারিষ্টারি ফাইনাল পরীক্ষার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। ভর্তির দুই বৎসর পরেই যে কেহ ফাইনাল পরীক্ষায় বসিতে পারিতেন। এখানে সত্যিকারের পড়াশুনার চাইতে খাওয়া-দাওয়ার বহর বেশী। সে জন্য এই ব্যারিষ্টারগণকে ঠাট্টা করিয়া ভোজের ব্যারিষ্টার বলিত। গান্ধীজি তাঁহার সরল ভঙ্গীতে লিখিতেছেন ঃ

"ব্যারিষ্টার হওয়ার জন্য দুইটি জিনিস দরকার। প্রথম টার্ম অর্থাৎ সর্ত রক্ষা করা। দ্বিতীয় আবশ্যক হইতেছে আইনের পরীক্ষা দেওয়া। প্রত্যেক টার্মে প্রায় ২৪টি করিয়া খানা হয়—তাহার মধ্যে ছয়টা অন্তত খাওয়া চাই। খানা খাওয়া মানে খাইতেই হইবে এমন নিয়ম নাই। কেবল নির্দিষ্ট দিনে হাজিরা দিয়া খানা খাওয়ার সময় উপস্থিত থাকা আবশ্যক। ...অপরদিকে পাঠ্যক্রম খুবই সহজ ছিল। রোমান আইন ও ইংলণ্ডীয় আইনে মাত্র পরীক্ষা দিতে হইত।" ছোট ছোট নোট বই পড়িয়া পরীক্ষা দিয়াই শতকরা ৯৫ হইতে ৯৯ জন পাস হইত। গান্ধীজি সে ফাঁকিবাজির মধ্যে গেলেন না। তিনি আইনের মূল বই পড়িয়া পরীক্ষা দেন। ১৮৯০ সনের ৫ই হইতে ২০শে ডিসেম্বরের মধ্যে তাঁহার পরীক্ষা হয়। পরের ১২ই জানুয়ারি ফল প্রকাশিত হইল এবং বলা বাহুল্য, গান্ধীজি সহজেই পাস করিলেন। কিন্তু নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোজে যোগদান করা হয় নাই বলিয়া ব্যারিষ্টারি পাসের সনদ পাইবার জন্য তাঁহাকে জুন মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়। ভোজের সর্ত পালন করিয়া ১০ই জুন তিনি ব্যারিষ্টারির সনদ পাইলেন। পরদিন ১১ই জুন হাইকোর্টে আড়াই শিলিং জমা দিয়া নাম তালিকাভুক্ত করিলেন। ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিলাত আসা, সে কার্য যখন সমাপ্ত হইয়াছে তখন আর বৃথা কালক্ষেপ কেন। পরের দিন ১২ই জুন তিনি স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করেন।

পূর্বেই আমরা জানিয়াছি বৃথা সময় নষ্ট করা গান্ধী চরিত্র বিরোধী ছিল। পরীক্ষা পাস আর সনদ প্রাপ্তির মধ্যবর্তী প্রায় পাঁচ মাস সময়ে গান্ধীজিকে আমরা নূতন একটি কর্মে প্রবৃত্ত হইতে দেখি। প্রবন্ধকার গান্ধীজি। এই সময়ে তিনি দশটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। ছয়টি প্রবন্ধ নিরামিষ আহার বিষয়ক ভারতীয় চিন্তা এবং তিনটি ভারতবর্ষের উৎসবের উপর। এগুলি The Vegetarian পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। দশম প্রবন্ধটির নাম The Foods in India. ইহা প্রকাশিত হয় The Vegetarian Messenger

পত্রিকায়। এই প্রবন্ধগুলির পাঠকের নিকট ভবিষ্যতের মহাত্মা গান্ধী দুর্নিরীক্ষ নন।

জীবন গঠনের সেরা তিনটি বৎসর গান্ধীজি বিলাতে কাটান। এই সময়ে অনেক 'বড় ইংরেজের' সংস্পর্শে তিনি আসেন। গীতার সহিত তাঁহার এখানেই পরিচয় ঘটে। বিলাতের হেনরি ডেভিড এডওয়ার্ড কার্পেণ্টারের মত লোকের "Cult of simple living—, সপ্তাহে এক পাউণ্ডের মধ্যে জীবন নির্বাহকারী আইরিশ এম. পি'র দল ও বিলাস বৈভব ত্যাগে উদ্বুদ্ধ অনেক আদর্শবাদী ইংরেজকে তিনি খুব নিকট হইতে দেখিবার সুযোগ পান এবং এই রকম আদর্শবাদী বহুজনের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভে সমর্থ হন। অনেকের সহিত এক-যোগে কাজও করিয়াছেন। সাধারণভাবে সৎ ইংরেজের শৃঙ্খলা-পরায়ণতা, সরলতা, গাম্ভীর্য, মিতাচারী সাধারণ বুদ্ধি, ভগবদ্বিশ্বাস প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী তাঁহাকে বিপুল ভাবে ইংরেজপ্রেমিক করিয়া তোলে। ইহা তাঁহার চিন্তা, কর্ম ও জীবন-চর্চাকেও বেশ প্রভাবিত করে। বিশ বৎসর পরে, গান্ধীজি যখন ইংরেজ সাম্রাজ্য-স্বার্থের পহেলা নম্বরের শত্রু তখনও তিনি যোশেফ ডেকের নিকট সহজে বলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন: Even now next to India I would rather live in London than in any part of the world. গান্ধী-জীবনের অনুরাগী পাঠকমাত্রেই স্বীকার করিবেন এই উক্তিকে কোন বিচারেই অতিশয়োক্তি বলা যায় না।

গান্ধীজির জীবনের মূল ভিত্তি সত্য। এই ভিতের উপর তাঁহার যে জীবন-ইমারত গঠিত হইয়াছে উহার প্রয়োজনীয় বিস্তর মাল মশলা ঐ ব্যারিষ্টারি অধ্যয়নের দিনগুলিতে সংগৃহীত। প্রয়োজনীয় বিলিতি জিনিসও গান্ধীজি গ্রহণ করিতেন, কখনও দ্বিধা করেন নাই। কিন্তু সর্বদাই দেশহিতে লোকহিতে তিনি তাহা দেশকালোপযোগী করিয়া 'শোধন' করিয়াই গ্রহণ করিতেন। এইখানেই গান্ধীজির অনন্য-সাধারণ কৃতিত্ব। অনুমান করা যায় পঠদ্দশায়ই তিনি জ্ঞাত হন—

পৃথিবীর সার সত্য সকল দেশে এক, কিন্তু দেশভেদে লোকভেদে তাহার প্রয়োগ ভিন্ন, তাহার আকৃতি প্রকৃতি পৃথক।

ব্যারিষ্টারি পাস করিবার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজির ছাত্রজীবন শেষ হইল। কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন ব্যারিষ্টারি পাস করা যত সহজ ব্যারিষ্টারি করা তত সহজ নহে। বোম্বাইয়ে কর্মহীন ব্যারিষ্টারি জীবনে তিনি স্কুল শিক্ষকের চাকুরির দরখাস্ত করেন। লোকনায়ক গান্ধীজি ছাত্র শিক্ষকতাও করিয়াছেন।

শিক্ষক-জীবন

লোক-শিক্ষকরূপে গান্ধীজি বিশ্বজোড়া খ্যাতির অধিকারী হইয়াছেন। বর্তমান বিশ্বে মানুষ স্বীয় বিশ্বাস ও স্বধর্মানুসারী মহৎ মঙ্গল লাভ করিবার আকাঙ্খায় হিংসা, অসত্য ও অনীতির আশ্রয় গ্রহণকে ঘৃণ্য মনে করিতেছে না। এই আত্মঘাতী ও ভ্রান্ত পথযাত্রী বিশ্বমানব সমাজের সম্মুখে মহাত্মা গান্ধী মূর্তিমান প্রতিবাদ স্বরূপ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। জীবনের সর্বক্ষেত্রে, সে পারিবারিক হউক বা বিশ্বজনীন হউক, মানুষকে তিনি সত্য ও অহিংসা, সংযম ও সর্বোদয়ের শিক্ষা দান করিয়াছেন। স্থায়ী শান্তি ও সমৃদ্ধি লাভের আর কোন বিকল্প পথ নাই। গান্ধীজির এই শিক্ষা যাহারা গ্রহণ করিতে পারেন নাই তাহারাও ইহার ন্যায্যতা স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহার জীবনে ইহা শুধুমাত্র কেতাবী শিক্ষা ছিল না। তিনি আপনি আচরি ধর্ম অপরকে শিখাইয়া গিয়াছেন। জীবনের কোন ক্ষেত্রেই তিনি নিজে যাহা করিতে সমর্থ হইতেন না অপরকে তাহা পালন করিবার নির্দেশ কখনও দেন নাই। শিক্ষকতার ক্ষেত্রেও ইহা সত্য। দক্ষিণ আফ্রিকায় টলস্টয় ফার্মের বালকবালিকাদের শিক্ষাদানের জন্য নানা কারণে বাহিরের কোন শিক্ষক নিয়োগ করা সম্ভবপর হয় নাই। সহকর্মীদের সহায়তায় গান্ধীজি নিজেই পড়াইতে আরম্ভ করেন। এখানেও, শুরু হইতেই তিনি নিয়ম

করেন শিক্ষকগণ নিজেরা যে কাজ করিবেন না বালকবালিকাদের দ্বারা সে কাজ করানো হইবে না। সার্থক শিক্ষক হইতে হইলে এই গুণটি যে অপরিহার্য তাহা প্রায় সকল শিক্ষাবিদই সাধারণভাবে স্বীকার করিয়া থাকেন।

মহাত্মাজি সারা জীবনে নানা পরিবেশে শিক্ষকের কাজ করিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষাদান কার্যের সূত্রপাত হয় স্ত্রী কস্তুরবাঈকে কেন্দ্র করিয়া। অল্প বয়সে ছাত্রাবস্থায়ই গান্ধীজির বিবাহ হয়। কস্তুরবাঈ নিরক্ষর ছিলেন। বিবাহের পরই গান্ধীজি তাঁহাকে লেখাপড়া কিছু শিখাইতে উদ্যোগী হন। কিন্তু এই প্রচেষ্টা তখন বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই।

বিলাত হইতে ফিবিয়া গান্ধীজি কস্তুরবাঈয়ের নিরক্ষরতা দূর করিতে পুনরায় উদ্যোগী হন। পরেও দু একবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি কোন বিস্ময়কব সাফল্য অর্জন করিতে পারেন নাই। তবে কস্তুরবাঈ-এর নিরক্ষরতা দূর হইয়াছিল।

গান্ধীজি বোম্বাইয়ে আইন ব্যবসায় স্বুরু করেন। কিন্তু অনেকদিন যাবৎ তেমন কোন রুজি রোজগার হয় না দেখিয়া তিনি সংসার খবচ চালাইবার জন্য শিক্ষক পদপ্রার্থী হন। ঘটনাচক্রে সে চাকবী তাঁহার হয় নাই। এক স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রতিদিন একঘণ্টা ইংরাজি পড়াইবার নিমিত্ত ৭৫৲ টাকা বেতনে একজন গ্রাজুয়েট শিক্ষকের জন্য বিজ্ঞাপন দেন। গান্ধীজি লণ্ডনের ম্যাট্রিকুলেট, তাঁহাব দ্বিতীয় ভাষা ছিল লাটিন। অতএব সাধারণ গ্রাজুয়েট অপেক্ষা তাঁহার যোগ্যতা অধিকই বলিতে হইবে। তথাপি কর্তৃপক্ষ নিয়ম শিথিল করিতে পারিলেন না। গান্ধীজির চাকরী হইল না।

বিলাত হইতে ফিরিয়া গান্ধীজি ভ্রাতুষ্পুত্র ও পুত্র প্রভৃতি বাড়ির ছেলেদের পড়ানোর আয়োজন করেন। তিনি পুরাতন শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কার করিতেও উদ্যোগী হইলেন। গান্ধীজি লিখিয়াছেন "স্থির করিলাম—এই ছেলেদিগকে দিয়া ব্যায়াম করাইব, তাহাদিগকে শক্ত করিব, আমার সঙ্গ দান করিব।" স্কুলে ছাত্রাবস্থায় ব্যায়ামের প্রতি

গান্ধীজির অনাগ্রহ ছিল। তিনি মনে করিতেন ব্যায়ামের সহিত শিক্ষার কোন সম্বন্ধ নাই। পরে নিজের শিক্ষক জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—'বিদ্যাভ্যাসের মধ্যে শারীরিক শিক্ষাকে মানসিক শিক্ষার মতই স্থান দেওয়া উচিত।"

ছাত্রদিগকে সঙ্গ দান বিষয়ে গান্ধীজির মতামত খুবই স্পষ্ট দক্ষিণ আফ্রিকায় নিজ সন্তানদের শিক্ষা দিতে গিয়া গান্ধীজি এ বিষয়ে বিশেষ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তিনি আত্মজীবনীতে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, "ছেলেদের মাতা পিতার নিকট হইতে দূরে রাখিতে নাই। সুব্যবস্থিতগৃহে ছেলেরা যে শিক্ষা পায় স্কুল বোর্ডিংএ তাহা পাইতে পারে না"। গান্ধীজির পুত্রগণ কেহই প্রচলিত শিক্ষা তেমন পান নাই। তথাপি গান্ধীজি মনে করিতেন যে তাঁহার তত্ত্বাবধানে প্রত্যেকেই ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করিয়াছে এবং তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থাকিবার ফলে "তাহারা স্বাধীনতার যে দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইয়াছে, যদি আমি তাহাদিগকে কোন স্কুলে পাঠাইবার আগ্রহ করিতাম তাহা হইলে তাহারা তাহা পাইত না এবং তাহাদের সম্বন্ধে যে নিশ্চয়তা আজ আমার আছে তাহাও থাকিত না"। শিক্ষক জীবনের দীর্ঘ ও ব্যাপক পরীক্ষা নিরীক্ষা সঞ্জাত অভিজ্ঞতা হইতেই গান্ধীজি একথা বলিয়াছেন। আজকাল বোর্ডিং স্কুলের চাহিদা বাড়িয়াছে। তাহাতে পরীক্ষার ফল ভাল হয়। কিন্তু শিক্ষা কি কেবল পাস হইবার জন্যই ?

এ বিষয়েও গান্ধীজি স্বীয় শিক্ষক জীবনের অভিজ্ঞতা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। জোহান্সবার্গ শহর হইতে ২১ মাইল দূরে ছিল টলষ্টয় ফার্ম। এইখানেই যে গান্ধীজি শিক্ষকতা আরম্ভ করেন তাহা পূর্বে বলিয়াছি। তাঁহার পড়াইবার প্রণালী ছিল প্রচলিত রীতি হইতে স্বতন্ত্র। যে পদ্ধতিতে পড়াইতেন তাহা আলোচনা করিয়া তিনি লিখিয়াছেন ঃ --"আমি হৃদয়ের বিকাশকে ও চরিত্র গঠনকে বরাবরই প্রধান স্থান দিয়া আসিয়াছি।.... চরিত্র গঠন সকল শিক্ষার ভিত্তি বলিয়া আমি মনে করিতাম। সেই ভিত্তি যদি পাকা হয়, তবে

বালকেরা অন্য সকল শিক্ষাই, অবকাশ মত সাহায্য লইয়া নিজেরাই গ্রহণ করিতে পারিবে।" আজ চতুর্দিকে পরীক্ষা প্রহসনে পরিণত হইয়াছে। নকল ও নানা গোলমালে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলি বিভীষিকাস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা ছাত্রগণকে শিক্ষিত করিতেছি কিন্তু চরিত্রবান করিতে পারিতেছি না বলিয়াই যে এমনটি ঘটিতেছে তাহা সকলেই স্বীকার করেন। আদর্শ মাতা-পিতা ও আদর্শবান শিক্ষক ভিন্ন কোন আইনের দ্বারা বা সুবিধা সুযোগ দিয়া ইহা হইবার নহে। গান্ধীজি শিক্ষক হিসাবে শরীর শিক্ষা, বুদ্ধির ও আত্মার শিক্ষার সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটি কঠোর সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন: ছাত্রগণকে সংযম শিক্ষা দিতে হইলে শিক্ষককেও সংযমী হইতে হইবে। ইহার বিকল্প হয় না।

গান্ধীজি নিজে কোন ছাত্রকে পুরা একখানি বই পড়াইতে পারেন নাই। ছেলেদের অনেকগুলি করিয়া বই তিনি দিতেন না। নানা স্থানে নিজে যাহা পড়িতেন তাহাই আপনার ভাষায় ছাত্রদের বলিতেন। তাঁহার ধারণা "শিক্ষক নিজেই হইবেন পাঠ্য পুস্তক।" গান্ধীজি ছাত্রদের পড়ার আকাংখা বাড়াইতে যত্ন লইতেন; আর তাহাদের অশুদ্ধিগুলি মাত্র সংশোধন করিয়া দিতেন। ইহাতে তিনি চমৎকার ফল পান।

মহাত্মাজি মনে করিতেন ভাল শিক্ষক হইবার যোগ্যতা তাঁহার আছে। বিলাত হইতে ফিরিয়া ভাইয়ের ছেলে ও নিজের ছেলেকে লইয়া শিক্ষকতা করিবার পর গান্ধীজির এই ধারণা হয়। তিনি লিখিয়াছেন: "ছেলেদের শিক্ষকের কাজ আমি ভালই করিতে পারি।" গান্ধীজি যে একজন সার্থক শিক্ষকও ছিলেন সে কথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে এখন আর কেহ কুণ্ঠিত নন।

শিক্ষক মহাত্মাজি তাঁহার শিক্ষাদান কার্যের অভিজ্ঞতার আলোকে একটি নূতন শিক্ষা পদ্ধতি রচনা করিয়া গিয়াছেন। বুনিয়াদী শিক্ষা নামে ইহা সাধারণ্যে পরিচিতি লাভ করিয়াছে। ইহার উৎকর্ষ অপকর্ষ আলোচনা করিবার যোগ্যতা আমার নাই; কারণ সে জন্য বিশেষ

জ্ঞানের অধিকার থাকা প্রয়োজন। তবে বর্তমানে বুনিয়াদী শিক্ষার নামে যাহা চলিতেছে তাহার ফলাফল দেখিয়া গান্ধী প্রবর্তিত শিক্ষা-পদ্ধতি সম্পর্কে নিরাশ হইবার যে কারণ নাই তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়। কারণ হাতে হাতিয়ারে শিক্ষা যে বই পড়া বিদ্যা অপেক্ষা শ্রেয়তর তাহা তো আমাদের বহুজনের নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা। মানব শিশুর জীবনেও শিক্ষা সুরু হয় হাত দিয়া, মস্তিষ্ক দিয়া নহে। শিশুকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় নাক কই—সে তখন তাহার ক্ষুদ্র হাতখানি দিয়া নাকটি স্পর্শ করিয়া বলে—এই নাক। হাত দিয়া শিক্ষার সুরু এবং হাতের দ্বারাই ইহা পূর্ণতা লাভ করিতে সমর্থ—শিক্ষক গান্ধীজির এই কথা স্মরণ করিয়া আজিকার প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিলাম। অবশ্য শিক্ষক গান্ধী-কথার শেষ হয় না। কারণ যতদিন জীবন ততদিন শিক্ষা—। সুতরাং শিক্ষক গান্ধীর কথার সমাপ্তি নাই।

সূর্যোদয়

সকল মানুষের জীবনে এমন দুই চারিটি ঘটনা অকস্মাৎ ঘটে যাহার ফলে দীর্ঘ দিনের অভ্যস্ত চিন্তা ভাবনার ভিত্তিমূল টলিয়া যায় এবং জীবনের নানা মূল্যবোধের আমূল পরিবর্তন ঘটে। গান্ধী জীবনের প্রারম্ভকালেও এমন কয়েকটি ঘটনার সাক্ষাৎ আমরা পাই।

স্বচ্ছল জীবন, সহজ জীবিকা, অভিজাত সামাজিক মর্যাদা প্রভৃতি যাহা কিছু সাধারণ দশজন মানুষের স্পৃহনীয় তাহারই আশায় গান্ধীজি নানা প্রতিকূলতার মধ্যে বিলাত গিয়া ব্যারিস্টার হইয়া আসেন। অনেক ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া আইন ব্যবসায়ে তিনি সাফল্য লাভ করেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁহার মাসিক আয় বাড়িতে বাড়িতে দশ পনের হাজার টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছিল। এই মানুষ কেমন করিয়া সর্বত্যাগী হন, কিসের আকর্ষণে কঠোর জীবন যাপনে প্রবৃত্ত হন—তাহা এক মহাবিস্ময়। দুঃখ বরণ ও আত্ম নিগ্রহের পথে চলিয়া তিনি ভারতবর্ষের মুক্তি যুদ্ধের অবিসম্বাদী নেতা হন। ভীত ও দলিত ভারতবাসীকে তিনি সত্য, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য, অস্বাদ, অস্তেয়, অপরিগ্রহ, অভয়, কায়িক শ্রম প্রভৃতি ব্রতের পথে মানুষের মর্যাদায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার এই কর্ম প্রচেষ্টাকে আমরা গান্ধীবাদ বলিয়া থাকি। গান্ধীজি অবশ্য কখনও গান্ধীবাদ বলিয়া কোন কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না।

সকল মহৎ কর্মের পিছনে একটি তত্ত্ব থাকে। অর্থাৎ আগে তত্ত্বের উদ্ভব পরে কর্মের প্রবর্তনা। কিন্তু গান্ধীজি ছিলেন উল্টো পথের পথিক। তিনি কোন তত্ত্ব প্রচার করেন নাই। চিরকালের সত্যকে বর্তমানকালের প্রয়োজন সাধনের উপযোগী করিয়া প্রয়োগ করিয়াছেন মাত্র। তাঁহার কর্মকে আমরা তত্ত্বের আধারে ধরিয়া গান্ধীবাদ নাম দিয়াছি। তাই যে সকল ঘটনা ও কাজকর্মের প্রভাবে ধীরে ধীরে ব্যারিষ্টার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর বিলোপ ঘটিল এবং মহামানব মহাত্মা গান্ধী বা গান্ধী সূর্যের উদয় সম্ভব হইল তাহারই কয়েকটি এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। তাঁহার কর্মজীবনের প্রারম্ভকালের এই ঘটনাগুলি তাঁহাকে এই অনিবার্য পরিণতির পথে লইয়া যায় বলিলে আশা করি ভুল হইবে না।

মহাত্মাজি ছিলেন ক্ষীণকায়। আমরা তাঁহাকে মুণ্ডিত মস্তক ও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত দেখিয়াছি। পোষাকে আষাকে, আকারে আকৃতিতে বৈচিত্র্যহীন সেই ক্ষীণতনু মানুষটি বর্তমান কালের লোভ-লালসা দ্বন্দ্বসংঘাত-পীড়িত পৃথিবীর অশান্ত মানুষকে নূতন করিয়া সত্য ও সেবা, ত্যাগ ও সরলতা, অস্তেয় ও অপরিগ্রহ এবং অহিংসা ও সত্যাগ্রহের কথামৃত শুনাইয়াছেন। ব্রতধারীর ন্যায় তিনি এগুলি পালন করিয়া আমাদের শিখাইয়াছেন। সর্বমানবের ঐক্যে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। সে ঐক্য শক্তির উৎসের সন্ধান তিনি পান হৃদয়ের সর্বপ্লাবী ভালবাসায়, বন্দুকের নলে নহে। মানুষ আমার ভাই— ইহাই হইয়া উঠিয়াছিল তাঁহার সাধনার মূলমন্ত্র ও সর্বকর্মের নিয়ামক সূত্র। এই মন্ত্রে তিনি গঠনমূলক কর্মযজ্ঞ সম্পাদনের আয়োজন করেন। গঠনমূলক কর্ম গান্ধী-সাধনার সোপান। প্রয়োজনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া সংযত ও শুদ্ধ জীবন যাপনের মধ্যেই মানুষের সকল দুঃখ কষ্ট ও অভাব অভিযোগের নিবৃত্তি এ পরম সত্য তিনি স্বীয় জীবনচর্য্যার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আর এই কর্মে তিনি ব্রতী হন বাহিরের ঘটনার চাপে।

বিলাত হইতে ফিরিয়া গান্ধীজি প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজের উপর, অর্থাৎ ইংরাজি শিক্ষা, সভ্যতার উপর তাঁহার বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা অটুট ছিল। তিনি ঘরে বাহিরে সাহেবী হাওয়া বহাইতে উদ্যোগী হইলেন। সাহেবী পোষাক পরিচ্ছদের সঙ্গে খানা-পিনার অভ্যাসও বদল হইতে লাগিল। গান্ধী গৃহে চা, কফি, কোকোর প্রচলন হইল। স্ত্রীকে লেখাপড়া শেখানোর চেষ্টা, শিশুদের পড়াশুনার ধরণ ধারণে বিলিতি প্রথা প্রবর্তন বিবিধ কর্মে গান্ধীজি আত্ম-নিয়োগ করেন। বিলিতি ভাবে ও ভাবনায় মুগ্ধ গান্ধীজি শীঘ্রই প্রথম ধাক্কা খাইলেন রাজকোটে পোলিটিক্যাল এজেন্টের নিকট দাদার বক্তব্যটি পেশ করিতে গিয়া।

মহাত্মাজি দাদাকে খুবই শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি পোরবন্দরে মন্ত্রী ও নাবালক রাণার পরামর্শদাতা থাকিবার সময় রাণাসাহেবকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করিয়াছেন এই অভিযোগের জন্য পোলিটিক্যাল এজেন্ট রুষ্ট হন। ঐ এজেন্ট ভদ্রলোকের (ইংরেজ) সঙ্গে বিলাতে গান্ধীজির পরিচয় হয় ; খানিকটা বন্ধুত্বও হইয়াছিল। এই সুবাদে দাদার পীড়াপীড়িতে মহাত্মাজি একদিন তাহাকে আসল ব্যাপারটি বুঝাইয়া বলিবার জন্য পূর্বাহ্ণেই দিনক্ষণ স্থির করিয়া দেখা করিতে যান। সাহেব যেন গান্ধীজিকে চিনিতেই পারিলেন না। পূর্ব পরিচয়ের কথা স্মরণ করাইয়া দিলে রুক্ষস্বরে জানিতে চাহিলেন—গান্ধীজি সেই পরিচয়ের সুযোগ লইতে আসিয়াছেন কি না। কোন মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে ইহার পর আর আলাপ আলোচনা চালানো সম্ভবপর নয়। কিন্তু গরজ বড় বালাই। গান্ধীজি অপমান হজম করিয়া আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন। কালা আদমির সহিত আপিসে বসিয়া ভদ্র-ব্যবহারে অনভ্যস্ত শেতাঙ্গ পুঙ্গব মহাত্মাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করিবার জন্য কহিলেন—তোমার ভাই ষড়যন্ত্রকারী। বেশি কথা শুনিতে চাহি না। যাহা বলিবার থাকে লিখিয়া জানাইবে। তুমি এখন যাও।

স্তম্ভিত গান্ধীজি বলিলেন: আমার কথাটা তো আগে শুনুন। এই সামান্য প্রতিবাদেই সাহেবের ধৈর্যহানি ঘটিল। বিনা বাক্য ব্যয়ে পেয়াদা ডাকিয়া গান্ধীজিকে একপ্রকার গলা ধাক্কা দিয়াই বাহির করিয়া দিলেন। সদ্য বিলাত প্রত্যাগত যুবক গান্ধী এই অপমান সহজে হজম করিতে পারিলেন না। তিনি সাহেবের অসভ্য আচরণের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিবার দাবি জানাইয়া এক পত্রাঘাত করিলেন। দাবি না মানিলে নালিশ করিবেন বলিয়াও জানাইলেন। কোন ফল হইল না। সাহেব যে উত্তর দিলেন তাহার মর্ম হইল: আমি যাহা করিয়াছি ঠিকই করিয়াছি, তুমি এখন যাহা খুসি করিতে পার। কাঁটা ঘায়ে নূনের ছিটা পড়িল মাত্র। শুভানুধ্যায়ী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ নানা প্রকারে বুঝাইয়া সুঝাইয়া গান্ধীজিকে নিবৃত্ত করিলেন। তাহারা জানাইলেন—ইংরেজের নিকট এমন অপমান সকলকেই নিত্য ভোগ করিতে হয়। ইহা গায়ে মাখিলে আর করিয়া খাইতে হইবে না। গান্ধীজি চাপিয়া গেলেন বটে, কিন্তু অন্যায় সহ্য করা তাঁহার পক্ষে ভার হইল। "অন্যায় যে করে, অন্যায় যে সহে তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে।" কবির এই কথা যে কত সত্য তাহা সে সময়কার গান্ধীজিকে দেখিয়া সহজেই বুঝা গেল। অন্যায় সহ্য করিতে হইয়াছে, অতএব গান্ধী-জীবনে দারুণ দাহ উপস্থিত হইল। এই দহন জ্বালা জুড়াইবার অভিপ্রায়ে প্রথম সুযোগেই তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় পাড়ি জমাইলেন। অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে সেখানে তাঁহার ভাগ্যে অধিকতর লাঞ্ছনা অপেক্ষা করিতেছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকায় তখন ইংরেজের অপ্রতিহত ক্ষমতা। তাহারা বিশেষ অধিকারভোগী এবং শাসক। সেখানে ভারতবাসী মাত্রেরই পরিচয় কুলী। ভারতের মানুষ—হউন না তিনি ব্যারিষ্টার, বিলাতে শিক্ষিত, দেওয়ানের পুত্র—কিছু আসে যায় না, তিনিও কুলী। গান্ধীজির আখ্যা হইল কুলী ব্যারিষ্টার। কালো লোকের বিন্দুমাত্র মর্যাদা ছিল না তৎকালীন দক্ষিণ-আফ্রিকায়।

ডারবানে পৌঁছিবার তুই তিনদিনের মধ্যে গান্ধীজি আদালত দেখিতে গেলেন। সেখানেই তো তাঁহার কাজ। ঐ সময় তিনি বাঙালী ধরণের পাগড়ী পরিতেন। তখন বাঙ্গালিদের মধ্যে গণ্যমান্য ব্যক্তিরা পাগড়ী পরিতেন। রামমোহন, দ্বারকানাথ প্রমুখ মনীষীদের পাগড়ী পরা ছবি আমাদের নিকট সুপরিচিত। ভারতীয়দের পাগড়ী পরিয়া আদালত কক্ষে প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না। গান্ধীজি তাহা জানিতেন না। ম্যাজিস্ট্রেট পাগড়ী খুলিয়া বসিবার হুকুম দিলেন। অপমানকর এই আদেশ না মানিয়া গান্ধীজি আদলতের বাহিরে আসাই শ্রেয় মনে করেন। এই ঘটনার ফলে সংবাদপত্র তাঁহাকে 'অনাদৃত আগন্তুক' বলিয়া প্রচার করিল। ভারতীয়গণ বিস্ময়ে দেখিলেন উদ্ধত শ্বেতাঙ্গের অপমানকর হুকুম তামিল না করিবার মত অন্তত একজনও কালা আদমি আছেন। গান্ধীজির প্রতি ম্যাজিস্ট্রেটের এই অপমান কোন ব্যক্তিগত মান অপমান নহে, ইহা সমগ্র ভারতবাসীর প্রতি অবজ্ঞা, সকল কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের প্রতি শ্বেতাঙ্গ শাসকদের অন্যায় ঔদ্ধত্য। দক্ষিণ আফ্রিকায় পদার্পণ করিয়াই এই লাঞ্ছনার-অভ্যর্থনা কালক্রমে সুদূর প্রসারী ফল প্রসব করিয়াছিল। কয়েকদিনের মধ্যে গান্ধীজিকে আরও কিছু অনুরূপ তুঃখবহ ঘটনার মোকাবিল করিতে হইল।

কেবল দক্ষিণ আফ্রিকায় নহে খাস ভারতবর্ষেও ইংরেজ শাসকের সামনে ভারতবাসীর চটি পরিয়া যাওয়ার অধিকার ছিল না। ধুতি পরিয়া ট্রেনের ইন্‌টার ক্লাসেও চলাফেরা নিষিদ্ধ ছিল। কলকাতার অনেক রাজপথে ভারতীয়দের যানবহন ঢুকিতে দেওয়া হইত না। ভারতের সকল আদালত ও বিচারকের ইংরেজ আসামীর বিচার করিবার অধিকার ছিল না। এমনি আরও কত শত সহস্র লিখিত অলিখিত বৈষম্য যে সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই।

সপ্তাহখানেক পরে কর্ম ব্যাপদেশে গান্ধীজিকে ডারবান হইতে প্রিটোরিয়ায় যাইতে হয়। তিনি প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। নাটালের রাজধানী মরিসংবার্গে গাড়ি থামিলে জনৈক রেলকর্মী গান্ধীজিকে নামিয়া

তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে যাইতে নির্দেশ দিল। শেতাঙ্গ মানুষ কৃষ্ণাঙ্গ অর্থাৎ কুলীর সঙ্গে একসঙ্গে ভ্রমণ করিলে মান মর্যাদা থাকে না—তাই 'কুলীকে' নামাইয়া দিয়া সাহেবকে খাস দখল দিবার আয়োজন। ব্যাপারটা বুঝিতে গান্ধীজির বিলম্ব হইল না। দাদা আবদুল্লা তাঁহাকে এই রকম সঙ্কটাবস্থা সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই অবহিত করেন। এ অপমানও গান্ধীজি নীরবে নতমস্তকে মানিয়া লইতে পারিলেন না। তিনি নামিতে অস্বীকার করিলেন। রেলকর্মীটি একজন সিপাই ডাকিয়া গান্ধীজিকে জবরদস্তি গাড়ি হইতে নামাইল এবং তাঁহার মালপত্র প্লাটফরমে ছত্রখান করিয়া ছুড়িয়া দিল। অপমানে বিক্ষুব্ধ, শীতে অবসন্ন গান্ধীজির একমাত্র ভাবনা হইলঃ ন্যায্য অধিকারের জন্য লড়িবেন, না ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিবেন! ভারতবর্ষ কোন সুখ শয্যা ছিল না। লড়াইও বড় কঠিন কাজ! সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হইল না। তবে তিনি বুঝিলেন তাঁহার নির্যাতনের উৎস রহিয়াছে বর্ণ বিদ্বেষের মধ্যে। শ্বেত শাসকেরা কালা মানুষের সঙ্গে কোনদিনই মানুষের মত ব্যবহার করে নাই।

পরাধীন ভারতবর্ষেও রেল গাড়িতে ইংরেজের সঙ্গে একই কামরায় ভ্রমণ করা সহজ ছিল না। আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর ন্যায় বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিকও এ লাঞ্ছনার হাত হইতে রেহাই পান নাই। তিনি একদা গয়া হইতে সস্ত্রীক কলিকাতা ফিরিতেছিলেন। একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় একজন মাত্র ইংরেজ যাত্রী। সে বসু দম্পতিকে গাড়িতে উঠিতে বাধা দিল। ভগিনী নিবেদিতা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্বজাতীয় একব্যক্তির এই অন্যায় আচরণে জ্বলিয়া উঠিয়া তীব্র ভৎর্সনা করিলেন। তাহাতে ফল হইল। লেডী বসু ও জগদীশচন্দ্র গাড়িতে স্থান পাইলেন। জগদীশচন্দ্রের ন্যায় মানুষের ভাগ্যে যখন এই দুর্ভোগ তখন সাধারণ মানুষের অদৃষ্টে যে কি ঘটিতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়।

মরিসৎবার্গের পর চার্লস টাউন। রেল গাড়ির বদলে ঘোড়ার গাড়ি

স্থানীয় নাম সিগরাম। গান্ধীজিকে গোর যাত্রীদের সহিত একাসনে বসিতে দিলে পাছে গোলমাল হয় তাই সিগরামওয়ালা বুদ্ধি করিয়া গোরা কন্ডাকটরটিকে যাত্রীদের সহিত বসাইয়া প্রথম শ্রেণীর টিকিট ধারী গান্ধীজিকে কোচ বাক্সে চালকের পাশে স্থান দিল। ইহাও চূড়ান্ত অন্যায় ও অপমানকর। গান্ধীজি ভারতবাসী বলিয়া যাত্রীদের সহিত বসিবার সুযোগ পাইলেন না। যাহা হোক, আর গোলমাল না বাড়াইয়া শ্রান্ত গান্ধী সিগরামওয়ালার ব্যবস্থা মানিয়া যাত্রা করিলেন। কিন্তু ইচ্ছা করিলেই বা নত হইয়া থাকিলেই গোলমাল এড়ানো যায় না। মাঝপথে গোরা কন্ডাকটরটির কোচ বাক্সে বসিবার বাসনা হইল। ভিতরে গরম, তাহার পর ধূমপানের অসুবিধা। অতএব সে গান্ধীজিকে পাদানিতে বসিবার হুকুম করিল। অবশ্য আদেশ দিবার পূর্বে একটা চট বিছাইয়া দিয়া 'বিলাইতি' ভদ্রতা রক্ষা করিতে ত্রুটি করে নাই! মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। একেই ভিতরে যাহার আসন পাইবার কথা তাহাকে দেহবর্ণের অপরাধে কোচ্ বাক্সে বসিতে হইয়াছে আবার সেই আসন হইতে নাবিয়া পা-দানিতে আসন গ্রহণ মহাত্মাজি এই অপমান সহ্য করিতে পারিলেন না। গোরাটিকে জানাইলেন: তিনি ভিতরে যাইতে প্রস্তুত, কিন্তু পাদানিতে কিছুতেই বসিবেন না। বাস্! ইহাই যথেষ্ট! গোরা লোকটি অকথ্য গালিগালাজ সহকারে গান্ধীজিকে বেদম প্রহার করিতে সুরু করিল এবং জোর করিয়া নীচে ফেলিয়া দিবার জন্য ধস্তাধ্বস্তি করিতে লাগিল। আসনের পাশে একটি পিতলের ডাণ্ডা ছিল। গান্ধীজি কোনক্রমে তাহা আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিলেন—মরিব তবু নামিব না। একজন সদাশয় যাত্রী প্রতিবাদ করিলে কনডাকটরটি গান্ধীজিকে ছাড়িয়া দিল। অন্য আসনের একটি চাকরকে তুলিয়া দিয়া সেখানে সে বসিল আর শাসাইতে লাগিল: চল একবার স্ট্যানডারটন (গন্তব্যস্থল) তোমাকে মজা দেখাইব। গান্ধীজি অজ্ঞাত আশঙ্কায় দুর্গানাম জপ করিতে করিতে চলিলেন।

কেবল গাড়িতেই অর্থাৎ যানবাহনেই নহে, হোটেলেও একই অবস্থা। ভারতীয়দের জায়গা নাই। শুনিয়াছি বিজ্ঞাপন থাকিত Dogs and Indians not allowed. কুকুর এবং ভারতীয়দের প্রবেশ নিষেধ। জোহান্সবার্গে জনস্টন নামক জনৈক আমেরিকান ভদ্রলোকের হোটেলে বহু কসরৎ করিয়া গান্ধীজি স্থান পাইলেন। হোটেলওয়ালা মানুষ ভাল। তিনি জানান তার খদ্দেররা কালো মানুষের সঙ্গে একত্রে বসিয়া খাইতে আপত্তি করে তাই খাবার ঘরে বসিয়া গান্ধীজি খাইতে পারিবেন না।

ভারতীয়দের সাধারণ ফুটপাথ দিয়া চলাফেরাও নিষিদ্ধ ছিল। দাগী অপরাধীর ন্যায় রাত্রি ৯টার পর বাড়ির বাহিরে যাইবার জন্য লাইসেন্স বা পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখিতে হইত। গান্ধীজিকেও পরিচয় পত্র রাখিতে হইয়াছিল। নিষিদ্ধ ফুটপাথে হাটার অপরাধে প্রিটোরিয়াতে পুলিশ লাথি মারিয়া গান্ধীজিকে রাস্তায় ফেলিয়া দেয়।

ভারতবর্ষে শাসক ইংরেজের ব্যবহার ভিন্নতর বা উন্নততর ছিল না। অনেক বরেণ্য মানুষের অদৃষ্টে গান্ধীজির ন্যায় দুর্গতি ও অপমান জুটিয়াছে। নীলকর সাহেবদের অত্যাচার তো দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা হইয়া আছে। বহুজনে অন্যায়কে প্রতিকারহীন মনে করিয়া নীরবে সহ্য করিয়াছেন---অনেকে সহযোগিতার দ্বারা হাতে শক্তি যোগাইয়াছেন। মনুষ্যত্বের বিনিময়ে বৈষয়িক সমৃদ্ধি তাহারা লাভ করিয়াছেন এ কথা ঠিক। আবার সংখ্যায় অল্প হইলেও প্রতিবাদ করিবার মত মানুষের সাক্ষাৎও মেলে। সে প্রতিবাদ অবশ্য প্রায়ই খুচরো ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইত। গভীর ও সর্বাত্মক প্রতিবাদ কোন কোন সময়ে সামান্য কিছু কিছু হইলেও তাহা জাতীয় আন্দোলনের রূপ পায় গান্ধীজির আবির্ভাবের পর।

রাজকোটের উদ্ধত ইংরেজ কর্মচারীর অন্যায়কে সহ্য করিতে না পারিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় যাওয়া। সেখানে অবস্থা আরও ভয়াবহ। বস্তুতঃ দুই দেশের শাসক ইংরেজের মধ্যে মূলগত কোন পার্থক্য ছিল

না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেখিলেন শাসক ইংরেজের বাহিরে যে সাধারণ মানুষ ইংরেজ সে সজ্জন, মানুষের ধর্ম পালনে তাহার আগ্রহ কাহারো অপেক্ষা কম নহে। দক্ষিণ আফ্রিকায় অত্যাচার জর্জর ভারতবাসীর সংস্পর্শে আসিয়া এবং বারংবার বহুবিধ নির্যাতন ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া মহাত্মাজির এই বোধ হইয়া থাকিবে যে, সকল অত্যাচারীকে মানবধর্ম শিক্ষা দিতে না পারিলে ইহার অবসান হইবে না। সকলেই মানুষ। অত্যাচারীও মানুষ কিন্তু সে জানে না মানবধর্ম কি ? এই ধর্মহীনদের, বোধহীনদের নিকট কালো, ঘন কালো, ফিকে কালোর কোন ভেদ নাই—সকল কালো মানুষই সমান ঘৃণ্য। তাহাদের সেই ঘৃণা অন্য কোন সূত্র ধরিয়া স্বজাতিকেও আঘাত করে। গান্ধীজি আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন :—"ভারতীয়দের দুর্গতির কথা কেবল পড়িয়া শুনিয়া নহে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারাও ভাল করিয়া জানিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। আমি দেখিলাম, যে সব ভারতবাসী আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া চলাফেরা করিতে ইচ্ছুক তাহাদের পক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা থাকার উপযুক্ত স্থান নহে। এই অবস্থার কি করিয়া পরিবর্তন হয়, সে জন্য আমার মন খুব বেশি ঝুঁকিয়া পড়িল।"

ঐ ঝোঁক গান্ধীজিকে ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামের অধিনায়ক পদে প্রতিষ্ঠিত করে। তিনি দীর্ঘদিন ধরিয়া অমানুষিক শারীরিক নিগ্রহ সহ্য করিয়াছেন, মানসিক নির্যাতন তো ছিলই। বহুবার তাঁহাকে মারধোর করা হইয়াছে। একাধিকবার তিনি মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গিয়াছেন। জেল খাটিয়াছেন। আপন দেহে আঘাত পাইয়া, যন্ত্রণা ভোগ করিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন আঘাত কত ক্লেশকর ও কষ্টদায়ক। গান্ধীজি অনেক মার খাইয়াছেন তথাপি অপমান হজম করেন নাই। নিজের এই মানসিক প্রতিক্রিয়া হইতে তাঁহার বিশ্বাস জন্মে আঘাতের দ্বারা মানুষকে হত্যা করা যাইতে পারে কিন্তু তাহার প্রত্যয় ও আদর্শকে নিশ্চিহ্ন করা যায় না। অপমানকারীকে পাল্টা অপমান করিয়া গান্ধীজি কখনও প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নাই। যে কাজের ফলে তিনি

নিজে ব্যথা পাইয়াছেন সেই ব্যথা তিনি অন্যকে পাইতে দিতে পারেন না। বালাসুন্দরমের ঘটনা আলোচনা করিতে গিয়া গান্ধীজি আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন ঃ –"অপরকে অপমান করিয়া লোকে কেমন করিয়া নিজে মান পাইতেছে এইরূপ মনে করে, এ রহস্য আমি আজ পর্যন্ত বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।"

এই সকল ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে গান্ধীজির প্রত্যয় হইল ভাল মন্দ উভয়েই মানুষ। যে মানুষের যেমন সাধনা, যেমন শিক্ষা ও সুযোগ সে তেমনি হয়। মানুষ আপনার চেষ্টার দ্বারা সাধনার দ্বারা মহৎ হইতে পারে, দেবত্ব অর্জন করিতে সক্ষম হয়। কর্মের পথ ধরিয়া গান্ধী হৃদয়ে এই প্রত্যয় উদ্ভাসিত হয়। অতএব সন্দেহের অবকাশ ছিল না, অবিশ্বাসের হেতুও না। দক্ষিণ আফ্রিকার বুকেই উদয় হইল গান্ধী সূর্যের। তিনি বিপুল আয়ের আইন ব্যবসায় ও অন্যান্য কাজকর্ম এবং আরাম আয়েস ত্যাগ করিয়া সর্বমানবের হিতার্থে সর্বোদয়ের সাধনায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

গান্ধীসূর্য আজ কালের অমোঘ নিয়মে অস্তাচলে। কিন্তু সূর্যের প্রাণসঞ্চারী উত্তাপ মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ হইতে আমাদিগকে এখনও রক্ষা করিতেছে। অন্ধকার পৃথিবীর বুকে নূতন সূর্যোদয়ের সুপ্রভাতের প্রত্যাশায় আমরা এখন প্রহর গুনিতেছি। গান্ধীসূর্যকে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অতএব হে অমৃতের পুত্রগণ, তোমরা নিরাশ হইও না— বিশ্বাস হারাইও না। অন্ধকারের পরপারে সেই মহৎ মানুষ আছেন ঃ পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

গঠনকর্ম : অস্পৃশ্যতাবর্জন

স্বাধীনতালাভের পর আমরা যেন অতিমাত্রায় রাজনীতি কেন্দ্রিক হইয়া পড়িয়াছি। এম, পি ; এম, এল, এ—নিদেনপক্ষে রাজনৈতিক-দলের একটা হোমরা-চোমরা হওয়াই আমাদের ধ্যানজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। ইহার জন্যই, অনেকে মনে করেন, দিকে দিকে নিত্যনূতন রাজনৈতিক দল হইতেছে কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া চার-পাঁচটী দল হইয়াছে ; কম্যুনিষ্ট পার্টি ভাঙ্গিয়া হইয়াছে, কেউ বলেন তিনটি, কেউ বলেন চারটি। নূতন নূতন দল গড়িবার পশ্চাতে নেতা হইবার আকাঙ্খা আছে এ কথাটা অশ্রদ্ধেয়। তথাপি বাস্তবে যাহা ঘটিতেছে তাহাতে ইহা মনে হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নহে। এই পথে রাজনীতি আজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়ন, সেবাপ্রতিষ্ঠান, ছাত্র যুব সংগঠন এমন কি পাড়ার সংঘ-সমিতিগুলিতেও এখন রাজনীতি ভর করিয়াছে। নানাদিকে মধ্যে মধ্যে যে সকল দাঙ্গা-হাঙ্গমা বিশৃঙ্খলা হত্যা লুণ্ঠন প্রভৃতি মাথা চাড়া দিয়া ওঠে তাহার মূলে রহিয়াছে হৃদয়হীন রাজনীতির ইন্ধন। রাজনীতি করার অর্থই হইযাছে ক্ষমতা অর্জনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ইহার জন্য দল দরকার, আর দল দাবি করে সার্বিক ও অন্ধ আনুগত্য। এই দুর্দৈবের জন্য ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষের উপর

দোষারোপ করা সমীচীন হইবে না। চলতি রাজনীতির ধারাই এই। ইহা হইতে মুক্তির পথ, গান্ধী-পথ, পরিত্রাণের উপায় গান্ধীজির শরণ।

আমাদের সকল চিন্তা ভাবনা ও কর্মের অন্তিম লক্ষ্য মানুষ। এই কথাটা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক দলের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা, গদিলাভের লোভ নীতিহীন দলবদল ও জোটবদ্ধতা প্রভৃতির মধ্যে মানুষের সুখ দুঃখের কথা কতটুকু স্বীকৃত হইতেছে তাহা সন্দেহের বিষয়। তাই আজ গান্ধীজির কথা মনে হইতেছে। সকল অশুভ ও কল্যাণের হাত হইতে পরিত্রাণের জন্য গান্ধীজির গঠনকর্মের উপর নির্ভর করা যায়। ইহা সত্য যে, রাজনীতি বর্জিত হইয়া দেশ চলিতে পারে না। কিন্তু শুধুমাত্র রাজনীতিকে সর্বেসর্বা করিলে বর্তমানে আমরা যে সকল অসুবিধা এবং ক্ষতিকর অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছি তাহার নিরসন হইবে না। সুতরাং সুস্থ ও আনন্দময় জীবনের প্রত্যাশা মিটাইবার জন্য রাজ-নীতির অতিরিক্ত কিছু প্রয়োজন। সে বিষয়টি কি তাহা লইয়া মতভেদ থাকিতে পারে। কিন্তু কিছু একটা যে দরকার, আশাকরি ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে গান্ধীজি একটি সুচিন্তিত কর্মপন্থা এই জন্য রাখিয়া গিয়াছেন।

গঠন কর্মপন্থা গান্ধী-জীবনের ইচ্ছাপত্র বা Testament. গান্ধীজি সারা জীবন ধরিয়া নানা বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করিয়া এই সত্যে উপনীত হইয়াছেন। ইহাই ছিল সর্বক্ষেত্রে তাঁহার পদ্ধতি। নিজে পরীক্ষা না করিয়া তিনি কেবল-মাত্র বুদ্ধির বিচারে কিছুই গ্রহণ করিতেন না। এই রকম একটা সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনের প্রান্তসীমায় আসিয়া তিনি "গঠনমূলক কর্মপন্থা—মত ও পথ" নামক পুস্তিকাখানি লেখেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যথাযথভাবে গঠনকর্ম সম্পাদন করিতে পারিলে স্বাধীনতা আপনা আপনিই আসিয়া যাইবে। ঐ পুস্তিকায় গান্ধীজি ব্যাখ্যাসহ ১৮টি

কাজের একটি তালিকা দিয়াছেন। বর্তমান সময়ের অনেক যুবক ও ছাত্রের তাহা জানিবার সুযোগ ঘটে না। এখন আমরা বক্তৃতার যুগে বাস করিতেছি। আমার দলের সব ভাল - অন্য সকলের সবটুকুই মন্দ—এই কথা বেদবাক্যের সত্যের মত উচ্চারণ করাই এখন দলীয় লোকদের রীতি হইয়াছে। মিথ্যাচার আর কতদূর যাইতে পারে! ইহার মধ্যে হাতে হাতিয়ারে কাজ করিতে গেলে মুশকিল। গান্ধীজির ১৮ দফা কর্মসূচী হইল :

(১) সাম্প্রদায়িক একতাবিধান, (২) অস্পৃশ্যতা বর্জন, (৩) মাদক নিবারণ, (৪) খাদি উৎপাদন ও ব্যবহার, (৫) অন্যান্য পল্লীশিল্প গঠন, (৬) পল্লীস্বাস্থ্য বিধান, (৭) বুনিয়াদি শিক্ষা প্রবর্তন, (৮) বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা, (৯) নারীজাতির উন্নতি, (১০) স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা, (১১) প্রাদেশিক ভাষার উন্নয়ন, ১২) রাষ্ট্রভাষার প্রসার, (১৩) ধনসাম্য প্রতিষ্ঠা, (১৪) কৃষকদের উন্নতিবিধান, (১৫) শ্রমিক সেবা, (১৬) আদিবাসী সেবা, (১৭) কুষ্ঠরোগী সেবা এবং (১৮) ছাত্র সেবা।

বইখানির ভূমিকায় গান্ধীজি স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন এই কার্যক্রম কংগ্রেসের অনুরোধে বা প্রয়োজনে তিনি রচনা করেন নাই। গান্ধীজি লিখিতেছেন—"এই কাজগুলি যে স্বাধীনতা আন্দোলনের অঙ্গস্বরূপ হইতে পারে ইহা শুনিয়া পাঠক উপহাস করিবেন না।···একটি দরিদ্র বিধবার হাতে চরকা সামান্য একটা পয়সা রোজগারের উপায় মাত্র। কিন্তু জওহরলালের হাতে এই চরকা স্বাধীনতা সংগ্রামের অস্ত্র।" একই কাজের দ্বারা, কর্মীর যোগ্যতা ও অভীপ্সা অনুসারে, ভিন্ন ভিন্ন ফললাভ হইয়া থাকে। তবে চরকা যে স্বাধীনতা সংগ্রামের অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে ইহা অনেকের নিকট আজিও উপহাসের বিষয় হইয়া আছে। চরকার অন্তরের কথাটি দৃষ্টিগ্রাহ্য নহে। বুঝিবার সুবিধার্থে সামান্য প্রসঙ্গান্তর হইলেও, সহজবোধ্য অন্য একটি বিষয়ের কথা এখানে একটু বলি।

প্রখ্যাত গান্ধীপন্থী নেতা ও কর্মী শ্রীযুক্ত রতনমণি চট্টোপাধ্যায় গান্ধীমানস গ্রন্থে অস্পৃশ্যতা-প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন —"জওহরলাল থেকে অখ্যাত পল্লীর দীন হরিজন পর্যন্ত ঐ একটা মানুষের [গান্ধীজি] দিকে চেয়েছে—কেউ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য, কেউ দাড়ি কামাবার জন্য।" দাড়ি কামানোর জন্য গান্ধীজি! ১৯৪১ সন। আরামবাগ মহকুমার গ্রামের একটি সত্যাগ্রহ শিবির। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সহ অন্যান্য নেতা ও কর্মীরা তখন কারারুদ্ধ। কাজকর্মে তাই কিছু ভাটার টান ধরিয়াছে। একদিন রতণমণি কয়েকজন কর্মীসহ শিবিরে বসিয়া গল্পসল্প করিতেছেন এমন সময় কয়েকজন হরিজন (হাড়ি) আসিলেন। সকলের মত তাহারাও সমাদরে অভ্যর্থিত হইলেন। রতনদারা যে চাটাইটাতে বসিয়া ছিলেন তাহারই অপরপ্রান্তে তাহারা বসিবার আসন পাইলেন। কথাবার্তায় বেলা বাড়িয়া দুপুরের খাওয়ার সময় হইল। রতনদা তাহাদের খাইয়া যাইতে বলিলেন। ইহাতে তাহারা খুসিই হইলেন। একই ঘরের মধ্যে সামনাসামনি আসনে বসিয়া তাহারা রতনদাদের সহিত আহার করিলেন। ইহা তাহাদের জীবনে এক নূতন আনন্দময় অভিজ্ঞতা। প্রাথমিক আড়ষ্টতা কাটিয়া যাইতে বেশী দেরি হইল না। হাড়ি ভাইয়েরা মন খুলিয়া তাহাদের সুখদুঃখের কথা কহিতে শুরু করিলেন। কত তাহাদের দুঃখ! একজন বলিলেন—"হ্যাঁগা মশাই, তোমার গান্ধীকে একটা চিঠি লিখে দাও তো আমাদের নাপিতের ব্যাপারটা ঠিক হয়ে যাক।" সকলেই উৎকর্ণ হইয়া উঠিলেন। কি সে ব্যাপার যাহা ঠিক করিবার জন্য গান্ধীজিকে চিঠি লিখিতে হইবে। কোর্ট কাছারি থানা পুলিশ না করিয়া গান্ধীজিকে চিঠি!

অভিযোগ—হাড়ি ভাইরাও হিন্দু, হরিনাম করে, অভক্তির (গোমাংস) মাংস খায় না অথচ নাপিত তাদের কামায় না। কিন্তু ঐ নাপিত হাটে বাজারে মুসলমান সহ বারোজাতের লোক কামায়। গান্ধীজি

ছাড়া এই দুঃখ আর কে বুঝিবেন, কেই বা ইহা দূর করিতে পারেন! একেবারে গণ্ডগ্রামের তথাকথিত শিক্ষাদীক্ষাহীন একজন হরিজনের নিকট গান্ধীজি কি রূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন তাহা ইহা হইতে অনুধাবন করা যায়। এবং ইহা কোন বক্তৃতার দ্বারা হয় নাই। সেবামূলক কাজ ও গঠন কাজের দ্বারাই হইয়াছিল।

আমরা অনেকেই জানি গান্ধীজির ক্ষৌরকার ভীমভাই হরিজনদের ক্ষৌরকর্ম করিত না জানিতে পারিয়া তিনি আধাছাঁটা অবস্থাতেই ভীমের হাতে চুল ছাঁটিতে অস্বীকার করেন। ভারতের এক প্রান্তের এই নীরব সাধনা অপর প্রান্তের একটি নিরক্ষর ভাইয়ের হৃদয়ে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিল কেমন করিয়া! ভারতবর্ষের স্বাধীনতা তিনি হয়তো বোঝেন না, নাপিতের সমস্যার সমাধান হইলেই তাহার স্বাধীনতা হইল। এই জন্যই গান্ধীজি বলিয়াছেন ক্ষেত্র বিশেষে একই কর্ম পয়সা রোজগারের উপায় অথবা স্বাধীনতার অস্ত্র।

গান্ধীজির ১৮ দফা কাজের সবগুলি সকলের মনোমত নাও হইতে পারে। হইবার দরকারও নাই। যাহার যতটুকু ভাল লাগে তিনি তাহাই করুন। তাহার দ্বারাই দেশের সর্বোত্তম সেবা হইবে। ইহার মধ্যেই অনন্ত সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই কর্মের পথে একদিন আমাদের দারিদ্র্যলাঞ্ছিত দুঃখ-দৈন্যে ভরা এই দেশ সোনার দেশ হইবে।

কথাপ্রসঙ্গে আজিকার আলোচনার হরিজন তথা অস্পৃশ্যতা বর্জনপ্রসঙ্গ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এইটিই ছিল গান্ধীজির অতীব প্রিয় বিষয়। এই সম্বন্ধে তাঁহার রচনা ও বক্তৃতার পরিমাণ সর্বাধিক। হরিজন উন্নয়ন ও অস্পৃশ্যতা বর্জন তাঁহার জীবনের সর্বপ্রধান কাজ বলিয়া তিনি দাবি করিতেন। ল্যুই ফিশার গান্ধীজীবনী গ্রন্থে (The Life of Mahatma Gandhi vol. II) লিখিয়াছেন—If Gandhi had done nothing else in his life but shatter the structure of untouchability he would have been a great social reformer. গান্ধীজি বলিয়াছিলেন—আমাদের

দেশের মানুষ কুকুর বিড়ালকে অস্পৃশ্য মনে করে না, অথচ মানুষকে অস্পৃশ্য মনে করে। ইহাকে তিনি পাপ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। এই পাপ হইতে জাতিকে মুক্ত করিবার কার্যে তিনি পরে একান্তভাবে ব্রতী থাকিবার বাসনাও ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ১৯২১ সনের ৬ই এপ্রিল এক প্রার্থনান্তিক ভাষণে তিনি বলেন ঃ

"আজ আমি এই প্রার্থনা করি যে, পুনরায় যদি জন্মগ্রহণ করিতে হয় তবে যেন আমি তোমাদের ঘরে হরিজন হইয়া জন্মাই···। মরণকালে যদি কোন বাসনা আমার অপূর্ণ থাকে, হরিজন সেবা যদি আমার অসমাপ্ত থাকে···তবে আমি তোমাদের (হরিজনদের) মধ্যে আবার জন্মগ্রহণ করিয়া আমার হিন্দুধর্ম পালনে যেন সিদ্ধকাম হই।"

দেশ স্বাধীন হইবার পর জাতীয় সরকার এই কলঙ্ক দূর করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। অস্পৃশ্যতা এখন দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু আইন দিয়া অবজ্ঞা ও অনাদর দূর করা যায় না বা মর্যাদা দান করা যায় না। সেজন্য মানবিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন। আইন অবশ্য সহায়ক শক্তির কাজ করে।

হরিজন সেবা তথা অস্পৃশ্যতা বর্জন সম্বন্ধে গান্ধীজি গঠনমূলক কর্মপন্থা গ্রন্থে লিখিয়াছেন--"হিন্দুধর্মের এই কলঙ্ক ও অভিশাপ দূর করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা আজিকার দিনে নিষ্প্রয়োজন। কংগ্রেসসেবীরা অবশ্য এ বিষয়ে অনেক কিছু করিয়াছেন। কিন্তু আমাকে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, অনেক কংগ্রেসসেবী শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লইয়াই করিয়াছেন। হিন্দু ধর্ম রক্ষার জন্য হিন্দুদের পক্ষে ইহা অবশ্যকরণীয়, এ কথা মনে করেন নাই। যদি হিন্দু কংগ্রেসসেবীরা অস্পৃশ্যতা বর্জনের উদ্দেশ্যেই অশ্যস্পৃতা বর্জনকে গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাহাদের দ্বারা 'সনাতনীরা' এখন যতখানি প্রভাবিত হইয়াছেন তদপেক্ষা অনেক বেশী প্রভাবিত হইবেন। কংগ্রেসসেবীরা বিরোধী মনোভাব লইয়া সনাতনীদের কাছে যাইবেন না। তাহারা অহিংসপন্থী, সুতরাং বন্ধুভাবেই তাহাদিগকে যাইতে

হইবে। তারপর হরিজনদের কথা। হরিজনেরা আজ সমস্ত সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করিতে বাধ্য হইতেছেন। এমন নিদারুণ নিঃসঙ্গ জীবন বোধ হয় পৃথিবীতে আর কোথায়ও নাই। আজ প্রত্যেক হিন্দুকে হরিজনদের দুঃখকে আপনার দুঃখ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে এবং আপনার সেবা ও সাহচর্যের দ্বারা তাহাদের এই ভয়াবহ নিঃসঙ্গতা দূর করিতে হইবে। এ কাজ যত কঠিনই হউক না ইহা স্বরাজ-সৌধ নির্মাণের একটি আবশ্যকীয় অঙ্গ। স্বরাজের পথ অতীব সংকীর্ণ ও দুর্গম। এই পথে কোথায়ও পিচ্ছিল গিরিবর্ত্ম, কোথায়ও বা গভীর গহ্বর। যদি আমরা স্বরাজের শৈলশিখরে উপনীত হইয়া স্বাধীনতার মুক্ত বায়ু সেবন করিতে চাই তাহা হইলে অবিচলিত পদে এই সমস্তই আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে।”

গান্ধীজি অন্যান্য কথার মধ্যে এখানে স্পষ্ট করিয়া বলিলেন—এই প্রয়োজনীয় কাজটিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের মতলব ছাড়াই করিতে হইবে। সেবার হৃদয় দিয়া করিতে হইবে। তাহার দ্বারাই স্বরাজ-সৌধ নির্মিত হইবে। আজও আমরা একথা বলিতে পারি যে, এই সেবার পথেই আমাদের স্বাধীনতা স্থায়িত্বলাভ করিবে এবং কল্যাণ-প্রসূ হইবে। রামানন্দ কবীর তুকারাম তুলসীদাস শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি যুগপ্রবর্তক মহাজনেরা রাজ্যপাট শাসন করেন নাই। তাঁহারা সমাজের অবহেলিত অচ্ছুৎ মানুষকে মানুষের পূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন মাত্র। বহু যুগ পরেও তাঁহাদের সেই মহৎ উদ্যোগকে আমরা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে নিত্য স্মরণ করি। ইহাদের কর্ম-কৃতির পুণ্যফল আমরা এখনও ভোগ করিতেছি। “বেরুক নূতন ভারত ..জেলে, মুচি, মেথরের ঝুড়ির মধ্য হতে। ভুলিও না নীচজাতি মুর্খ দরিদ্র অজ্ঞ মুচি মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই”—এই কথা বলিয়া আত্মবিস্মৃত অবনত জাতির চিত্তে স্বামী বিবেকানন্দ সাহস ও চৈতন্য সঞ্চার করিয়াছেন। অন্ধকারে দিশাহারা জাতিকে পথ নির্দেশ করিয়াছেন। সুদীর্ঘকালের পরবশ্যতার ফলে সত্য ও শ্রেয়বোধ

সম্পর্কে আমরা ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা পরিচালিত হইতেছিলাম। বিবেকানন্দ সেই ভুল হইতে জাতিকে সত্য পথে পরিচালনা করেন। রাজনীতির সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল না। তথাপি তিনি আমাদের রোগ নির্ণয়ে ভুল করেন নাই, নিদান নির্দেশেও তিনি অভ্রান্ত। স্বামীজির এই বাণীমূর্তি গান্ধীজির কর্মের মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে বলিলে বড় বেশী অত্যুক্তি হইবে না। মানুষের সমস্যা মানবিক দৃষ্টি দিয়াই বিচার করিতে হইবে। সমাধানের পথও ভিন্ন হইতে পারে না। সেই জন্যই গান্ধীজি হরিজনদের মন্দির প্রবেশের অধিকারকে বিশেষ মূল্যবান বিবেচনা করিতেন। গান্ধীজি বলিয়াছেন "মন্দির প্রবেশের অধিকার দিয়া অধ্যাত্মক্ষেত্রে হরিজনদের মুক্ত ঘোষণা না করিলে অস্পৃশ্যতা পরিহার কার্য অসম্পূর্ণ ও ব্যর্থ হইবে।"

রাজনীতি মানুষকে আর যাহাই দিতে পারুক অধ্যাত্ম সম্পদ দিতে পারে না। আর এই সম্পদ ছাড়া মানুষের কোন সম্পদই পূর্ণ নহে, কল্যাণকর নহে। বর্তমানে অধ্যাত্মসম্পদের গুরুত্বের প্রতি যথোচিত মনোযোগ দেওয়া হইতেছে না। সেই জন্য নানা আইন ও শুভ সঙ্কল্প থাকা সত্ত্বেও নীতিহীন কর্মের প্রাদুর্ভাব ঘটিতেছে এবং সামগ্রিকভাবে বিচার করিলে মানুষের দুঃখ বাড়িতেছেই বলিতে হইবে। আজ মানুষ অনাহারে হয়তো মরে না কিন্তু নীতিনিষ্ঠ সত্যাশ্রয়ী কল্যাণব্রতী মানুষের অভাব ঘটিয়াছে বলিয়া আপসোসের অন্ত নাই। গান্ধীজির গঠনকর্মে আত্মনিয়োগ করিলে আবার আমাদের জীবন সেবাময়, সত্যময় ও শুভময় হইয়া উঠিবে। আজ যে সকল অনাচার অত্যাচার ব্যভিচারের দ্বারা সাধারণ মানুষের জীবন ক্ষতবিক্ষত হইতেছে তাহার অবসান ঘটিবে। এক মুষ্টি ক্ষুধার অন্নের জন্য মনুষ্যত্বের মর্যাদাটুকু বিকাইয়া দিতে হইবে না।

*জলপাইগুড়ির শ্মশানের বুকে রাজনৈতিক সেবাব্রতীদের আচরণ লক্ষ্য করিলে আমরা সকলেই বুঝিতে পারিব—ঐ প্রাণ দিবার

কাড়াকাড়ির মধ্যে ভোটের স্বার্থ কতখানি রহিয়াছে। অতএব দুর্দৈবের আঘাতও আমাদের সম্বিৎ ফিরাইয়া দিতে পারিতেছে না। সুতরাং আসুন অন্য পথের সন্ধান করি। চলুন গান্ধী শতাব্দীতে আমরা মহাত্মার পথের পথিক হইতে চেষ্টা করি। মনে রাখিতে হইবে **If we are to make progress we must not repeat history but make new history.** গান্ধীজির সেই নতুন ইতিহাসের সন্ধান করিতে হইবে ভালবাসার পথে। শ্রমসাধ্য সেবার পথে প্রতিযোগিতা প্রতিদ্বন্দ্বিতার পথে নহে। ইহাই গান্ধীজির শিক্ষা, ইহাকে জনগণের নিজস্ব কর্মোদ্যোগ বলিতে পারি। লক্ষ্য ও পন্থার শুদ্ধতায় বিশ্বাসী মানুষ এই উদ্যোগের মধ্যে সার্বিক কল্যাণ সহজেই অনুভব করিবেন। আর ইহাই বোধহয় গান্ধীজির গঠনকর্মের প্রধানতম শিক্ষা। এই শিক্ষার আলোকে ভারতবর্ষের সাতলক্ষ গ্রাম আলোকিত হউক স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের সর্বপ্রকার ভেদাভেদ সম্পূর্ণ লুপ্ত হউক এই প্রার্থনা করি।

ক্ষতি মিথ্যা ক্ষত সত্য

উত্তরপ্রদেশ সরকার মাদক-বর্জন নীতি * ত্যাগ করিয়াছেন। কি কারণে তাহারা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন তাহা বিস্তারিতভাবে আমরা জানি না। তবে মাদক বর্জনের বিরুদ্ধে অধুনা তুটি যুক্তি প্রবলভাবে উপস্থিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। এক, ইহা হইতে কোটি কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়। কোন সরকারই রাজস্বের এই সহজ এবং সারবান উৎসটিকে শুষ্ক করিয়া ফেলিতে উৎসাহ বোধ করেন না। তুই, আইন দ্বারা মাদক বর্জনের চেষ্টা করিলে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশী হয়। নিষিদ্ধ ফলের প্রতি মানুষের লোভ তো চিরন্তন। চোরাকারবারের প্রসার ঘটে, সঙ্গে সঙ্গে অসামাজিক ক্রিয়াকলাপও বাড়িয়া যায়। উত্তর প্রদেশের সরকার তার রাজস্বের এক দশমাংশ পান মদ্যাদি মাদক-দ্রব্যের উপর ধার্য কর হইতে। ইহা খণ্ড সত্য। টাকার অপর পিঠটি লুকাইয়া রাখা হইয়াছে।

মাদক-বর্জন নীতির বিসর্জন অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর কোন সিদ্ধান্ত আমি কল্পনা করিতে পারি না। মদ্যপানের ফলে কত যে সংসারের শান্তি ও সুখ চিরতরে বিলীন হইয়া গিয়াছে, কত যে পরিবার অনাহারে অর্ধাহারে কাটায়, কত মানুষ যে অকালে রোগজীর্ণ হইয়া কর্মক্ষমতা হারাইয়া অপরের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে

বসিয়া ধুঁকিতেছে তাহার কোন ইয়ত্তা নাই। সমাজের উপরের তলার অর্থাৎ যাহাদের প্রভূত অর্থ আছে (আমি ইহাদের অভিজাত বলি না) সেখানে মদ্যপানের প্রাবল্য নানাপ্রকার সামাজিক অপরাধের ক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। ইহার প্রভাব উচ্চমধ্যবিত্ত ও অল্পবিত্ত যুবকদের উপর পড়িয়া বহু প্রতিশ্রুতিময় জীবন নেশার স্রোতে অন্ধকারে হারাইয়া যাইতেছে। যানবাহনের দুর্ঘটনা বৃদ্ধির অবশ্যই একটি বড় কারণ পানাসক্তির প্রসার, খুন যখম রাহাজানি, দলবদ্ধ মারামারি লুটতরাজ এই যে কথায় কথায় ঘটিতেছে তাহার পশ্চাতে নেশার নিঃশব্দ পদসঞ্চার অবশ্যই আছে। এ সব কথা কমবেশী সকলেরই জানা।

এক কাপ চা। চা খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া উহা পান করা অনেকে সমীচীন মনে করেন নাই। কিন্তু পরে চা-বোর্ড নানা উপায়ে সর্বশ্রেণীর মধ্যে 'চা'য়ের বাজার বাড়াইবার জন্য প্রচার সুরু করেন। চা পানের প্রয়োজনীয়তার উপর নামী দামী লোকের কিছু কিছু লেখাও তাহারা বোধ হয় প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। ক্রমে চা-পানের ন্যায় একটি অপ্রয়োজনীয় (ক্ষতিকর কিনা জানি না, বোধ হয় ক্ষতিকরও) প্রয়োজন সারাদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। চা খাই না বলিলে লোকে একসময় করুণা করিত, 'গেঁয়' বলিত। সমাজের শীর্ষের দিকে উঠিবার একটি ধাপ ছিল চা পান। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে চা যেমন করিয়া মিথ্যা আভিজাত্যের মোহ হইতে সমাজে ছড়াইয়া পড়িয়াছে আজ মদ্যপানেরও তেমনি অবস্থা। আঠার বিশ বছরের যুবকেরা (অনেক ক্ষেত্রে নারীও) প্রকাশ্যে মদ্যপান করাকে বাহবা পাইবার মত কাজ বলিয়া মনে করেন। জনৈক অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছেন, তাহারা যে মদ্যপানের ব্যয় নির্বাহ করিতে পারে এবং তাহারা মদ খাইয়াও মাতাল না হইবার যোগ্যতা রাখে (যদিও সকলেই মাতাল হয়), এই দ্বিবিধ 'গুণ' দেখাইয়া নিজেদের বিশিষ্টতা প্রমাণ করিতে চায়। যে সমাজে তাহারা লালিত বর্ধিত

সেখানে ইহা অপরাধ বা লজ্জার বলিয়া মনে করা হয় না বলিয়াই উহারা ইহা করিতে উৎসাহ বোধ করে।

ইয়ং বেঙ্গলের কলিকাতায়ও মদ্যপান এইরূপ ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ইহার ফলে সমাজে যে গরল উত্থিত হইয়াছিল তাহার দ্বারা বহু প্রতিশ্রুতিময় জীবন অকালে নষ্ট হয়। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মদ্যপান নিরোধ আন্দোলন করিয়া এই কুফল হইতে সমাজকে বহুল পরিমাণে উদ্ধার করেন।

বিশ শতকে আর এক মহাত্মা, গান্ধীজি মদ্যপানের কুফল সম্পর্কে বিশেষ সচেতন হন এবং তাঁহার প্রযত্নে কংগ্রেস মাদকবর্জন নীতি গ্রহণ করে। ১৯৩৭ সনে ভারতবর্ষের ১১টি প্রদেশের মধ্যে সাতটিতে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। সেই মন্ত্রীসভাকেই মাদকবর্জন নীতি কার্যকর করার জন্য কংগ্রেস নির্দেশ দেন। তখনও রাজস্বের কথা উঠিয়াছিল। ইংরেজ গবর্ণরেরা নানাভাবে এই প্রস্তাবকে কার্যকর করা হইতে মন্ত্রীদের বিরত করিতে চেষ্টা করেন। রাজস্বের ঘাটতি পূর্ণ করার অসুবিধাই অবশ্য তাঁহারা বড় করিয়া তুলিয়া ধরেন। এমনও বলেন যে, ইহার পরেও যদি মন্ত্রীরা মাদকবর্জন করাই সাব্যস্ত করেন তবে তাঁহারা যেন মনে রাখেন যে, ভারত সরকার ঘাটতি পূরণ করিবেন না। শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল আচারি তখন মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি ইংরেজ গভর্ণরদের এই সব প্রচ্ছন্ন হুমকির মোকাবিলার জন্য আগাইয়া আসিলেন এবং বিক্রয়কর ধার্য করিয়া ঘাটতি রাজস্ব মিটাইবার ব্যবস্থা করেন। কোন না কোন আকারে সকল কংগ্রেসী প্রদেশে সেদিন মাদকবর্জন নীতি গৃহীত হয় এবং বিক্রয়কর ধার্য হয়। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, কোটি কোটি টাকার রাজস্ব বিসর্জন দিবার সাহস যেন মন্ত্রীদের থাকে। কারণ, কোন রাজ্যেরই অধিবাসীদের নৈতিক অধঃপতনের সহায়তা করিবার অধিকার নাই। আমরা চোরকে চুরি করিবার সুবিধা দিতে পারি না।

সর্ব বিষয়েই মহাত্মা গান্ধী সহজ ও সুস্পষ্ট ভাষায় মতামত প্রকাশ করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। এ ক্ষেত্রেও কোন দ্বিধা বা দ্ব্যর্থবোধের অবকাশ নাই। মহাত্মা গান্ধীর এই প্রেরণা ও রাজাজীর বাস্তব বুদ্ধি মিলিয়াই সেদিন মাদকবর্জন নীতি গ্রহণ সম্ভব-পর হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর কুড়ি বৎসরও পূর্ণ হয় নাই, রাজাজী এখনও জীবিত (অবশ্য ক্ষমতাহীন) ইহার মধ্যেই উল্টা পুরাণ সুরু হইল।

মদ্যপান নিরোধ সার্থক করিতে পারিলে রাজস্বখাতে যে ঘাটতি হয় তাহা ধর্তব্যই নহে। ১৯৩৮ সনে বিধানসভায় (তখন নাম ছিল ব্যবস্থাপক সভা) মাদকবর্জন আইন পেশ করিতে উঠিয়া মধ্যপ্রদেশের তদানীন্তন মন্ত্রী শ্রী পি, বি, গোল কথাটা চমৎকারভাবে ব্যক্ত করেন। ত্রিশ বৎসর পরেও তাঁহার বক্তব্য সমান মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য। মাদকদ্রব্য বিক্রয়ের উপর ধার্য কর না পাইলে রাজ্য সরকারের তহবিলের যে সংকোচন ঘটে আসলে তাহা কোন সংকোচনই নহে। কারণ ? তাঁহার বক্তব্যের মর্মার্থঃ আমরা কর আদায় করি জনসাধারণের মঙ্গলসাধনের জন্য। মধ্যপান বন্ধ হইলে সমাজের দরিদ্রতর মানুষগুলির জীবনের মান দ্রুত বাড়িবে। মদ্যপায়ীদের অধিকাংশই দরিদ্রশ্রেণীর লোক। মদকে তিনি বিষ বলিয়া উল্লেখ করিয়া বলেন, বিষপানের জন্য তাহারা তাহাদের রোজগারের অধিকাংশ ব্যয় করিয়া থাকেন এবং ইহার দ্বারা তাহারা বুদ্ধিভ্রংশ হন, তাহাদের কর্মক্ষমতা হ্রাস পায় এবং প্রায়ই তাহারা পশুর ন্যায় হইয়া পড়েন। মদ্যপান বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ক্রয়শক্তি বাড়িবে অর্থাৎ যে টাকা দিয়া মদ কিনিতেন তাহার দ্বারা খাদ্যাদি কিনিতে পারিবেন। মাতাল হইয়া রাস্তাঘাটে অস্থানে-কুস্থানে আর পড়িয়া না থাকিয়া বাড়ীতে তাহাদের আত্মীয় পরিজন স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে আনন্দে অতিবাহিত করিবেন।

মদ বিক্রয় হইতে লব্ধ সমগ্র রাজস্ব ব্যয় করিয়াও সরকার কি মানুষের এই কল্যাণ সাধন করিতে সক্ষম হইবেন ? গাছের গোড়া

ক্ষাটিয়া আগায় জল ঢালিলে কোন লাভ হয় না। তেমনি মদ্যপান বন্ধ না করিয়া জীবনের মান উন্নয়ন ও সামাজিক জীবনের উন্নতি বিধানের প্রচেষ্টা কখনই ফলপ্রসূ হইতে পারে না। অপরদিকে রাজস্বের ঘাটতির কোন যুক্তিসহ ভিত্তি নাই। মদ্যপান বন্ধ হইলে সারা ভারতের মদ্যপায়ীদের কত টাকার অপচয় বন্ধ হইবে অনুমান করিতে পারেন? ৮০০ হইতে ১০০০ কোটি টাকা হইবে। এই টাকাটার দ্বারা ভোগ্যপণ্য ও অন্যান্য দ্রব্য ক্রীত হইবে। সেই কেনা-কাটার ফলে যে বাড়তি কর সরকার পাইবেন তাহা বোধ হয় আবগারী শুল্ক অপেক্ষা কম হইবে না। পরন্তু গান্ধীজি বলিয়াছেন, "সুরাসেবী থাকার চেয়ে ভারতকে বরং ভিক্ষুকে পরিণত করাও আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি।" হাততালি পাইবার লোভে নিশ্চয়ই ইহা গান্ধীজি বলেন নাই। মাতালের চেয়ে ভিক্ষুক অনেক অনেক ভাল তাহা স্বীকার করিতেই হয়।

অল ইণ্ডিয়া প্রোহিবিশান কাউন্সিলের সভাপতি ডক্টর শ্রীমতী সুশীলা নায়ার 'তাঁহার এ প্লী টু দি মেমবারস্ অব দি এ, আই, সি, সি' শীর্ষক পুস্তিকায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কমিটির সদস্যদের নিকট আবেদনে মাদকবর্জনের সপক্ষে একটি চমৎকার যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলেন --মদ্য ব্যবসায়ীরা সর্ব প্রযত্নে যখন সকলকে মদ্যপানের শিক্ষা দিবার চেষ্টা করেন এবং তথাকথিত ফ্যাসানদুরস্ত সমাজে মদ্যপান ফ্যাসানের অঙ্গ হইয়া উঠিতেছে তখন পান-বিরোধী শিক্ষা প্রসারের দ্বারা মদ্যপান বন্ধ করা কার্যকর হইতে পারে না।

ইহা তো আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা। চায়ের ক্ষেত্রে ইহা আমরা দেখিয়াছি এবং পূর্বে অলোচনা করিয়াছি। স্বাস্থ্যের জন্য মদ্যপান প্রয়োজনীয় ইত্যাদি কথা আলোচিত হইতেছে। ইহার সপক্ষে খবরের কাগজে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে। অপরদিকে মদের সঙ্গে কিছু ঔষধপত্র মিশাইয়া এক জাতীয় টনিক বা সুধা কি সুরা বাজারে বিক্রয় হইতেছে। শ্রীমতী নায়ার তাই যথার্থই বলিয়াছেন—জীবনের

মৌলিক মূল্য সম্পর্কে আমাদের পুনঃ প্রত্যয়শীল হইতে হইবে। কায়েমী স্বার্থকে দরিদ্র মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ, সর্বোপরি তাহার বুদ্ধি, তাহার অর্থোপার্জনের ক্ষমতাকে আমরা কখনই অপহরণ করিবার অধিকার দিতে পারি না।

সমকালীন সমাজের বিবিধ বাস্তব অসুবিধার সঙ্গে মোকাবিলা করিয়া আদর্শকে রূপদান করা ও ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছান সর্বদা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। কিন্তু সে জন্য একেবারে ঢাকি শুদ্ধ বিসর্জনের কথা ইতিপূর্বে শুনি নাই। আমাদের কর্মদক্ষতার অভাবজনিত অক্ষমতার জন্য নীতিকে বিসর্জন দিতে হইবে এই সিদ্ধান্ত মারাত্মক এবং জনস্বার্থের-পরিপন্থী। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বহু বিষয়ে তাহার ধ্যানধারণা ও দীর্ঘ দিনের সযত্ন লালিত বিশ্বাস অনুযায়ী কর্মে প্রবৃত্ত হয় নাই। গঠন কর্ম গিয়াছে। গ্রাম স্বরাজ, খাদি ইত্যাদি সব কিছুই অনাদর অবহেলায় ধুক্ ধুক্ করিতেছে। তথাপি আশা করা গিয়াছিল মদ্যপানের বিরুদ্ধে আন্দোলনটা সরব ও সচল থাকিবে। কারণ ইহাতে বিন্দুমাত্র ক্ষতি নাই, সবটাই ইহার লাভ। নৈতিক আর্থিক ও সামাজিক বিচারে ইহার দ্বারা কোন ক্ষতি হইতে পারে একমাত্র বিদেশী সরকার ছাড়া ইতিপূর্বে অন্য কেহ তাহা প্রকাশ্যে বলিতে সাহস পান নাই। পরন্তু এই একটি মাত্র প্রচেষ্টায় সার্থক হইলে অন্যবিধ কর্মগুলি সম্পাদন সহজতর হইবে। তথাপি নানা অজুহাত তুলিয়া সার্বিক প্রচেষ্টা হইতে সরকার হাত গুটাইয়া লইয়াছেন।

কোন রাজ্যে অঞ্চল বিশেষে, কোন কোন রাজ্যে সপ্তাহের একটি বিশেষ দিনে মদ্যপান নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। বাহাদুরি সিদ্ধান্ত বটে! ছয়দিন যথেচ্ছ মদ্যপানের পর সপ্তম দিনে মদ্যপায়ী সাধু বনিয়া যাইবেন এরূপ যাহারা আশা করেন তাহাদের বাস্তব বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না। পরন্তু এইরকম ব্যবস্থার দ্বারা মদ্যপানের অন্ধকার কানাগলিও জানাজানি হইয়া যায়। কোন স্থানে পানের দোকানে ও বড় বড় রাজপথের পাশে

জনবিরল প্রান্তরে যেসব সরাইখানা স্থাপিত হইয়াছে সেখানে অবাধে মদ্য বিক্রয় হয়। এগুলি চোরা-কারবার। অতএব মদ্যপান আইনসিদ্ধ হইলেও কিছু কিছু বাধ্যবাধকতা সর্বদা থাকে, নহিলে কর আদায় করা যায় না। সে বাধ্যবাধকতা ও আইন অহরহ ভঙ্গ হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গে মদ্যপান নিষিদ্ধ নয় অথচ ব্যাপক আকারে বেআইনীভাবে মদ্য প্রস্তুত ও বিক্রয় হইতেছে। অতএব মদ্যপান নিষিদ্ধ করিলেই যে চোরাকারবার এবং বেআইনী উৎপাদন ও বিক্রয় বাড়ে এ কথা সত্য নহে।

আবার শ্রীমতী নায়ারের কথায় ফিরিয়া আসি। "মদ্যপান দরিদ্রকেই কেবল শোষণ করে না ইহা উপরতলার মানুষকে দুর্নীতি-গ্রস্ত করে।"

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, যদি সত্যসত্যই সততার সঙ্গে মাদক-বর্জন-নীতি গৃহীত হয় এবং তাহাকে রূপায়িত করা যায় তাহা হইলে ষাট থেকে সত্তর শতাংশ দুর্নীতি হ্রাস পাইবে।

গান্ধীজি বারবার বলিয়াছেন 'দুঃখবরণ ভিন্ন স্বরাজ আসিতে পারে না।' কথাটা কেবল কথার কথা নহে। দুঃখের মহামূল্যেই সত্যকার সম্পদ লাভ সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ আমাদের এ সত্য সম্পর্কে অবহিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের কথা, স্বাধীন ভারতের বিবিধ প্রচেষ্টার মধ্যে এই মহৎ সত্যের অনুভবযোগ্য স্বীকৃতি নাই, এই সত্যকে স্বীকার করিবার সাহসের অভাবও পরিলক্ষিত হইতেছে। তাই মাদকবর্জনের ক্ষেত্রে মিথ্যা ক্ষতির ভয়ে বিষাক্ত ক্ষতকে সযত্নে পোষণ করিবার ব্যবস্থা পাকা হইতে চলিয়াছে। জাতিকে তাহার ভিত্ হইতে গড়িয়া তুলিবার জন্য গান্ধীজি গঠন-কর্মসূচী প্রণয়ন করেন। ইহাকেই তিনি সত্য ও অহিংসার পথে পূর্ণ স্বরাজলাভের উপায় বলিয়া নির্দেশ করেন। ১৯২০ সাল হইতে কংগ্রেস কর্মতালিকায় মাদকবর্জনের স্থান রহিয়াছে। গাঁন্ধীজি আশা করিয়াছিলেন 'গঠন কর্মীদের চেষ্টার ফলে আইন দ্বারা মাদক নিবারণের পথ তৈয়ার হইবে, অন্তত আইন দ্বারা মাদক নিবারণ

সহজে সাফল্যলাভ করিবে।' তিনি জানিতেন ভারতবর্ষের সকল মানুষ তাঁহার কর্মসূচী অনুসারে কাজ করিবে না। কিন্তু "যদি একজন উৎসাহী কর্মী দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া কাজে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে অন্য যে কোন কাজের ন্যায় এই কাজও অনায়াসে করা যাইতে পারে।" মাদক-বর্জনের ক্ষেত্রেও একথা সত্য হোক এই প্রার্থনা করি।

পরাধীন ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ নরনারীকে মাদকপরিপ্লুত অভিশপ্ত জীবন হইতে উদ্ধারের জন্য সরকার নিরপেক্ষ হইয়া যে কাজটুকু হইত আজ স্বাধীন সরকারের ভরসায় তাহাও বন্ধ হইয়াছে। মনে হয় সরকার স্বদেশীই হোক আর বিদেশীই হোক গঠনকর্মের জন্য তাহার উপর নির্ভর করা যায় না। মাদকবর্জন সফল করিতে হইলে গঠন-কর্মীদের অগ্রণী হইতে হইবে। তাঁহারা সক্রিয় হইয়া কার্যে সাফল্যলাভ করিলে সরকার সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবেন। ভূদানের ক্ষেত্রে ইহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। বিনোবাজির ন্যায় প্রতিষ্ঠিত নেতা এককভাবে দীর্ঘদিন একনিষ্ঠ সাধনার দ্বারা সার্থকতার পথে অগ্রসর হইবার পর সরকার তাঁহার কার্যে সহায়তা করিতেছেন। মদ্যপান নিবারণের ব্যাপারে কংগ্রেস প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নাই, সংবিধানের স্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সরকার দ্বিধাগ্রস্ত, অনেকক্ষেত্রে পশ্চাদপসরণ করিয়াছেন। অথচ গান্ধীজি বারবার মনে করাইয়া দিয়া গিয়াছেন পানদোষের কবলে যে জাতি পড়িয়াছে ধ্বংস ছাড়া তাদের আর অন্য কোন গতি নাই। সরকারী ক্ষমতা গান্ধীজির অনুগামীদের হাতে, অথচ তাহারা সাহস করিয়া মদ্যপান বন্ধ করিতে পারিতেছেন না, ইহা ভাবিতেও আশ্চর্য ঠেকে। মাদকদ্রব্য বন্ধ করিবার পর বেআইনী কালোবাজারীর প্রসারতা হয়তো কিছু বাড়িবে, কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যাপক ক্ষতির কারণ হইতে পারে না।

এই দুঃখময় অবস্থার মধ্যেও রাজস্থানের সর্বোদয় কর্মীরা অগ্রসর হইয়া সরকারকে মাদকবর্জনের নীতি গ্রহণ করিতে বাধ্য করিবার জন্য সত্যাগ্রহ সুরু করিয়াছেন। সারা ভারতবর্ষে সর্বোদয় কর্মীগণের সঙ্গে

সকল সৎ ও কল্যাণকামী মানুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হোক, ক্ষতি মিথ্যা ক্ষত সত্য।

রাজস্থানের আন্দোলনের ফলে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি মাদক নিবারণ বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। কংগ্রেস কমিটিতে কি আলোচনা হইয়াছিল, তাহাদের প্রস্তাবের বয়ান কি ইত্যাদি আমরা জানি না। আমাদের জ্ঞান সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কাগজে প্রকাশিত খবরে জানা গিয়াছে ২রা অক্টোবর ১৯৬৯ হইতে সাত বৎসরের মধ্যে মাদক বর্জন কার্য সম্পন্ন করা হইবে।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বস্তুতঃ ভারতবর্ষের সুপার ক্যাবিনেট। তাহারা মাদক বর্জন বিষয়ে সাত বৎসর ব্যাপিয়া ক্রমশঃ প্রসারমান পরিকল্পনার মত হাস্যকর একটি প্রস্তাব কেমন করিয়া গ্রহণ করিলেন তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। মাদক ক্ষতিকর বলিয়াই তাহা বর্জনের কথা উঠিয়াছে। কংগ্রেস এবিষয়ে দীর্ঘকাল যত্নপর। গান্ধীজিও সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষে মাদক ব্যবহার চিরকালই ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হইয়া থাকে। মদ্যপায়ী বা নেশাখোর লোককে কেহ কোনদিন সম্মানের আসন দেয় নাই। আজকাল অবশ্য 'নন্দলালেরা' প্রকাশ্যে মদ্যপান করিয়া নূতন কিছু করিবার এবং প্রগতিশীল হইবার চেষ্টা করিতেছে। কংগ্রেসের প্রস্তাব দেখিয়া মনে হইতেছে নন্দলালেরা প্রাধান্য পাইয়াছে। নেহাৎ মুখরক্ষা করিবার জন্য কংগ্রেস এই রকম একটি সাতসালা মদ্য নিবারণী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে।

মদ্যপান বিষয়ে গান্ধীজির মতামত অত্যন্ত সুস্পষ্ট ছিল এ কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। এখনকার তরুণ সমাজের অনেকের নিকট তাহা অজ্ঞাত বলিয়া মনে হয়। সুতরাং গান্ধীজি তাঁহার গঠনমূলক কর্ম পন্থায় এ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এই অবসরে নিবেদন করি। গঠনমূলক কর্মপন্থা টেষ্টামেন্টের মর্যাদা পাইবার অধিকারী।

"মাদক নিবারণ কংগ্রেসের কর্মতালিকায় সাম্প্রদায়িক একতা ও

অস্পৃশ্যতা বর্জনের ন্যায় মাদক নিবারণও ১৯২০ সাল হইতেই আছে। তাহা হইলেও এই অবশ্য প্রয়োজনীয় সামাজিক ও নৈতিক সংস্কারের দিকে কংগ্রেসসেবীরা যথেষ্ট মনোযোগ দেন নাই। যদি অহিংসার পথে স্বরাজ আমাদের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে এই লক্ষ লক্ষ নরনারীকে ভবিষ্যৎ গবর্ণমেন্টের ভরসায় তাহাদের মাদক পরিপ্লুত অভিশপ্ত জীবনের মধ্যে ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না।

চিকিৎসকেরা এই দুর্নীতি দূর করিবার জন্য অনেকখানি সহায়তা করিতে পারেন। মাতাল ও আফিমখোরকে কেমন করিয়া এই অভিশাপ হইতে মুক্ত করিতে পারা যায় তাহা তাহাদিগকে করিতে হইবে।

এই সংস্কার সাধনের বিষয়ে নারী ও ছাত্র সমাজের একটা বিশেষ সুবিধা আছে। তাঁহাদের সপ্রেম সেবার দ্বারা তাঁহারা সহজেই নেশাখোরদের চিত্ত জয় করিতে পারিবেন এবং তারপর এই বদভ্যাস বর্জন করিবার জন্য যখন তাঁহারা তাহাদিগকে অনুরোধ করিবেন, সে অনুরোধ তাহারা উপেক্ষা করিতে পারিবে না।

কংগ্রেস কমিটিগুলি শ্রমিকদের জন্য বিশ্রামাগার খুলিতে পারে। সেখানে পরিশ্রান্ত শ্রমিকেরা বিশ্রাম করিতে পারিবে। এই সকল কাজ যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনই কল্যাণকর। অহিংসার পথে স্বরাজ একটা অভিনব জিনিস। ইহার কর্মপন্থাও অভিনব। হিংসার পথে এই সকল সংস্কারের স্থান না থাকিতেও পারে। হিংসাপন্থীরা ধৈর্যহীনতা বশতঃ, অজ্ঞানতা বশতঃ বলা যাইতে পারে—এই সকল কাজ মুক্তির দিনের অপেক্ষায় ফেলিয়া রাখেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান, স্থায়ী এবং স্বাস্থ্যপ্রদ মুক্তি ভিতর হইতে অর্থাৎ আত্মশুদ্ধির পথেই আসিয়া থাকে। গঠন-কর্মীদের চেষ্টার ফলে আইন দ্বারা মাদক নিবারণের পথ তৈরী হইবে; অন্ততঃ আইন দ্বারা মাদক নিবারণ সহজে সাফল্যলাভ করিবে।”

উদ্ধৃতিটা দীর্ঘ হইল। গান্ধীজির বক্তব্যটা পুরাপুরি সামনে থাকিলে

বিষয়টি উপলব্ধি করা সহজ হইবে এবং গান্ধী-চিন্তার আলোকে আমাদের দৃষ্টিও কিঞ্চিৎ স্বচ্ছ হইতে পারে আশা করিয়া এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি সন্নিবেশিত করিয়াছি।

বছর কয়েক আগে(১৮।৯।৬৬) পশ্চিমবঙ্গ মদ্য নিষেধ সম্মেলনে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী একটি অতিশয় মনোজ্ঞ ভাষণ দিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকা (২৫।৬।১৯৩১) হইতে মদ্য নিরোধ সম্পর্কে গান্ধীজির কয়েকটি কঠোর বাক্য তর্জমা করিয়া দেন।---"যদি আমাকে মাত্র একঘণ্টার জন্যও ভারতের ডিক্টেটর করিয়া দেওয়া হয় তবে আমি সর্বপ্রথমে কোনরূপ ক্ষতিপূরণ না দিয়া মদ এবং তাড়ির সমস্ত ভাটি ও দোকান বন্ধ করিয়া দিব। উপরন্তু কারখানার মালিকেরা যাহাতে শ্রমিকদের জন্য মানবোচিত পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং বিশুদ্ধ পানীয় ও চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করে তাহার জন্য কারখানার মালিকগণকে বাধ্য করিব। আর যদি তাহারা অর্থাভাবের কারণ দেখাইয়া তাহা করিতে না চান তবে কলকারখানা বন্ধ করিয়া দিব।" ঐ বক্তৃতায় গান্ধীজির আরও কয়েকটি বাক্য স্থান পাইয়াছে। তাহার কয়েকটি এখানে পরপর উদ্ধৃত করিতেছি। "যাহারা সুরা বা অন্য কোন মাদক সেবন বা উহার কারবার করে, তাহাদের উভয়েরই পতন হয়। মত্তাবস্থায় মানুষ মাতা, ভগ্নী ও পত্নীর মধ্যে পার্থক্য ভুলিয়া যায় ও সে এমন দুষ্কার্য করিয়া বসে যাহা সজ্ঞানে করিতে তাহার লজ্জা আসিবে।"

আর একটি উদ্ধৃতি ঃ "সুরা আফিং ইত্যাদি মাদক দ্রব্য শয়তানের দুই হাতিয়ার। সে তাহার অসহায় গোলামকে মারিয়া তাহার বুদ্ধি হরণ করে এবং তাহাকে নেশায় বিহ্বল করে।"

শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারীর আলোচ্য বক্তব্যটিতেও সকল দিক—ধর্ম, নীতি, সমাজ, উন্নয়ন, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য প্রভৃতি যাবতীয় দৃষ্টিকোণ হইতে যুক্তিসিদ্ধ তথ্যাদি দ্বারা অবিলম্বে মাদক বর্জনের প্রয়োজনীতা সুন্দরভাবে বিবৃত করা হইয়াছে। সে সব কথার পুনরাবৃত্তি করিব না। মাদক বর্জনের পথে সত্যই কোন প্রকৃত বাধা নাই। মদ্যপান প্রসারের ফলে

জাতির যে অপরিমেয় ক্ষতি হইতেছে তাহা কিছু ট্যাক্স এবং রঙীন বিলাতিয়ানার মোহে কেমন করিয়া স্বদেশভক্ত মানুষ অস্বীকার করিতে পারেন, গান্ধীজির এমন সুস্পষ্ট সাবধান বাণী থাকা সত্ত্বেও তাহা আমি বুঝিতে পারি না। দেশের মানুষের সহিত যাঁহাদের যোগসূত্র এখনও ছিন্ন হয় নাই তাঁহারা আশাকরি মাদক বর্জনের প্রয়োজনীয়তা এবং অবিলম্বে বর্জনের গুরুত্বকে স্বীকার করিতে দ্বিধা করিবেন না।

সি. এফ এনড্রুজ অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল পূর্বে মডার্ণ রিভিয়্যুতে (জুন ১৯১০) মাদকবর্জন প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন—No Indian who loves his country can view without serious alarm the steady increase in the consumption of spirituous liquors of all kinds which has taken place in the last twenty years : অর্থাৎ গত বিশ বৎসরে মদ্যপান এমন বৃদ্ধি পাইয়াছে যে স্বদেশভক্ত ভারতবাসী মাত্রই তাহাতে উদ্বেগ বোধ করিবেন। দীনবন্ধু এনড্রুজ ভারতবর্ষের একজন যথার্থ হিতকামী বিদেশী বন্ধু ছিলেন। ভারতবর্ষে আসিবার পূর্বে তিনি লণ্ডনের বস্তি এলাকায় কিছুকাল কাজ করেন। সেখানে মদ্যপান নির্বাধ। ঐ এলাকায় মোট অপরাধের নয়-দশমাংশ মদ্যপানের ফলে যে ঘটে ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান।

কংগ্রেস কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে মাদক নিবারণ নীতি গ্রহণের পূর্বেই ভারতবর্ষে মদ্যপানের প্রসার এবং তজ্জনিত ক্ষতিকর অবস্থা সম্পর্কে তিনি সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন। তিনি ঐ প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন—মদ্যপানের পাপে ভারতবর্ষ দ্রুত নিমজ্জিত হইতেছে। তথাপি তিনি মনে করেন, প্রকৃত অবস্থা অন্যান্য দেশের মত শোচনীয় নয়। কিন্তু মদ্যপানরূপ যে ছিদ্র ভারতবাসীর জীবনে দেখা দিয়াছে তাহা যত ক্ষুদ্রই হোক উপেক্ষা করিলে ভয়াবহ বিপদ অনিবার্য। সামান্য একটি ছিদ্র পথ যে চরম দুর্যোগের কারণ হইতে পারে সে সম্পর্কে হল্যাণ্ডের এই সুন্দর উপাখ্যানটি দীনবন্ধুর প্রবন্ধে আছে।

বড় বড় বাঁধ দিয়া সমুদ্রের হাত হইতে হল্যাণ্ডকে রক্ষা করা হয়। একদিন শীতের দুর্যোগময় ঝড়বৃষ্টির রাত্রে একটি কিশোর বাড়ি ফিরিবার পথে দেখিল হল্যাণ্ড রক্ষাকারী বাঁধের একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া ক্ষীণ জলধারা প্রবেশ করিতেছে। হল্যাণ্ডের মানুষ জানে এই জল প্রবেশ পথ অবিলম্বে বন্ধ করিতে না পারিলে অচিরেই বৃহদাকার হইবে এবং বাঁধটি ভাঙ্গিয়া পড়িবে ; হল্যাণ্ড সমুদ্রের তলায় নিমজ্জিত হইয়া যাইবে। সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও কিশোরটি জলধারা রোধ করিতে পারিল না। সে তখন নিজের পোষাক খুলিয়া হাত দুখানায় জড়াইয়া সেই ছিদ্র পথে প্রবেশ করাইয়া জলধারা বন্ধ করিল। পরের দিন সকালে লোকজন আসিয়া দেখিল, ঝড় জলের রাত্রের দারুণ ঠাণ্ডায় কিশোরটির জীবনদীপ নির্বাপিত হইয়া গিয়াছে। তাহাদের চেতনা হইল কি অমূল্য প্রাণের বিনিময়ে, কেমন মহান আত্ম-উৎসর্গের দ্বারা সমগ্র হল্যাণ্ড রক্ষা পাইয়াছে !

ভারতবর্ষের মদ্যপান দোষকে দীনবন্ধু হল্যাণ্ড ডাইকের ক্ষুদ্র ছিদ্র পথের সহিত তুলনা করিয়াছেন। তিনি সতর্ক করিয়া তখনই লিখিয়াছিলেন— Let us who love our country and are in earnest about our willingness to serve the motherland make haste to repair the damage and make India strong once more. আমরা যাহারা স্বদেশকে ভালবাসি এবং মাতৃভূমির সেবা করিতে যত্নশীল তাহারা যেন মদ্যপানরূপী ছিদ্র শীঘ্র বন্ধ করিবার প্রয়াসের দ্বারা ভারতবর্ষকে পুনরায় শক্তিশালী করি।

প্রায় ষাট বৎসর পূর্বে উচ্চারিত জনৈক বিদেশী ভারতবন্ধুর কথা আজও সত্যের অম্লান গৌরবে উজ্জ্বল। আত্ম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে আমরা গান্ধীজিকে জাতির জনক বলিয়াছি। কিন্তু তাঁহাকে বড় বেশী মানিবার প্রয়োজন কাজকর্মে স্বীকৃত হয় নাই। তাঁহার মতামত উপেক্ষা করিয়া দেশ বিভাগ করা হইয়াছে। তাঁহার শ্রমশিল্পের নীতি অস্বীকার করিয়া গ্রামকে শহর বানাইবার অসম্ভব

প্রচেষ্টায় গ্রামের প্রাণপুরুষকে হত্যা করিয়াছি। অথচ শহরীয় প্রাণ গ্রামে প্রতিষ্ঠা করিতে পারি নাই। আমরা যেন শ্মশানের অধিবাসী হইয়াছি। মাদক বর্জন বিষয়ে গান্ধীজির কথা বা নির্দেশ তাই কংগ্রেস যে মানিবেন ইহা ভরসা করিবার কারণ ছিল না। বিদেশীর মতামত এখন ভারতে সাদরে গ্রহণীয় হইতেছে। তাই এই প্রবন্ধে একজন ভারতবন্ধু বিদেশীর মাদক-বর্জন-কথাও কিছু আলোচনা করা হইল। মদ্যপান ক্ষতিকর এবং উহা এখনই বর্জন করা দরকার। নহিলে সমূহ বিপদ, সমূলে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

খদ্দর

খদ্দর একটি গুজরাটী শব্দ। ইহার বাঙলা হইল খাদি। কিন্তু বহু-ব্যবহারের দ্বারাই বোধ করি খদ্দর বাঙলা সহ পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষায় গৃহীত হইয়াছে। বস্তুতঃ মহাত্মা গান্ধীর প্রযত্নে খদ্দর স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতবর্ষে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ও মর্যাদার আসন লাভ করিয়াছিল। বলিতে গেলে, তিনিই ইহার উদ্ভাবক ও প্রয়োগকর্তা; ইহার তথ্যের সংগ্রাহক, তত্ত্বের রচয়িতা এবং ব্যাখ্যাতা—ইহার সংগঠক ও প্রচারক। গান্ধীজির মাতৃভাষা ছিল গুজরাটী। তাই খদ্দর বিষয়ে তাঁহার অজস্র রচনায় মাতৃভাষার এই শব্দটি স্থান লাভ করিয়া বিশ্বজনীন শব্দে পরিণত হইয়াছে।

বিচিত্র ও বিবিধ কর্মের প্রবর্তক ও উদ্‌গাতা ছিলেন গান্ধীজি। সত্যাগ্রহের ঋষিরূপে তিনি সমধিক খ্যাত। অহিংসা ও অসহযোগ সত্যাগ্রহ বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা বলিয়া তাহার পৃথক উল্লেখ করি নাই। ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও শ্রমশীলতা, বিচার ও প্রয়োগ কৌশলের দ্বারা প্রতিটি কর্মকেই গান্ধীজি সমান বিশিষ্ট ও প্রয়োজনীয় করিয়া তুলিতে সমর্থ হইতেন। গ্রাম-সেবা, গো-সেবা, নারীর মুক্তি, বুনিয়াদী শিক্ষা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, অস্পৃশ্যতা বর্জন, মাদক বর্জন, খাদি, কুটীর-শিল্প প্রভৃতির কোনটিকেই বাদ দিয়া গান্ধীজিকে ভাবা যায় না। ইহার কোন্‌টির গুরুত্ব যে বেশি আর কোন্‌টির কম তাহা নির্ণয় করা সহজসাধ্য

নহে। এই গঠনকর্মের পথেই মহাত্মা গান্ধীর চিন্তাধারা রূপপরিগ্রহ করিয়াছিল। আর গান্ধীজি খদ্দরকে তাঁহার গঠনকর্মযজ্ঞরূপ সৌরমণ্ডলের মধ্যমণি বা সূর্য্ বলিয়া আখ্যাত করিয়া গিয়াছেন। "স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার" লোকমান্য তিলকের এই মহাবাক্যটির সহিত গান্ধীজি যুক্ত করিলেন—খদ্দর ভিন্ন ইহা অর্জিত হইতে পারে না—and you can not have it without khadi. পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু চরকাকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার চাবিকাঠি the livery of Indian freedom বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। গান্ধী জন্মজয়ন্তী সপ্তাহের নাম ছিল 'চরখাজয়ন্তী।' নিখিল ভারত কংগ্রেসের অধিবেশনের সহিত অখিল ভারত কাটুনী সঙ্ঘের অধিবেশন হইত। ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় গান্ধীজি খদ্দরকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করিতেন। সাধারণ্যে ইহা স্বীকৃতও হইয়াছিল। অনেক কিছুর মতই খদ্দরের তাৎপর্যটি আজ আর আমরা তেমন করিয়া অনুধাবন করিবার চেষ্টা করি না।

অপর দিকে কিছু খদ্দর পরা মানুষের ব্যক্তিগত আচার-আচরণে সত্য রক্ষিত হয় নাই সেজন্য খদ্দর নিন্দিত হইয়াছে। প্যাণ্ট পরিয়া একটা লোক চুরি করিলে সকল প্যাণ্টধারীকে আমরা নিন্দা করি না। কিন্তু খদ্দর পরিয়া কেহ অন্যায় করিলে সকল খদ্দর ব্যবহারকারীকে নিন্দাভাগী হইতে হয়। তাহার কারণ খদ্দর একদা সত্য সেবা ও ত্যাগের জ্বলন্ত প্রতীক ছিল। তাই সামান্য স্খলন পতনও এখানে অমার্জনীয় অপরাধ। খদ্দর এই মর্যাদার অধিকারী হইল কেমন করিয়া, সেই কথা গান্ধীজির রচনার আলোকে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব। ইহা কোন পূর্ণাঙ্গ আলোচনা নহে। কেবলমাত্র খদ্দরের অন্তরের কথাটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছি।

ভারতবর্ষে ফিরিয়া গান্ধীজি একটি সত্যাগ্রহ আশ্রম স্থাপন করেন। এই সময় হইতে খাদি পরিকল্পনা গান্ধীচিত্তে ধীরে ধীরে নির্দিষ্ট রূপ লাভ

করিতে থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে আসিয়া এক বৎসর যাবৎ গান্ধীজি ভারতবর্ষ পরিক্রমা করেন। তখন ভারতবাসীর অসহনীয় দারিদ্র্যের নগ্নরূপ তাঁহার নিকট প্রকটিত হয়। সে দারিদ্র্য যে কত নির্মম ও ভয়াবহরূপে প্রকাশিত তাহা তথাকথিত শিক্ষিত শহরবাসী ভারতীয়েরও কল্পনাবহির্ভূত ব্যাপার। এযুগের একজন তাপস-শিক্ষকের লেখা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া এই মর্মান্তিক দারিদ্র্যের সামান্য পরিচয় দিতে চেষ্টা করিতেছি। ঐ তপস্বী প্রবর হইলেন ডক্টর হরেন্দ্র-নাথ মুখার্জী। ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা শনিবারের চিঠিতে 'গণ-সংযোগ' শীর্ষক তাঁহার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহাতে আছে ঃ "গোদাবরী নদী যেখানে সমুদ্রে পড়েছে তার নিকটে একগ্রামে একটি খ্রীষ্টান-পরিবারের মধ্যে ছিলাম।···গ্রামের লোকেরা মাঠের মধ্যে একটা ঝোপের চারিদিকে জাল দিয়ে লাঠিসোটা নিয়ে তাড়া দিতে লাগল এবং মাটির মধ্যে গর্ত খুঁড়ে ফেললে। মাটিতে বড় বড় ইঁদুরের বাসা ছিল, সেই ইঁদুর শিকার করলে এবং ইঁদুরের গর্ত থেকে সঞ্চিত ধান সংগ্রহ করতে লাগল। সে ধান মাটির গর্তে থেকে সবুজ হয়ে গেছে, তবু শুনলাম সেই ধান কেঁড়ে চাল করে গ্রামের লোক খাবে। মাছ মাংস দারিদ্র্যের জন্য সংগ্রহ করতে পারে না বলে এই ইঁদুরের মাংসই এদের একমাত্র আমিষ আহার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।···

"এলাহাবাদের কয়েক মাইল দূরে একবার টাঙায় চড়ে গ্রামে যাচ্ছি, পথে যাবার সময় দেখলাম, উৎসাহভরে গ্রামের মেয়েরা ঘোড়ায় বিষ্ঠা সংগ্রহ করছে। প্রথমে ভেবেছিলাম, হয়তো জ্বালাবার জন্য ঘুটে করবে। পরে শুনলাম তা নয়। বিষ্ঠার মধ্যে কিছু কিছু ছোলা থেকে যায় ; সেইগুলি ধুয়ে মানুষে আহার করার জন্য সঞ্চয় করছে।" ইহার মধ্যে অতিরঞ্জন নাই।

এই দুর্বিসহ দারিদ্র্যের সহিত গান্ধীজিরও পরিচয় হইয়াছিল। তিনি ধীরে ধীরে অনুভব করেন ঃ Anything that helped India to get rid of the grinding poverty of her masses would

in the same process establish swaraj. যে উপায়ে এই নিষ্পেষণকারী দারিদ্র্য বিদূরিত হইবে সেই পথেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জিত হইবে। গান্ধীজির এই ভাবনা ক্রমে খাদির রূপলাভ করে। খাদি স্বরাজসাধনার উপায় বলিয়া তিনি ঘোষণা করেন। স্বেচ্ছা আলস্যের জন্য (voluntary idleness) সাধারণ মানুষ স্থায়ী শোষণ ও বশ্যতার শিকার হয়। পরনির্ভরশীলতা বুদ্ধিহীন জড়তা আনে। খদ্দর আমাদের আলস্য দূর করিয়া কর্মে যেমন নিযুক্ত করে তেমনি পরনির্ভরতা মুক্ত করিয়া আত্মনির্ভরতা দান করে। আত্মবিশ্বাস জাগ্রত হইলে স্বাধীনতা বিলম্বিত হয় না। খদ্দরের প্রসাদে ইহা সহজেই সম্ভব বলিয়া গান্ধীজি ঘোষণা করিলেন!

এইখানে একটা কথা স্মরণ করা প্রয়োজন। গান্ধীপূর্ব যুগে আমাদের স্বরাজসাধনার ক্ষেত্রটি কেবলমাত্র পুরুষের দখলে ছিল। নারীর সেখানে প্রবেশের সুযোগ ছিল না বলিলেই চলে। চরকা ও খদ্দরকে কেন্দ্র করিয়া নারীসমাজ স্বরাজসাধনার বেদীতলে দ্রুত সমবেত হইলেন ইহা এক মহা বিস্ময়। এত সহজে এবং অল্প সময়ে পৃথিবীর কোন দেশের নারীসমাজে এমন জাগরণ ও ক্রিয়াশীলতা দেখা যায় নাই। খাদির এই যাদুকরী শক্তি ব্যাখ্যা করিয়া গান্ধীজি বলিয়াছেন: 'জনসাধারণ ইহার মধ্যে জীবনদায়িনী শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। নারী ইহাকে তাহার সতীত্বের রক্ষাকারী বিবেচনা করেন। যে সকল বিধবাদের সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে তাহারা সকলেই চরকাকে একটি বিস্মৃত প্রিয় বন্ধুরূপেই জানিয়াছেন।'

পরবর্তীকালে গান্ধীজির রচনায় খদ্দর একটি শাস্ত্র হইয়া ওঠে। ব্যবসায়িক সাফল্যের সহিত ইহার বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে তিনি আলোচনা করেন। এমন কি একটি প্রবন্ধের শিরোনামা পাইতেছি The Music of spinning wheel (Young India 1.7.1920)। তাঁহার খাদি প্রবন্ধগুলির নাম ছিল যেমন বিচিত্র, বিষয়বস্তু ছিল তেমনি বিস্তৃত। কিন্তু তাঁহার সকল চিন্তা, ও কর্মের

মূলে ছিল—খাদি মানে সত্যতম স্বদেশী ভাবনা এবং বুভুক্ষু জনতার সামিল হওয়া।

খদ্দর বিষয়ে গান্ধীজির চিন্তার সহিত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ দেশবরেণ্য ব্যক্তিগণ কালক্রমে একমত হইয়াছিলেন এবং ইহার প্রচারে যত্নবান হন। কিন্তু ইহা সহজে ঘটে নাই। বিস্তর বিচার-বিবেচনা বাদ-প্রতিবাদের দ্বারা ইহা সম্ভব হয়। সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বিতণ্ডা হয় রবীন্দ্রনাথের সহিত। খদ্দরের তাৎপর্য সম্পর্কে গান্ধীজির ভাষ্য রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন নাই। তিনি ইহার বিরূপ সমালোচনা করিয়া মডার্ণ রিভিয়্যু মাসিক পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। ইহার উত্তরে গান্ধীজির উক্তিগুলি ঐতিহাসিক মর্যাদা পাইয়াছে। তাহার একাংশ হইল ঃ

To a people famishing and idle, the only acceptable form in which God can dare appear is work and promise of food as wages. God created man to work for his food, and said that those who ate without work were thieves. Eighty percent of Indians are compulsorily thieves half the year··· Hunger is the argument that is driving India to the spinning wheel.

মমার্থঃ দুর্ভিক্ষপীড়িত অলস মানুষের নিকট একমাত্র কাজ ও মজুরীস্বরূপ খাদ্যের রূপ ধরিয়াই ভগবান আবির্ভূত হইতে সাহসী হন। মানুষ অন্নের জন্য শ্রম করিবে। যে মানুষ শ্রম না করিয়া খায় সে চোর। ভারতের আশী শতাংশ মানুষ এই হিসাবে বাধ্য হইয়া চোর হইয়াছে।··· ক্ষুধার জন্যই ভারতবাসী চরকা গ্রহণ করিয়াছে। ক্ষুধা হইতে মুক্তি দিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া গান্ধীজি লিখিয়াছেন—খদ্দরের আত্মা আছে।···যাহারা ভূখা ছিল খদ্দর তাহাদিগকে আজ বাঁচাইয়াছে। ইহা নারীকে লজ্জাকর জীবন যাপনের গ্লানি হইতে মুক্ত করিয়াছে।

যে স্ত্রীগণ বাহিরের কাজে যাইতে পারেন না বলিয়া অকর্মা থাকিয়া কলহবিবাদে লিপ্ত হইতেন তাহারও বাঁচিয়াছেন।

গান্ধীজির দৃষ্টিতে খদ্দরের সত্যস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ পরে অনুধাবন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার ভাগিনেয়ী প্রখ্যাত নেত্রী সরলাদেবী চৌধুরাণীই বোধ হয় প্রথম খদ্দরের সাড়ী তৈরী করেন। প্রতিষ্ঠিতা মহিলাদের মধ্যে তিনিই উহা পরিয়া প্রথম প্রকাশ্যে বাহির হন। তাঁহার এই পোষাক রবীন্দ্রনাথ অনুমোদন করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধীজির জীবন যাপন পদ্ধতি লইয়া ঐকমত্য হয় নাই। তথাপি খদ্দরের অন্তর্নিহিত বাণীটি তিনি উপেক্ষা করেন নাই। খাদি কেবল হাতে-কাটা সুতার তাঁতে বোনা কাপড় মাত্র নয়। ইহাকে একটি পন্থা বা জীবনমার্গ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। বস্তুতঃ এই সত্যের স্বীকৃতির উপর রবীন্দ্রনাথের শ্রীনিকেতনের কর্মোদ্যোগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

মানুষের ক্ষুধার অন্ন যদি না জোটে, লজ্জা নিবারণের বস্ত্র যদি সংগ্রহ করিতে সমর্থ না হয় তবে স্বাধীনতার সত্যই কোন মানে হয় না। খদ্দর কর্মের মধ্যে পরিধানের বস্ত্র ও ক্ষুধার অন্ন উভয়ই নিহিত রহিয়াছে। সভ্যতার সংজ্ঞা নির্দেশিত হয় রান্না করিয়া খাওয়া, কাপড় বুনিয়া পরিতে জানা, ঘর বাঁধিয়া বাস করিতে পারা প্রভৃতি বিবিধ কর্ম-সম্পাদনের চারুত্বের দ্বারা। প্রতি পরিবারেই আমরা আমাদের অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া থাকি। কিন্তু কাপড় বুনি না। ইতিহাস বলে নিকট অতীতে ঘরে ঘরে চরকা ও তাঁত ছিল। লক্ষ্মীর ব্রতকথার রচনাকাল খুব পুরাতন নহে। কিন্তু ইহা পাঠ করিলে ধারণা হয় একদা সমাজে নারীগণ গৃহকর্মের অবসর সময়ে চরকা কাটিতেন। পাঁচালিকার লিখিয়াছেন—'আলস্য ত্যজিয়া কাট সুতা বামাগণ।' নারী-সমাজের আলস্য অপেক্ষা ইংরেজের বাণিজ্যিক স্বার্থানুসারী রাষ্ট্রধর্ম্ম ও অর্থনীতির প্রভাবে লক্ষ্মীলাভের সহজ ও সর্বজনীন্ উৎসটি শুষ্ক হইয়া যায়।

সত্যাগ্রহ আশ্রমে আশ্রমিকদের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে দু-তিনখানি তাঁত বসানো হয়। তাহার সাফল্য গান্ধীজিকে আকৃষ্ট করে। তিনি ইহার সকল স্তরের—সূতা প্রস্তুত করিবার তুলা হইতে সুরু করিয়া বস্ত্র উৎপাদন পর্যন্ত খোঁজখবর করিতে থাকেন। শ্রীমতী গঙ্গা মজুমদার নাম্নী জনৈকা সমাজসেবী মহিলা গান্ধীজির আগ্রহে বরদা রাজ্য হইতে তাঁহাকে চরকা আনাইয়া দেন। এইভাবে চরকার সহিত গান্ধীজির প্রথম পরিচয় ঘটে।

মগনলাল গান্ধীর চেষ্টা ও শ্রমে গঙ্গাদেবী প্রেরিত চরকার অচিরেই প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। চরকা বা খাদিকে কেন্দ্র করিয়া গান্ধীজির চিন্তার রাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত হইল। অন্নবস্ত্র সমস্যার মূলে রহিয়াছে মানুষের বেকারী। অন্নহীনকে অন্নদান করা অপেক্ষা কর্মে নিয়োগের সুযোগ করিয়া অন্ন অর্জনের ব্যবস্থা করা যে সহস্র গুণে কল্যাণকর তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। গান্ধীজি খদ্দর প্রবর্তন করিয়া কর্মহীন অসহায় মানুষকে বাঁচিয়া থাকিবার উপায় করিয়া দিয়াছেন। কংগ্রেসের খদ্দর-নীতিও গান্ধীজির উদ্ভাবিত। ইহার ফলে খদ্দরের ব্যবহার বাড়ে। কোটি কোটি টাকা মূল্যের খদ্দর উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয় হইতে থাকে। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকার সংস্থান হয়। খদ্দরের শ্রী নাই, খদ্দর মোটা, ইহা ব্যবহার করিতে নানা অসুবিধা, ইহার মূল্য বেশি প্রভৃতি নানাবিধ বিরূপতা ও বিপক্ষতার মোকাবিলা করিয়াও গান্ধীজি খদ্দরের প্রচলন ও প্রচার করিতে সমর্থ হন। তাঁহার মতে খদ্দরের গুণগুলি হইল ঃ

ইহা কর্মের সহজ উৎস। বিনা অসুবিধায় অবসর সময়কে খদ্দর উৎপাদনে নিয়োগ করা যায়। ইহা সকলেরই জানা কাজ।

যাহারা জানেন না তাহারা অতি সহজে শিখিতে পারেন। তেমন কোন মূলধনের প্রয়োজন হয় না। সহজে ও সস্তায় উৎপন্ন হয়।

জনসাধারণের মধ্যে এবিষয়ে তেমন বিরোধিতা নাই।

দুর্ভিক্ষের সময় ইহার দ্বারা শীঘ্র সাহায্য করা যায়। খদ্দরের দ্বারা

দেশের টাকা দেশেই থাকে এবং জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া যায় বলিয়া অগণিত মানুষের অভাব ঘোচে।

খদ্দরে সামান্য সফলতায় অসামান্য লাভ হয়।

খদ্দর জনসাধারণের মধ্যে সহজ ও সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যম।

গান্ধীজি চরকাকে জনসাধারণের আশা-আকাঙ্খার প্রতীক বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। এই জনসাধারণ মানে গ্রাম-ভারতের মানুষ। ইংরেজশাসনে গ্রাম-ভারতবর্ষ শোষণ করিয়া শহর হইয়াছে। ইংরেজ ভারতবাসীকে শোষণ করিয়াছে। শহরবাসীরা গ্রামবাসীকে শোষণ করিতেছে। গ্রামের মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন সম্পদ শহরের মানুষ বুদ্ধি ও কৌশলের দ্বারা বিনাশ্রমে ভোগ করিয়া থাকে। শোষণের এই চরিত্র সাম্রাজ্যবাদী শাসকের শোষণ হইতে বিশেষ পৃথক কিছু নহে। ইহাই নীতিভ্রষ্টতা। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসভায় একদা মহাত্মা গান্ধী গীতার শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলেন—শ্রম না করিয়া অন্নগ্রহণ চুরি করার সামিল। অতএব তিনি প্রত্যেককেই কিছু না কিছু কায়িক শ্রম করিবার উপদেশ দিয়াছেন। এই শ্রমকে গীতায় যজ্ঞ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। গান্ধীজি বলিলেন, যুদ্ধের সময় (প্রথম মহাসমর) ইংল্যাণ্ডের মানুষ গৃহপ্রাঙ্গনে আলু উৎপাদন করিয়া, অবসর সময়ে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় সামান্য সেলাই ফোড়াই করিয়া এই গীতোক্ত যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছেন। আমাদের দেশে এই যুগে সেই যজ্ঞ হইল চরকা।

ভারতপ্রাণ ছড়াইয়া রহিয়াছে ইহার ৭ লক্ষ গ্রামে। দেশ বিভাগের পর গ্রামের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৫৫৮০৮৮। সেই গ্রাম যদি দিনের পর দিন অবহেলিত থাকে, শোষিত হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষের মুক্তি যে একান্তই অসম্ভব কথা ইহা গান্ধীজি নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিলেন। তাই তিনি গ্রাম-গঠনের কথা বলিলেন এবং তাহার উপায়ও উদ্ভাবন করিলেন। খদ্দর গ্রামের প্রতীক। তিনি বলিলেন, আর কিছু যদি করা নাও যায় খদ্দর ব্যবহার করিলে গ্রামবাসীর শোষণের কিছু প্রতিকার হইবে।

খদ্দর কেনা মানে দেশের অর্থ দেশের দরিদ্রতম মানুষটির হাতে পড়া।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি বহুজনে খদ্দরের বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন ; ইহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন নাই। ইহা লইয়া বিস্তর আলোচনা আছে। আমি এখানে সাম্যবাদী দলের শ্রীসাকলাত-ওয়ালার 'কিসের জন্য খাদি এই প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজি যাহা বলিয়াছিলেন' তাহার অংশ বিশেষের মর্মার্থ উদ্ধৃত করিতেছি।

খদ্দর সরলতার প্রতীক। ইহা ধনী দরিদ্র সকলেরই উপযুক্ত। ইহার দ্বারা প্রাচীন চারু-শিল্পের পুনরুজ্জীবন হইবে। ইহা যন্ত্রের ধ্বংস না করিয়া অবাঞ্ছিত প্রসার নিয়ন্ত্রিত করে। দরিদ্রতম মানুষ তাহার কুটিরে বসিয়াই এই যন্ত্র ব্যবহার করিতে পারেন। চরকাই একটি সুন্দর যন্ত্র।

খদ্দর দরিদ্রকে ধনীর খপ্পর হইতে মুক্ত করে। ইহা বিভিন্ন শ্রেণী ও জনসাধারণের মধ্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সংযোগ সাধন করে। ধনী বিবিধ উপায়ে দরিদ্রের নিকট হইতে যাহা সাধারণতঃ লইয়া থাকেন তাহার কিছুটা খদ্দরের দ্বারা পুনরুদ্ধার করা যায়।

ইহার দ্বারা চোখ ঝলসানো বিস্ময়কর কিছু রাতারাতি হয় না। উপরের কথাগুলির গুরুত্বও তাই সচরাচর তেমন অনুভূত হয় না। গ্রামের যে দরিদ্রলোকটি অনাহারমুক্ত হইল, যে বিধবা স্ত্রীলোকের মানসিক শান্তি আসিল তাহাদের স্ব স্ব মণ্ডলীর বাহিরে ইহা বিশেষ অনুভবগ্রাহ্য নহে। সকলের খাইতে পাওয়াই নিয়ম। তাই চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় অনাহারের দ্বারা। সুতরাং অনাহারমুক্তির আয়োজন সহজেই অস্বীকার করা যায়। সেইজন্য বহুজনে ইহাকে কৃপার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। ইহাকে এক বিচিত্র খেয়াল ও অসম্ভব কার্যক্রম বলিয়াও অনেকে উল্লেখ করিয়াছেন। গান্ধীজির ইহা অজ্ঞাত ছিল না। খাদি-দর্শনটি না বুঝিলে ইহার মর্মকথা জানা যাইবে না। অজ্ঞানতার জন্যই ইহা ক্ষ্যাঁপা মানুষ ও বড়লোকের বাতিক ও খেয়াল থাকিয়া যাইবে।

It must then remain fad of the moneyed people and the cranks.

ভারতবর্ষকে শিল্পায়িত করিবার একটা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা স্বাধীনতার পর সুরু হইয়াছে। দিকে দিকে বিস্তর ভারি ভারি কলকারখানা হইয়াছে। এখনও নিত্য নূতন ফ্যাকটৃরি স্থাপিত হইতেছে। বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলির তালিকায় ভারতবর্ষ স্থান পাইয়াছে। যে দেশে একটি স্থচ তৈরী হইত না সে দেশের যন্ত্রপাতি মায় রেলগাড়ি বিদেশে রপ্তানী সুরু হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও বেকারের সংখ্যা বাড়িয়াছে। দেশের দরিদ্র মানুষের ভাগ্যের বিশেষ অদল বদল হয় নাই। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অঙ্গে বহুমূল্য পোষাক, গৃহে বিলাসের বিবিধ উপকরণ, অথচ আরও বেশী পাইবার জন্য তাহারা উন্মত্ত। দেশের বিত্তবান মানুষের কল্পনাতীত সম্পদ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অপর দিকে পল্লীর মানুষের দারিদ্র্য বাড়িয়াছে। সরকারী দানে বা লগ্নীতে বহিরঙ্গে সামান্য সম্পদশ্রী দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি, লোক সংখ্যা বৃদ্ধি এবং জীবনা-দর্শের মূলগত পরিবর্তনের জন্য তাহা অনুভবগ্রাহ্য নহে। বড় বড় পরিকল্পার স্থান গ্রামে নাই। গ্রামের মানুষের দুঃখ আমরা অনুভব করিতে পারি নাই। তাহাদের সহিত আত্মিক যোগ হারাইয়া ফেলিয়াছি। সেই জন্যই এই দুর্দৈব। গান্ধীজি বলিয়াছেন সর্বসময়ের খাদি ব্যবহারকারী দেশের দরিদ্রতম মানুষের সহিত একাত্ম হন। ইহার দ্বারা তাহার স্বদেশপ্রেম এবং আত্মত্যাগ বিকশিত হয়। সুতরাং খাদির বিকাশ ভিন্ন গ্রামের মুক্তি নাই।

শোষণই যন্ত্র-সভ্যতার পরিণতি। ইহা বৈষম্য সৃষ্টি করে। বৈষম্যই সংঘর্ষের কারণ। অন্যদিকে শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের সঙ্গে হিংসা ও শোষণ লোপ পায়। আর চরকা হইবে এই বিকেন্দ্রীকৃত গ্রাম-শিল্পের মধ্যমণি। খামগাঁও জাতীয় বিদ্যালয়ে এক বক্তৃতায় গান্ধীজি বলেন, চরকা বৃত্তি মাত্র নহে। ইহা সেবা। ইহা বিজ্ঞান। কারণ জনসাধারণ ইহাকে অবস্থার উন্নতি বিধানের উপায় জ্ঞান করেন

ধনবিজ্ঞানে নীতির নানা কথা আজকাল শ্রুত হয়। বৈশ্য-সভ্যতার স্পর্শে এই নৈতিকতা সর্বত্রই মলিন। রাজনীতির ক্ষেত্রে যেমন স্বদেশ স্বজাতি এবং স্বমতের পোষকতার জন্য প্রয়োজনমত মিথ্যাচার 'সত্য' আচরণ বলিয়া স্বীকৃত তেমনি ধনবিজ্ঞানের নৈতিকতাও। মানুষ বড় বড় কলকারখানার দাসত্বে আত্মসমর্পণ করিলে পরিত্রাণের উপায় থাকে না। ইহাই তো যন্ত্ররাক্ষসী। ইহার প্রেম ও প্রতিহিংসা উভয়ই মানুষের পক্ষে অসহনীয়। এ বিষয়ে গান্ধীজির একটি সাবধান বাণী এই ঃ

Economics that hurt the moral being of an individual or a nation are immoral and therefore sinful···

খদ্দর উৎপাদন অর্থনীতির বিচারে অনেকে অলাভজনক মনে করেন। কিছু না করার চাইতে এক হাত সুতো তৈরী করাও দেশের পক্ষে হিতকর। অর্থনীতির হিসাবেও ভাল। গান্ধীজি বলেন জীবন, অর্থ অপেক্ষা বড়। অর্থ সর্বেসর্বা হইলে বৃদ্ধ মাতাপিতা বা অকর্মণ্য শিশুদের হত্যা করিয়া ফেলাই লাভজনক বিবেচিত হইত। কিন্তু আমরা তাহাদের রক্ষা ও পোষণ করিবার অধিকারকে বিশেষ সৌভাগ্য বলিয়াই বিবেচনা করি। জাতীয় হিতসাধনের ক্ষেত্রে কোন কিছুই মহার্ঘ বিবেচিত হইতে পারে না। আর উৎপাদকের নিকট খাদি তো সর্বাধিক সুলভ।

চরকা মানবজীবনে, ভারতবাসীর জীবনে তো বটেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। ভারতীয় কংগ্রেসের পতাকা (তখন জাতীয় পতাকা বলিয়া অভিহিত) চরকা লাঞ্ছিত। জলন্ধরের লালা হংসরাজের প্রস্তাবে চরকা জাতীয় পতাকায় গৃহীত হয়। জাতীয় জীবনে চরকা জনগণের আশা-আকাংখার প্রতীক বলিয়া স্বীকৃত হইল।

মহাভারতে বর্ণিত ব্যাধের ব্রহ্মলাভের ন্যায়—চরকারূপ স্বকার্য সাধনার দ্বারা ভারতবাসী স্ত্রী পুরুষ শিশু বৃদ্ধ যুবা নির্বিশেষে সকলেই

স্বাধীনতা সংগ্রামের সামিল হইলেন। শুধু তাহাই নহে, চরকা লইয়া পক্ষে বিপক্ষে যত আলোচনা হোক না কেন—জনসাধারণ ইহাকে জীবনদাত্রী বলিয়া চিনিয়াছিলেন। কিন্তু অধিক লাভের লোভে এ নিরাপদ পথ আজ পরিত্যক্ত। তেল এবং থলি উভয়ই হারাইয়া আমরা আজ রিক্ত।

কংগ্রেসের অন্তর্বিরোধে খাদি একদা মিলনের সেতুবন্ধন করিয়াছিল। স্বরাজ্যদলের সহিত কংগ্রেসের বিরোধ সামান্য ছিল না। গান্ধীজি তাঁহার খদ্দর-নীতির দ্বারা এই বিরোধ মিটাইতে সমর্থ হন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু দাশ ও পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু বেলগাঁও কংগ্রেসের পূর্বে এ সম্পর্কে একটি যুক্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। তাহাতে ছিল—"কংগ্রেসের বিভিন্ন শ্রেণীর কাজ প্রয়োজনমত ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে কিন্তু কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সকল শ্রেণীই চরকা কাটা, তাঁতবোনা ও ইহার আনুষঙ্গিক কর্ম এবং হাতে তৈরী খাদি প্রসারের কাজ করিবেন।" এই সময় কিছুদিনের জন্য কংগ্রেসের চাঁদা অর্থের পরিবর্তে হাতে-কাটা সুতায় আদায় দিবার নিয়ম হয়। স্বরাজ্য দলের লোকজন খদ্দর গ্রহণ করায় পরিবর্তন বিরোধীরাও চুক্তিটি অনুমোদন করেন। বেলগাঁও কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন গান্ধীজি।

বাঙলার খাদি-নেতা শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত ম্যাজিক-লণ্ঠন সহযোগে দেশের তাঁত-শিল্প ধ্বংসের করুণ কাহিনী ও ইহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বিষয়ে কোকনদ কংগ্রেসেই উল্লেখযোগ্য বক্তৃতা করেন।

খদ্দর আলোচনাকালে গান্ধীজির কটি-বস্ত্রকে কিছুতেই ভুলিয়া থাকা যায় না। যদিও খাদির সহিত ইহার যোগ সামান্যই। ১৯২১ সনে গান্ধীজি ত্রিচিনপল্লীতে খাদি প্রচার কার্যে ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি দেখিলেন অনেকের খাদি বস্ত্র কেনার পয়সা নাই। পুরা কাপড় যাহারা কিনিতে অক্ষম তাহারা কটিবাস পরিতে পারেন। আমাদের দেশ গরম। গায়ের কাপড়ের প্রয়োজন নাই। গান্ধীজি তো জনসাধারণকে

কেবলমাত্র উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না। তিনি নিজে যাহা পালন করিতে সমর্থ হইতেন না, অন্যকে তাহা করিবার জন্য কখন উপদেশ দেন নাই। তাই তিনি ১৯শে সেপ্টেম্বর হইতে হঠাৎ খাটো কাপড় ধরিলেন, জামা ও টুপি বাতিল করিয়া দিলেন। সকলেই নিষেধ করিলেন। গান্ধীজি শুনিলেন না। আপাতত পরবর্তী ৩১শে অক্টোবর' পর্যন্ত 'কটি বস্ত্র' চলিবে বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু ইহা তাঁহার সারা জীবনের বসন হইল।

গান্ধীজিকে অনেকে প্রশ্ন করিতেন—খাদি পরিব কেন? দেশের ভাল করিবার কি অন্য উপায় নাই? গান্ধীজি ইহার উত্তরে একটি সুন্দর উদাহরণ দেন—অসুস্থ মানুষ গুরুপাক খাদ্য খায় না! খদ্দরের কাপড়ের সহিত নিত্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি দ্রব্য কুটিরশিল্পজাত হইবে ইহাই হইল পূর্ণ খদ্দরনীতির মূলকথা। এই দৃষ্টিভঙ্গি হইতেই গান্ধীজি নিজের খাইবার চামচটি পল্লী-শিল্পীর দ্বারা কাঠ দিয়া তৈরী করাইয়া লইয়াছিলেন। তিনি কৃষক ও তাঁতি বলিয়া নিজের পরিচয় দিতেন, আদালতেও তাহাই লেখান।

খদ্দর অল্প সময়েই গান্ধীজির চেষ্টায় বিশেষ প্রাধান্য পায়। ১৯২৫ সনেই পাটনা অধিবেশনে কংগ্রেস কর্মীদের সর্বক্ষণের জন্য খদ্দর পরিধান অপরিহার্য করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাঁহার বিশ্বাস ছিল শুধুমাত্র খদ্দর ব্যবহারের দ্বারা জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পায়, সংগঠন জোরদার হয়, মানুষে মানুষে সহমর্মিতা বাড়ে এবং ইহার জন্য যে সামান্য আত্মসুখ ত্যাগ ও শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিতে মানুষ সানন্দে ব্রতী হয় তাহার দ্বারা আমরা লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের দুঃখ ও আনন্দের ভাগ গ্রহণ করিতে পারি। ইহাকে তিনি দরিদ্রনারায়ণ সেবা, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের সূত্র, সমতা, ঐক্য এবং অহিংসা সাধনার প্রত্যক্ষ উপায় বলিয়া বিবৃত করিয়াছেন। ইহা তাঁহার নিকট তপশ্চর্যা ছিল। বস্তুতঃ সর্বকর্মের সহিত খাদির যোগ রহিয়াছে বলিয়া গান্ধীজি দাবি করিতেন খাদি-চেতনা তাঁহার নিকট অনন্ত ধৈর্যের, অসীম বিশ্বাসের এবং

বিশ্বব্যাপী সৌভ্রাতৃত্বের উৎস ছিল। এমন কি নির্বাচনে যে স্বরাজ্য দল জয়ী হইয়াছিল তাহার কারণ ঐ খদ্দর। Let me assure You that it was khaddar that won the election for the Swarjists. খদ্দরের পোষাকের দৌলতে নেতারা সহজে জনচিত্তে প্রভাব সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন। "The leaders said Khaddar alone was the only passport to the heart of the villagers।" সরলতা, সেবা ও সততার প্রতীক হিসাবে জনসাধারণ খদ্দর গ্রহণ করিয়াছিলেন!

মহাত্মা গান্ধী নিজ হাতে নিত্য চরকা কাটিতেন। তিনি খাদির প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য অজস্র প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, সারা ভারতবর্ষের গ্রামে প্রান্তরে ভ্রমণ করিয়াছেন, বক্তৃতা করিয়াছেন, খাদি উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়াছেন। কলিকাতার খাদি-ভাণ্ডার উদ্বোধন দিবসে (১লা জানুয়ারী ১৯২৯) গান্ধীজি ক্যাশমেমো স্বাক্ষর করিয়া খাদি বিক্রয় করেন। ৩৫২ জন লোক প্রায় পাঁচ হাজার টাকার খাদি ঐ সময় ক্রয় করেন। ইহা ছাড়া পরিকল্পনা রচনা, কর্মীবাহিনী গঠন, সাজসরঞ্জামের উন্নতিবিধানের জন্য অন্যান্য বিধি ব্যবস্থার সহিত পুরস্কার ঘোষণা, শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির যাবতীয় কার্যের খুঁটি-নাটি পর্যন্ত গান্ধীজি নিজে দেখিতেন। ইহার সুষ্ঠু পরিচালনার নিমিত্ত দুইটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। ১৯২৫ এ অখিল ভারত কাটুনী সংঘ গঠিত হয়। বাঙলাদেশ হইতে শ্রীসতীশ দাসগুপ্ত সদস্য মনোনীত হন। ইহার তিনজন সম্পাদকের একজন ছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের সঙ্গে খাদি ও গ্রামশিল্পের প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়া ইহাকে জনপ্রিয় করিবার চেষ্টা করেন। ১৯৩৬ সনে ফৈজাবাদে প্রথম গাঁওমে কংগ্রেস হয় সেখানে প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন গান্ধীজি। সে উপলক্ষে তিনি একটি পরম সত্য বাক্য উচ্চারণ করেন: আপনারা যদি বর্তমানের তিন পয়সার পরিবর্তে তাহাদিগের (বেকার আধা-বেকার গ্রামবাসী) জন্য তিন আনার ব্যবস্থা করিতে পারেন তবে তাঁহারা মনে

করিবেন স্বরাজ লাভ হইয়া গিয়াছে। আজ কাটুনীদের জন্য খদ্দর এই কাজটিই করিতে চেষ্টা করিতেছে।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খদ্দরের উপর গান্ধীজির আস্থা বাড়িতে থাকে। তাঁহার ভাষায় I said in 1918 that we could win swaraj through the spinning wheel. My faith in spinning wheel is as bright today. চরকায় গান্ধীজির বিশ্বাস উজ্জ্বলতর হইলে কি হইবে অবিশ্বাসীর সংখ্যা কম ছিল না, ইহার বিরুদ্ধতাও ছিল দেশজোড়া। গান্ধীজি ইহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। নিঃসংশয়ে তিনি ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন – মানুষ এখনই যদি বা বিশ্বাস নাও করে, একদিন তাহাকে খাদিতে বিশ্বাসবান হইতে হইবেই। গান্ধীজির ভাষায় "আপনারা আজ আমাকে বিশ্বাস করিতে নাও পারেন, আপনারা ইচ্ছা করিলে আমাকে উন্মাদ বলিতে পারেন, কিন্তু দিন আসিতেছে যখন আপনারা বলিবেন এই বৃদ্ধ লোকটিই সত্য বলিয়াছিল। যদি সত্য সত্যই গ্রামময় ভারতবর্ষের সমৃদ্ধি আনয়ন করিতে হয় তাহা হইলে চরকাই হইবে তাহার একমাত্র উপায়। ভারতবর্ষের সমৃদ্ধি ও স্বরাজের প্রতীক হইল চরকা।

স্বাধীনতার একুশ বৎসর পরে গান্ধী জন্ম শতবর্ষে আমরা উপনীত। তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। বড় বড় অনেক কলকারখানা স্থাপিত হইয়াছে। শহর স্ফীত হইয়াছে। গ্রামের অবস্থা কিন্তু অপরিবর্তীত। গান্ধীজি আমাদের গ্রামগুলিকে গোবরগাদা বলিয়াছেন। এখনও কি আমরা এইগুলিকে অন্য কিছু বলিতে পারি? আজও বৃদ্ধ গান্ধীর কথাটা মর্মান্তিক সত্যরূপে প্রকটিতঃ বড় কারখানা নহে, চরকার মধ্যে গ্রামের মুক্তি, গ্রামের সমৃদ্ধি। গান্ধীজির ধ্যানে স্বাধীন ভারতবর্ষে গ্রামের যে রূপ ছিল তাহা স্মরণ করিয়া আজকের প্রসঙ্গ সমাপ্ত করি। প্রত্যেকটি গ্রাম হইবে এক একটি প্রজাতন্ত্র। ইহা নিজের খাদ্যশস্য সব্জী ফল এবং খাদি উৎপাদন করিবে। আমাদের পরিকল্পনাকারগণ কি বলেন জানিতে ইচ্ছা করে।

সত্য ও অহিংসা

সত্য ও অহিংসা গান্ধী জীবনের অন্যতম প্রধান মূলাধার। তাঁহার জীবন বিকাশের পথ ছিল সত্য। এই পথ হইতে তিনি কখন ভ্রষ্ট হন নাই। সত্যের প্রতি অকৃত্রিম আকুতির জন্যই ঈশ্বর তাঁহার নিকট সত্যস্বরূপ ছিল। তিনি বলিতেন ঈশ্বর সত্য; সত্যই ঈশ্বর। এবং গভীর বিশ্বাসের সহিত তিনি লিখিয়াছেন "যখন আপনারা সত্যকে ঈশ্বররূপে অনুসন্ধান করিতে চাহিবেন, তখন একমাত্র উপায় হইবে প্রেম অর্থাৎ অহিংসা।" গান্ধী-জীবনে তাই ঈশ্বর, সত্য, প্রেম ও অহিংসা একাকার হইয়া একটি বৈপ্লবিক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল।

ভগবানকে অস্বীকার করা সহজ, প্রতিবাদের ঝুঁকি নাই। কিন্তু সত্যকে স্বীকার করি না বলা কঠিন। সমাজে সত্যের স্বীকৃতি অবিসংবাদিত। আর সত্যকে যথার্থভাবে মানিলে অহিংসাকে এড়াইয়া যাইবার উপায় নাই। আমরা অধিকাংশ লোক দায়ে ঠেকিলে ভগবানের দুয়ারে হত্যা দেই; সত্যকে প্রয়োজনানুসারে বিকৃত করিতে কুণ্ঠিত হই না, এবং হিংস্রতা তখন আমাদের ভীরুতার আবরণ হয়।

সত্য কি ইহা লইয়া অবশ্যই মতভেদ থাকিতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন লোক পরস্পর বিরোধী কথাকে সমান জোরের সঙ্গে সত্য বলিয়া দাবি করেন। সত্য নির্ধারণ দুরূহ কাজ। গান্ধীজি বলিয়াছেন অন্তরের

বাণীকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহাও কঠিন ব্যাপার। গান্ধীজি বলেন ঃ "যাহার মধ্যে প্রচুর বিনয় ভাব নাই, তিনি সত্যের সন্ধান পাইবেন না। সত্যের হৃদয়-মহাসমুদ্রে যদি আপনি সন্তরণ করিতে চান, তবে নিজেকে শূন্যে পরিণত করিতেই হইবে।"

ইচ্ছা করিলেই মানুষ পূর্ণ সত্যাশ্রয়ী হইতে পারে না। ইহার জন্য সাধনা দরকার। মূর্তিমান সত্য স্বরূপ মহাত্মা গান্ধী নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান হইতে লিখিয়াছেন—"যাহারা সত্য সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়াছেন তাহারা জানেন যে, বিবেকের বাণী শুনেন বলিয়া দাবি করা প্রত্যেকের পক্ষে ঠিক নয়। কোনরূপ সংযম শৃঙ্খলার সাধন না করিয়া আজকাল প্রত্যেকে বিবেকের অধিকার দাবি করেন ও তাহাতে দিশাহারা জগতের নিকট এতই অসত্য পরিবেশন করা হয়।"

সত্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং সত্যময় জীবন যাপনের সুতীব্র আকাংখা হইতে গান্ধী মহাজীবনেব সর্ববিধ মত ও পথের উদ্ভব হইয়াছে। মানব ইতিহাসে এই প্রথম আমরা দেখিলাম গান্ধীজির প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও সত্য এবং নীতিবোধের স্বীকৃতি। স্বীকৃতি মাত্র দিয়াই গান্ধীজি ক্ষান্ত হন নাই। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা যে ইহা লভ্য সে কথা নিঃসংশয়ে এবং অকপটে প্রকাশ করিয়াছেন। অভ্যাস এবং বৈরাগ্যেরও তিনি অপূর্ব একটি সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। "সত্যকে আঁকড়াইয়া থাকার নামই অভ্যাস; আর সত্য ব্যতীত অন্য সমস্ত বস্তুর বিষয়ে উদাসীনতাই বৈরাগ্য।

গান্ধীজি বলিয়াছেন ঃ "অহিংসা ব্যতীত সত্যের জ্ঞান অসম্ভব।" তিনি অহিংসাকে সাধন ও সত্যকে সাধ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। "যদি সাধন যত্ন করিয়া অভ্যাস করি, তবে সাধ্য কোনও দিন ত দেখা দিবেই।" অতএব সত্যকে মানিলে অহিংসাকে মানিতেই হইবে। ইহার বিকল্প হইতে পারে না।

অহিংসার ইতিবাচক সংজ্ঞা পাই নাই। যাহা হিংসা নয় তাহাকেই আমরা অহিংসা বলি। মারামারি কাটাকাটি প্রভৃতি বহিরঙ্গের হিংসা

এবং অসূয়া মাৎসর্য—মানসিক হিংসার ফসল। এই উভয়বিধ হিংসার মধ্যে মানসিক হিংসা অধিকতর ক্ষতিকর। মনে যাহার হিংসা প্রবৃত্তি নাই তিনি যদি কখন কাহাকেও আঘাত করেন তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত কম হিংসা হয়। মাছ খাওয়া অপেক্ষা খাদ্যে ভেজাল দেওয়াকে গান্ধীজি অধিকতর হিংসা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মাছ যাহার খাদ্য বলিয়া স্বীকৃত তাহার নিকট মৎস্যাহার হিংসা নয়। গান্ধীজি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যুগে যুগে হিংসা অহিংসার ধ্যানধারণার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। মহাভারতের অর্জুন যাহাকে হিংসা বা অহিংসা মনে করিতেন আমরা তাহা করি না। শ্রীবিধুভূষণ দাশগুপ্ত তাঁহার 'আচার্য বিনোবা' গ্রন্থে লিখিয়াছেন গান্ধীজি একদা বিনোবাকে বলিয়াছিলেন—কাহাকেও ভাবনায় ফেলিয়া রাখাও এক রকম হিংসা। মনু গান্ধী লিখিয়াছেন গান্ধীজি তাহাকে বলেন অসম্মানজনক কথা বলাও একপ্রকার হিংসা!

হিংসা পরিহার করা কথাটিও নেতিবাচক। মহাত্মাজি কখনও নেতিবাচক আন্দোলনের মধ্যে নিঃশেষিত হইয়া যান নাই। প্রতিটি আন্দোলনেই তিনি যেখানে কিছু পরিহারের কথা বলিয়াছেন সেখানেই সৃজনশীল রচনাত্মক কর্মের দ্বারা শূন্যস্থান পূর্ণ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। যেমন, বিলিতি কাপড় বর্জনের আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে খাদি উৎপাদনের পরামর্শ। বিলিতি বস্ত্র বর্জন করিয়া জনসাধারণ পরিধান করিবেন কি? দেশীয় কলের উৎপাদন প্রয়োজনের এক অতিশয় ক্ষুদ্র অংশ মাত্র মিটাইতে তখন সমর্থ ছিল। সুতরাং বিলিতি কাপড় বর্জন করিয়া মানুষের লজ্জা নিবারণের জন্য গান্ধীজি খাদি উৎপাদন ও ব্যবহার প্রবর্তন করিলেন। একদিকে বর্জন, আর এক দিকে গ্রহণ। ইহাকেই আমরা বলি সৃষ্টির দ্বারা বিল্লোপ। ইহার ব্যত্যয় ঘটিলে শুধু ধ্বংস ও বর্জনের হোতা হইতে হয়। খদ্দরের একটি পৃথক দর্শন আছে সে কথা খদ্দর প্রসঙ্গে পূর্বে কিঞ্চিৎ আলোচিত হইয়াছে।

অহিংসার ক্ষেত্রেও একই জিনিস লক্ষ্য করি। অহিংস সাধনায় মানুষকে অস্ত্রত্যাগ করিতে হয় এবং শারীরিক বলপ্রয়োগ হইতে বিরত থাকিতে হয়। সেই অবস্থায় হিংসাশ্রয়ীদের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্যও গান্ধীজি পথ নির্দেশ করিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিধ্বস্ত নোয়াখালির শ্মশানভূমিতে পৌঁছাইলে জনৈক যুবক তাঁহাকে প্রশ্ন করেন সেখানকার সেই হিংস্র পৈশাচিকতার মধ্যে তাহারা কি করিয়া আত্ম-বিশ্বাস ও নিরাপত্তা রক্ষা করিতে পারেন। উত্তরে গান্ধীজি বলেন : **By learning to die bravely**— বীরের মত মরিতে শিখিয়া। জনৈকা নারী বিপ্লব-কর্মীকে এই সময় গান্ধীজি যাহা বলিয়াছিলেন তাহাকেও এই পথনির্দেশের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সেই মহিলাকে তিনি বলিয়াছিলেন—বিভ্রান্ত ও ত্রস্ত নারীদের নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত না করিয়া তাহাদের স্ব স্ব গৃহে অবস্থান করিতে নির্দেশ দিন। আপনারা তাহাদের সহিত বাস করুন, এবং তাহাদের বলুন— আমাদের সকলকে হত্যা না করিয়া কেহই আপনাদের কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারিবে না। ইহা করিলে সকল বঙ্গনারীই বীর রমণী হইয়া উঠিবেন।

ব্রিটিশ সৈন্য ও পুলিশ হিংস্র এবং নির্মম নৃশংস অত্যাচার দ্বারা বিয়াল্লিশের আগষ্ট আন্দোলন প্রশমিত করিয়াছিল। ইহার ফলে নেতৃত্বহীন জনতা ভয়ানক ভীত হইয়া পড়ে। মুক্তির পর গান্ধীজি এই জনসাধারণের মনে অহিংস শক্তি ও সাহস পুনঃ সঞ্চারের জন্য গঠনকর্মের উপর জোর দেন। একই পদ্ধতিতে তিনি নোয়াখালিতে কাজ আরম্ভ করেন এবং হিন্দু মুসলমান সকলের বিশ্বাস অর্জন করিতে সমর্থ হন। নোয়াখালিতে গান্ধীজি যে মুসলীম বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হন তাহা জনসাধারণের সক্রিয় সমর্থনহীন রাজনৈতিক নেতাদের সৃষ্ট বিরূপতা।

অহিংসা সৃষ্টিধর্মী হইলেও মানুষের পক্ষে পূর্ণ অহিংস হওয়া সম্ভব নয়। অনেকে বলেন একের বিলোপের উপর কোন না কোন আকারে অপরের বিকাশ নির্ভরশীল। সাদা চোখে ইহাই দেখি এবং

সাধারণ বুদ্ধিতে তাহাই বুঝি। গরু-মহিষ-মানুষ হত্যা বন্ধ করিলে বাঘকে অনাহারে মরিতে হয়। মানুষের খাদ্যতালিকায় প্রাণীর সংখ্যা কম নয়। যাহারা নিরামিষভোজী তাহারাও জড়জীবন ভোজন করেন। আমাদের চলা ফেরা শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের সময়ও অজ্ঞাতে আমরা জীব হত্যা করিতেছি। সুতরাং পূর্ণ অহিংসা বোধহয় সম্ভবপর নহে। তথাপি গান্ধীজির কর্মজীবন অহিংসা সাধনার মাধুর্যে প্রসারিত ও শাশ্বতের ভূমিতে দীপ্যমান। এই সাধনার পথিকৃতের গৌরব বুদ্ধদেবের। "বুদ্ধের বাণী" প্রবন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বুদ্ধ-পূর্বযুগের মানবচরিত্র ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন "তাহারা ঈশ্বরের জন্য নিজের জীবন বলি দিতে পারে, আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে সে ঈশ্বরের নামে নরহত্যা করতে পারে।" এই আচরণ ভ্রান্ত-বিশ্বাস সঞ্জাত। মানুষের এই বিশ্বাস যেমন অপরকে আঘাত করিত, তেমনি নিজেকেও। প্রসঙ্গক্রমে বিবেকানন্দ সন্তান বিসর্জনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সন্তান বিসর্জন বা নরবলির মধ্যে যাহারা কল্যাণ দেখিতেন তাঁহারা যে ভ্রান্ত সে কথা আজ সকলেই স্বীকার করেন। বুদ্ধদেবের সাধনার সুফল পাইতে আমাদের বহু শতাব্দী অপেক্ষা করিতে হইয়াছে। ভগবান বুদ্ধের সেই সাধনার পথ ধরিয়া মহাত্মা গান্ধী ব্যক্তি জীবনের অহিংসাকে সমাজ ও রাষ্ট্রের সামূহিক কর্মে প্রসারিত করিয়া মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এক নূতন দিগন্তের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহারও সুফল পাইতে মানব-সমাজকে হয়তো আরও কয়েক শতাব্দী অপেক্ষা করিতে হইতে পারে। অনাগত ভবিষ্যতের সেই সুপ্রভাতকে ত্বরান্বিত করিবে গান্ধী মহাজীবন এবং কর্মের স্মরণ মনন ও অনুসরণ। এই সাধনার পথে বর্তমানের দেশ ও কালের গণ্ডীদ্বারা খণ্ডিত মানব-অনুভূতি বিশ্বব্যাপ্ত হইবে।

আজ একজন বঙ্গসন্তান নিহত হইলে আমি যতটা বেদনাহত হই একজন ইংরেজ বা আমেরিকানের জন্য ততটা শোকাতুর হই না। ইহাও ভ্রান্ত আচরণ। বিবেকানন্দ পূর্বোক্ত প্রবন্ধেই লিখিয়াছেন,

বিশ্বের যে কোন অংশের মানুষের উপর আঘাত যেন আমরা নিজের আঘাত বলিয়া মনে করিতে পারি। গান্ধীজির অহিংসাব্রতের মূল লক্ষ্য ইহাই। তিনি বলিলেন, ভ্রমবশতঃই মানুষ হিংসা করে। হিংসা ঘৃণা, অহিংসা ভালবাসা। হিংসা পশুর ধর্ম, অহিংসা মানুষের ধর্ম। যিশুখ্রীষ্টও অনুরূপ কথা বলিয়াছেন। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়াও তিনি তরবারি ব্যবহারকারী জনৈক শিষ্যকে উপদেশ দিয়াছেন—**all that take the sword shall perish with the sword.** হিংসা শুধু ধ্বংসই আনে। হাতিয়ারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষটিরও বিলোপ ঘটে।

অহিংসার প্রকৃত তাৎপর্য এবং ইহার দূরপ্রসারী কল্যাণ শক্তি সম্পর্কে গান্ধীজির বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। অহিংসার সাধনায় তাঁহার গভীর নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা বিশ্ববাসী বিমুগ্ধ বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। অহিংসার পথে তিনি পূর্ণতা লাভের দাবি করেন নাই। তাঁহার সাধনাকে তিনি টুটা ফুটা বা ভাঙ্গাচোরা অহিংসা বলিয়াছেন। মহাপ্রয়াণের অব্যবহিত পূর্বে দিল্লীর প্রার্থনা সভায় তিনি বার বার বলিয়াছেন আমি ও আমার সঙ্গের অন্যান্য লোকেরা যাহাকে অহিংসা বলিয়াছি তাহা খাঁটি অহিংসা নয়, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের নামে অহিংসার ক্ষীণ অনুকরণ মাত্র। - কল্যাণময় যাহা তাহার অল্পও মহৎ ভয় দূর করে। অন্য প্রসঙ্গে হইলেও গীতা বলেন—স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।

গান্ধীজিও অনুরূপ কথাই বলিতেন। ফজলুল হক সাহেব একদা গান্ধীজির নিকট মুসলিম লীগের গুণ্ডাবাজির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। গান্ধীজি তাঁহাকে অহিংস অসহযোগের পথে প্রতিকারে ব্রতী হইতে উপদেশ দেন। এই পথে যে গুণ্ডাবাজি বন্ধ হয় তাহাতে মহাত্মাজির পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। পরন্তু তিনি হক সাহেবকে বলেন, অহিংস-অসহযোগ ব্যবহারের ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও ব্রিটিশ শক্তির সশস্ত্র বাধার মোকাবিলা করিয়া ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে আনিয়া দিয়াছে।

গান্ধী-প্রবর্তিত ও আচরিত অহিংসা কেবল ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দান করিয়াই নিঃশেষিত হইয়া যায় নাই। এশিয়া আফ্রিকার বহু

পরাধীন দেশ যে বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা লাভ করিয়া মানব-ইতিহাসে একটি নবীন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে তাহার মূলেও গান্ধীজির এই অহিংসা সাধনা যে সর্বাধিক ক্রিয়াশীল তাহা অস্বীকার করা যায় না।

সকল মানুষের পক্ষে নূতনতর এই বৈপ্লবিক নীতিকে যথার্থ মর্যাদা ও স্বীকৃতি দান করা এখনও সম্ভবপর হয় নাই। উকিলি বুদ্ধি দিয়া ইহার অনেক ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যা করা যায় কিন্তু তাহার দ্বারা সত্য ম্লান হয় না।

ত্রিশ বৎসরকাল সক্রিয় অহিংসা সাধনার পর স্বাধীনতার প্রাক্‌কালে ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে হিংসার দাবানল স্বাধীনতা সংগ্রামে অহিংসার অবদানকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। মানব চিত্তে সংশয়ের সঞ্চার হইয়াছে। ভারতবর্ষের সেই ইতিহাস এক মহা দুঃস্বপ্নের কলঙ্কময় অধ্যায়। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের পক্ষপুটে মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীলতা ধীরে ধীরে তীব্র ও তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরেজ তাহাকে নিজের বশে রাখিতে যখনই অসুবিধা বোধ করিয়াছে তখনই হিন্দুর উপর লেলাইয়া দিয়াছে। তাহারা হিন্দুদের ক্ষতবিক্ষত করিতেছে এই দৃশ্য শাসক ইংরেজের চিত্তে খুসির ঝড় ও আনন্দের তুফান তুলিত।

কলিকাতার কুখ্যাত ডাইরেকট্ অ্যাকশান পর্যন্ত ইহা শহরের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। প্রকৃতপ্রস্তাবে ভারতবর্ষের সাতলক্ষ গ্রামের কোটি কোটি মানুষের শান্তি ও সম্প্রীতি, শুভেচ্ছা ও নির্ভরতা ইহার দ্বারা কোন দিন বিঘ্নিত হয় নাই। কিন্তু ১৯৪৬-এ কলিকাতা মহানগরীর বুকে সরকারী হিসাবে ৫ হাজার মানুষ হত্যা ও পনের হাজার জখম করিয়াও সাম্প্রদায়িকতার ফ্রাঙ্কষ্টাইনের পৈশাচিক প্রবৃত্তি সংযত হইল না। ভারতবর্ষের গ্রামের পর্ণ কুটির প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, নোয়াখালির গ্রামে গ্রামে হাজার হাজার বছরের শান্তি ও সম্প্রীতি এবং পারস্পরিক বিশ্বাসের সমাধি রচনায় ঘাতকেরা হাত লাগাইল। এই আগুন ও মানুষের সেই পৈশাচিকতা নোয়াখালির গ্রামে সীমাবদ্ধ থাকে নাই। ক্রমে ভারতবর্ষের দিকে দিকে বিহার, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যে প্রসারলাভ

করিল। ইংরেজ ধরা পড়িয়া গেল। তাহার আত্মরক্ষার আর কোন উপায় রহিল না। অপসৃত হইবার পূর্বে সে ভারতবর্ষ হইতে পলায়ন করিয়া বাঁচিবার চেষ্টা করিল। ইংরেজ পাকিস্তান সৃষ্টি করিয়া তাহার অপকর্মের তিক্ত বহিরঙ্গে মিষ্ট প্রলেপ দিল। ভারত-পাকিস্তানের কোটি কোটি মানুষ গত একুশ বৎসর যাবৎ সেই হিংস্রতা ও শঠতার খেসারৎ দিতেছে। হিংসা বিদ্বেষের ফল যে কাহারো পক্ষেই ভাল হয় না ভারত পাকিস্তানের বর্তমান দুঃখকর বেদনাময় অবস্থাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কয়েকজন ক্ষমতালোভী মানুষ ছাড়া ভারত-পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের কেহই আজ সুখী নন। আমাদের এই আহত বিবেকের প্রথম বিকৃত ও অভিশপ্ত প্রকাশ ঘটে গান্ধী-হত্যার অমানুষিক ঘটনার মধ্যে। গান্ধীজিকে হত্যা করিয়া অহিংসার গতি স্তব্ধ করা যায় নাই।

এত হিংস্রতা সত্ত্বেও বিনোবাজি বলিয়াছেন, অহিংসা জয়যুক্ত হইতেছে। ভূদানযজ্ঞ পত্রিকায় তাঁহার কথামৃতের যে অনুবাদ প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে পাই: "অহিংসার কাছে ইহা (হিংসার প্রসার) কোন বড় সমস্যা নয়।...সাদার উপর দাগ শীঘ্র নজরে পড়ে। মানুষ স্বভাবতঃ অহিংস। তাই সামান্য মাত্র বিরোধী কিছু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকের নজরে পড়ে। অল্প হইলেও অধিক মনে হয়...। হিংসার প্রাদুর্ভাব দেখা গেলেও অহিংসার প্রভাব ঠিকই আছে।...ভাল কাজ হঠাৎ নজরে পড়ে না"। বিনোবাজি এই প্রসঙ্গে আরও যাহা বলিয়াছেন তাহা আমি এইরূপ বুঝিয়াছি: কোটি কোটিতে একটি মা সন্তানকে হত্যা করেন। কোটি কোটি মায়ের সন্তান-স্নেহ আমাদের চিত্তকে তেমন উদ্রিক্ত করে না যেমন করে একটি মায়ের সন্তান-দ্রোহ। অহিংসা স্বাভাবিক বলিয়া তাহা নীরবে নিঃশব্দে তাহার কাজ করিয়া যাইতেছে এবং হিংসা অস্বাভাবিক বলিয়া তাহার প্রকাশমাত্র আমরা বিচলিত হই। হিংসা মানুষের প্রকৃতিবিরুদ্ধ বলিয়াই এই রকম হয়। তথাপি আমাদের শান্তচিত্তে ভাবিয়া দেখা দরকার মানুষ যে সুন্দর ও শান্তিময় বিশ্বের স্বপ্ন দেখে তাহা হিংসা বা অহিংসা কোন পথে আমরা

পাইব এবং পাইলে সুরক্ষিত রাখিতে পারিব? কলিকাতা—নোয়াখালি—বিহারের ঘটনা যত নিদারুণ শোকাবহই হোক না কেন তাহা মানব-ইতিহাসের সামান্য একটা দুর্ঘটনা মাত্র। বিনোবাজিও এই কথা বলিয়াছেন। দুঃস্বপ্নের এই অন্ধকার মুহূর্তগুলিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করা মানবধর্মানুগ আচরণ হইতে পারে না।

বিংশ শতাব্দীর উন্নততর বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার সমৃদ্ধি সত্ত্বেও বহুবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগের নিকট আমরা এখনও একান্ত অসহায়। এই তো সেদিন, কত সন্তর্পণে ও শ্রমে গড়া জলপাইগুড়ি চোখেরপলকে একপ্রকার ভাসিয়া গেল। জলপাইগুড়ির এই বানভাসি সত্য, কিন্তু তাহার পরেও আর এক পরম সত্য আছে। তাহা হইল: মানুষ এই বন্যাকে, এই ধ্বংসকে শেষ কথা বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না। বহুযুগের চেষ্টা ব্যর্থ হইল বলিয়া সে গড়ার কাজ ছাড়িয়া জঙ্গলের বন্য-জীবনযাত্রায় প্রত্যাবর্তন করিবে না। কালরাত্রির মধ্যেই মানুষ ধ্বংসের শ্মশানেই নূতন সৃষ্টির মহাযজ্ঞ সুরু করে। হিংসা অহিংসার ব্যাপারেও এই কথা সত্য। সুতরাং কোথায়ও হিংসার বীভৎস প্রকাশ দেখিয়াই অহিংস সমাজ ও রাষ্ট্র, চিন্তা ও কর্ম পরিত্যাগ করিতে পারি না। পরন্তু বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও অহিংসার মার্গে স্থিতিশীল থাকিবার সাধনা সর্ব প্রযত্নে অব্যাহত রাখিতে হইবে। ইহার পশ্চাদগতি সম্ভব নহে। তাই তীব্রতম দুঃখ এবং তীক্ষ্ণতম আঘাত পাইলেও মানুষ আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, সামনে চলে।

ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ সম্পাদিত মহাত্মা গান্ধী শতবার্ষিকী গ্রন্থে সীমান্ত গান্ধী (খান আবদুল গফুর খান) Recollections শীর্ষক একটি চমৎকার লেখায় গান্ধীজির অহিংসা প্রসঙ্গটির মনোজ্ঞ আলোচনা করিয়াছেন। উত্তর পশ্চিম সীমান্তের পাঠানগণ অতিশয় দুর্ধর্ষ। পান হইতে চুন খসিলেই তাহারা মারামারি কাটাকাটি করিতে প্রবৃত্ত হইতে অভ্যস্ত ছিলেন। বলপ্রয়োগে পরাভূত করা ভিন্ন বিরোধ মীমাংসার

দ্বিতীয় কোন পন্থা তাঁহারা স্বীকার করিতেন না। ইহাদের মোকাবিলা করিতে ইংরেজরা একই পদ্ধতি অনুসরণ করে। সামান্য কারণেই ইংরেজরা অমানুষিক নৃশংস অত্যাচার করিত। সে অত্যাচার এতই নির্মম ও তীব্র ছিল যে, বহু বীর পাঠান তাহার আঘাতে ভীরু হইয়া পড়েন। পাঠানেরা জেল ও ইংরেজ সেপাইয়ের অত্যাচারে এত ভীত ও সন্ত্রস্ত হন যে, তাঁহারা সেপাইদের সঙ্গে কথা বলিতেও সাহসী হইতেন না, অনেক সময় পলাইয়া পলাইয়া বেড়াইতেন। পরে সীমান্ত গান্ধীর নেতৃত্বে এই বীর জাতি অহিংসার সাধনা সুরু করেন। তখন দেখা গেল ভীরুতা উবিয়া গিয়াছে। যাঁহারা স্বভাবভীরু তাঁহারাও যেন এই অহিংসার মন্ত্রে বীরে পরিণত হইলেন। এখন আর লুকোচুরি নয়। সকলেই হাসিমুখে জেলে যাইতেছেন, ভয় করেন না কাউকে।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বে ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে হিংসার প্রাবল্য ঘটে। কিন্তু উত্তর পশ্চিমসীমান্ত প্রদেশে এই পাপ স্পর্শ করে নাই। অথচ সাধারণবুদ্ধিগ্রাহ্য বিচারে সেই এলাকাটা ঐ সময়ে হিংসার প্রকাশের পক্ষে বিশেষ অনুকূল স্থান ছিল। সীমান্ত গান্ধী এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া উক্ত প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—অহিংসা সাধনা বীরের সাধনা, (ইহা গান্ধীজিও বারবার বলিয়াছেন) ভীরু মানুষের নয়। পাঠানেরা প্রকৃতই বীর বলিয়া তাঁহারা অহিংস থাকিতে সক্ষম হন, সেখানে কোন দাঙ্গা হাঙ্গামা হয় নাই।

দূর অতীতের অন্ধকারময় দিনে দুজন অপরিচিত মানুষে সাক্ষাৎ ঘটিলে জন্তুজানোয়ারের মত লড়াই সুরু হইয়া যাইত না কি? অন্ধকার গুহাবাসী মানুষের সেই কলঙ্ক কাহিনী আজিকার সুসভ্য মানবসন্তানেরা বিশ্বাস করিতে ইতস্ততঃ করিবেন। কিন্তু মানব-চরিত্রের মূলে লক্ষ্য করিলে আমরা বোধ হয় ভিন্নতর কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি না। অনেক সমাজবিজ্ঞানী অবশ্য বলেন, আদিম মানুষ অপেক্ষা বর্তমান মানুষ হিংস্রতর। আর একদল বলেন: হিংসা হইল মানুষের সহজ প্রবৃত্তি। আঘাত করিলেই প্রত্যাঘাত করিবার বাসনা হৃদয়ে জাগ্রত হয়।

আদিম যুগের নরনারীরা আত্মরক্ষার জন্য একমাত্র তাহার দেহশক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল। দেহবলে মানুষ পশুরাজ্যে হীনবল। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি তাহাকে প্রস্তরখণ্ড তুলিয়া ছুড়িয়া মারিবার কৌশল আয়ত্ত করিতে শিখাইল। যে মুহূর্তে তাহার এই বিদ্যা বা কৌশল আয়ত্ত হইল তখন হইতে মানুষ দেহবলের নূন্যতা সত্ত্বেও পশুরাজ্যের উপর প্রভুত্বের অধিকারী হইল। এই অধিকার ক্রমে প্রসারিত হইয়া পশুরাজ্য অতিক্রম করিয়া মানবসমাজে প্রবেশ করিয়াছে।

আঘাত প্রত্যাঘাত আনিয়া দিবেই। ক্রমপ্রসারমান মানব-অধিকার মানুষকে যে বস্তুগত সঞ্চয়ের অধিকার দিল সেখানেই সব চাওয়া এবং সকল পাওয়ার শেষ হইল না। জৈব প্রয়োজনের উর্ধ্বে যে জীবন যাহাকে প্রাজ্ঞ পুরুষেরা বলিয়াছেন 'মননেন জীবিত'—মানুষের পক্ষে সেই জীবনের আহ্বান বেশিদিন উপেক্ষা করিয়া থাকা সম্ভব হইল না। শতসহস্র অভাব এবং অসুবিধার মধ্যেও মানুষ ফলের প্রয়োজন ভুলিয়া ফুলের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া রহিল, ভালবাসিয়া জয় করিতে চাহিল, নিজে স্বেচ্ছায় কষ্ট ভোগ করিয়া অপরকে শোধরাইবার চেষ্টা করিল। সভ্যতার সেই ঊষাকালেই অহিংসার পথে মানুষের প্রথম সচেতন পদসঞ্চার ঠিক যে কবে তা বোধ হয় জানা যাইবে না। তৎসত্ত্বেও এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় যে, দূর অতীতের সেই যাত্রালগ্ন হইতেই হিংসা মানব-জীবন-বৃত্ত হইতে ক্রমাগত দূরান্তরে অপসারিত হইতেছে।

আত্মপর স্বজন পরিজন সকলের সহিত মিশিয়া আমরা বাস করিতেছি। পরের দুঃখ কষ্ট দূর আমরা করিতে কোন না কোন সময়ে সকলেই আগাইয়া আসি। মানুষ স্বভাবতই অহিংস বলিয়া ইহা সম্ভবপর হয়। কিন্তু লোভ ও লালসা এই স্বাভাবিক আচরণের মধ্যে কখন কখন বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া থাকে। তাই মানবকল্যাণকামী হিতব্রতী মানুষ মধ্যে মধ্যে মানব-সমাজকে হিংস্রতা পরিহার করিয়া অহিংসার সার্বিক সাধনার কথা শুনাইয়া থাকেন। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে

বর্তমান যুগের অহিংস সাধক মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষের পুণ্যভূমিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

অহিংসা সাধন ও সত্যাগ্রহ প্রবর্তনের মধ্যেই গান্ধীজির শ্রেষ্ঠত্ব—একথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। গান্ধী-অনুরাগীজনেরা যুক্তিযুক্ত ভাবেই বিশ্বাস করেন এই পৃথিবীতে মানুষকে পূর্ণ অহিংসাব্রতী হইতে হইবেই ; অথবা নিশ্চিহ্ন হইবার ঝুঁকি লইতে হইবে। গান্ধীজি যখন অহিংসা ব্রত লইয়া আর্বিভূত হন তখন আমরা ভয়াবহ আণবিক বোমার কথা কিছু মাত্র জানি না। গ্যাসচেম্বার, বীজাণু বোমা, আগুনে বোমাও তেমন জ্ঞাত ছিল না। গোটা পৃথিবীটা সমূলে ধ্বংস করিতে যে পরিমাণ আণবিক বোমার প্রয়োজন তদপেক্ষা বহু বেশী বোমা বিভিন্ন শক্তিশিবিরে এখনই মজুদ আছে। কেহ না কেহ প্রয়োজন অনুভব করিয়াছেন বলিয়াই এগুলি প্রস্তুত হইয়াছে। ঐগুলি যাঁহারা ব্যবহার করিতে চান তাঁহারা পৃথিবীর ধ্বংস হইবে জানিয়াই তাহা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। হিংসার ইহাই একমাত্র পরিণতি। সে নিজে মরে এবং সকলকেই মারে। কিন্তু আসলে ইহারা নিজেরা মরিতে চান না। বাঁচিবার জন্য ইহাদের এই এক অসম্ভব অথচ মারাত্মক উদ্যোগ। কিন্তু ঐ পথে যে বাঁচা যায় না সে বুদ্ধিটুকু তাহাদের নাই। কথাটা শুনিতে অবাক লাগে। বুদ্ধিহীন বলিলে সুবিচার হইল না। ইহারা সকলেই বুদ্ধিমান, কিন্তু ভ্রান্ত ভীরু বিশ্বাসহীন ও লোভী। দীর্ঘ দিনের আচরিত অভ্যাসের শৃঙ্খল হইতে ইহারা নিজেদের মুক্ত করিতে পারিতেছেন না। শান্ত হইয়া ভাবিয়া দেখুন তো রাশিয়া বা আমেরিকা যদি আণবিক বোমা ছোড়াছুড়ি আরম্ভ করে তবে কি অবস্থা হয়! এখন যে আগে বোমাটা মারিবে এবং যতখানি ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতার সঙ্গে মারিতে পারিবে তাহার উপর কিছু সুবিধা নির্ভর করিবে—অতএব নিশিদিন নিদ্রাহীন শঙ্কিত সতর্কতার মধ্যে কালকাটানো ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। এই পথ বাঁচার পথ নয়, পাগল হইবার পথ, মৃত্যুর পথ। বর্তমান সময়ের মত দুঃসময় ইতিহাসে ইতিপূর্বে কখন দেখা দেয় নাই।

আজ হয় অহিংসা নহিলে সমূলে সবংশে বিনাশ ইহার কোন বিকল্প নাই।

অধিকাংশ মানুষ (নেতা ও সাধারণ) স্বীকার করেন অহিংসা ভাল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথা বলেন ইহা অবাস্তব এবং বর্তমানের সমস্যা সমাধানের অনুপযোগী। অনেকে ইহাও বলেন—আমার অহিংসা-বিলাসের সুযোগ লইয়া অপরে আমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। গান্ধীজির জীবদ্দশায় এ সকল প্রশ্ন উঠিয়াছিল। তিনি ইহার বিস্তারিত ও অপূর্ব সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন। সে সকলের পুনরাবৃত্তি করিব না। এই মাত্র এখানে বলিলে চলিবে যে, আমাদের ভীরুতা আমাদিগকে অস্ত্রের উপর নির্ভর করিতে শিখাইয়াছে।

দাঙ্গার সময় মানুষ পশুর অপেক্ষা অধম ও পিশাচ হয়। তথাপি দেখা যায় সেই নারকীয় অবস্থার মধ্যে মানুষকে রক্ষা করিতে মানুষই আপন প্রাণ বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। দুঃখীজনের দুঃখ দূর করা, শরণাগতকে রক্ষা করা আমরা মানবিক কর্তব্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছি। ইহা হিতবাদী মানুষের কথা। হিতবাদী মানুষ নিজের জীবন বিপন্ন না করিয়া যতটুকু সম্ভব ততটুকু করেন। তার বেশী পারেন না। কিন্তু অহিংস-সাধক নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়াও অন্যের মঙ্গল সাধন করেন। ভগবৎ বিশ্বাসের ফলে অহিংসাব্রতীর এই প্রত্যয় জন্মে এবং প্রার্থনার দ্বারা তাহার বিশ্বাস দৃঢ় হয়। দু চারিজন ভগবদ-বিশ্বাসীর আত্মাহুতির পর বহু স্থানে দাঙ্গা বন্ধ হইতে দেখা গিয়াছে। আত্মদানকারী সকলেই নিশ্চয় অহিংসায় বিশ্বাসবান ছিলেন না। গান্ধীজি বলিয়াছেন —অহিংসা এই পথে কাজ করে। ঐ পথে শুভ শক্তি উদ্দীপ্ত হইয়া অশুভ শক্তিকে একান্তে ঠেলিয়া দেয়। ফলে, সমগ্র সমাজের শুভ শক্তি জাগ্রত হইয়া নিপীড়িত জনতাকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

অহিংসা আলোচনার শেষ হয় না। ইচ্ছা করিলেই সপক্ষে ও বিপক্ষে বিস্তর যুক্তিতর্ক উত্থাপন করা যায়। কিন্তু বুদ্ধির বিচারকে

যদি আমরা হৃদয়ের বিচারের নিম্নে স্থান দেই তাহা হইলে সকলেই সহজেই বুঝিব—অহিংসা ভিন্ন পথ নাই।

মানুষ কি ইচ্ছা করিলেই অহিংসব্রতী হইতে পারে? সর্ব ক্ষেত্রের মত এখানেও প্রস্তুতির প্রয়োজন রহিয়াছে। প্রবন্ধের প্রারম্ভে সে সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করা হইয়াছে। এই কর্মে প্রবৃত্ত হইবার জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন সংযমের। ব্রহ্মচর্যের কথাটা ইচ্ছা করিয়াই বলিলাম না। ইহাকে চরিত্র-গঠনের আবশ্যিক অঙ্গ বলিয়া গান্ধীজি নির্দেশ করিতেন। গান্ধীজি বলিয়াছেন, নিম্নতম মানুষের যাহা নাই তাহা যদি কেহ পাইবার প্রত্যাশা করেন, তবে তিনি আর অহিংসার সাধনা করিতে পারিবেন না। এখানেও গান্ধীবাদ সাম্যবাদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অহিংস সাধকের একদিকে সত্য এবং অপরদিকে অহিংসা যদি থাকে তাহা হইলে ভ্রম প্রমাদ ঘটিবেই না। ইহা গান্ধীজির আশ্বাস। আমরা বিশ্বাস করি এই আশ্বাসের মধ্যে পৃথিবীর মানুষের জীবন-কাঠি রহিয়াছে। আমাদের তাহা খুঁজিয়া পাইতেই হইবে। গান্ধীজি যেমন কালমাত্র বিলম্ব না করিয়া তাঁহার সান্নিধ্যে যাঁহারা থাকিতেন তাঁহাদের লইয়াই ছোট বড় সর্বপ্রকার কাজের সূত্রপাত করিতেন, তেমনি আসুন আমরা আমাদের ক্ষুদ্র সামর্থ্যে ক্ষুদ্রতর গণ্ডীর মধ্যে ক্রিয়াশীল হই। এই পথে একদিন অহিংস ও সত্যাশ্রয়ী বিশ্বলোকের উদয় হইবে। ভারতবর্ষে গান্ধীজির আবির্ভাব মানব-ইতিহাসে অক্ষয় হইয়া থাকিবে। টেণ্ডুলকারের গান্ধী জীবনী গ্রন্থমালা 'মহাত্মা'-র ভূমিকায় পণ্ডিত জওহরলাল লিখিয়াছেন—

His (Gandhiji's) voice may not be heard by many in the tumult and shouting of today, but it will have to be heard and understood some time or other, if this world is to survive in any civilized form.

সভ্য পৃথিবীর সংরক্ষণের জন্য গান্ধীপথ অপরিহার্য। তাই আজ হোক কাল হোক গান্ধীজির শরণ লইতেই হইবে। কিন্তু কেন? জীবনের সর্বক্ষেত্রে সত্য ও অহিংসা মন্ত্রের প্রসার প্রথম প্রয়োগের সুদুর্লভ সম্মান যে গান্ধীজির তাহা একদিন বিশ্ব মানব ইতিহাসে স্বীকৃতি লাভ করিবেই। গান্ধী শতাব্দীতে সেই অবশ্য প্রায়োজনীয় স্মরণ মনন শুরু হোক এই প্রার্থনা করি।

সত্যাগ্রহ

গান্ধী মহাজীবনের প্রকৃষ্টতম শিক্ষা কি এক কথায় বল? এই রকম কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে আমি নির্দ্ধিধায় বলিব 'সত্যাগ্রহ' ও 'অহিংসা'। অহিংসা-সত্য-অস্তেয়ের বাণী পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ হইতে ইতিপূর্বে উত্থিত হইয়া দেশ দেশান্তরে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক কালের ভগবান বুদ্ধদেব, স্মরণকালের শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রভৃতি ভুবনবিখ্যাত নামগুলি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে। কিন্তু গান্ধীজির পূর্বে সমষ্টি জীবনে এমন ব্যাপকভাবে সত্য অহিংসা বা সত্যাগ্রহের প্রয়োগ হইয়াছে এমন কোন ঘটনার কথা জানা যায় না। সত্যের প্রতি অবিচলিত নির্ভরতা হইতে সত্যাগ্রহের উদ্ভব। গান্ধী জীবন সত্যের জ্যোতির্ময় আলোকে উদ্ভাসিত। যে সত্যাগ্রহকে আমরা এখন জানি তাহা গান্ধীজির একান্ত নিজস্ব অবদান।

আজকাল একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী গান্ধী-ভাষ্যকার বলিতেছেন সত্যাগ্রহ প্রথম প্রবর্তনের গৌরব গান্ধীজির নহে। প্রখ্যাত গঠনকর্মী ও ভূদান নেতা শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী এই কথা শুনিয়া গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন একমাত্র জৈন ধর্মগ্রন্থে সত্যাগ্রহ বিষয়ে কিছু কথা আছে। কিন্তু গান্ধীজির পূর্বে পৃথিবীতে আর কেহ সজ্ঞানে সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য ইহা প্রয়োগ করেন

নাই। তত্ত্ব হিসাবে সত্যাগ্রহ নূতন কিছু নহে একথা ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্যারেলালজির Mahatma Gandhi—The Last Phase গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন। পতঞ্জলির রচনায় তিনি ইহার সংজ্ঞা পাইয়াছেন। তথাপি তিনি ঐ ভূমিকায় শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারীর ন্যায় লিখিয়াছেন—গান্ধীজি ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যা নিরসনের জন্য সত্যাগ্রহের প্রয়োগ করেন। যুগের উপযোগী করিয়া প্রয়োগ কৌশল উদ্ভাবন করেন এবং এই পদ্ধতিতে স্বীয় জীবনযাপন করিয়াছেন, সাধারণ মানুষকে তাহা শিক্ষা দিয়াছেন। তত্ত্ব নয়, তাহার প্রয়োগ বিচার করিতে হইবে। কারণ বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ ভিন্ন তত্ত্বের কোন মূল্য নাই। হেনরি ডেভিড থোরোর কথাও আলোচনা প্রসঙ্গে উঠিয়াছিল। থোরোর Civil Disobedience প্রবন্ধটি দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু করিবার পর মহাত্মা গান্ধীর গোচরে আসে। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা যাইবে।

নারদের নাকি বাহন ছিল ঢেঁকি। চন্দ্রলোক বা গ্রহান্তরে পাড়ি দিবার যান রকেটের যে ছবি আমরা পত্র-পত্রিকায় দেখি তাহার সহিত ঢেঁকির কিঞ্চিৎ আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। আকারের সামান্য সাদৃশ্য হেতু যদি আমরা বলি প্রাচীন ভারতবাসীর রকেট নির্মাণের জ্ঞান ছিল এবং বর্তমান বিশ্বের বিজ্ঞানী ও যন্ত্রকুশলীদের ইহা আবিষ্কারের গৌরবে ভূষিত করা যায় না—তাহা হইলে যতটুকু সত্য বা মিথ্যা বলা হয় গান্ধীজি সত্যাগ্রহের প্রবর্তক নন বলিলে ঠিক ততটুকুই সত্য-মিথ্যা বলা হয়।

সত্যাগ্রহের আবির্ভাবের বিষয়ে 'আত্মজীবনী'তে গান্ধীজি লিখিয়াছেন, "সত্যাগ্রহ শব্দের উৎপত্তি হইবার পূর্বেই সত্যাগ্রহ রূপলাভ করিয়াছিল। সত্যাগ্রহের প্রবর্তনের সময় এ জিনিষটা সত্যসত্যই যে কি তাহার পরিচয় আমি পাই নাই।" সাধারণতঃ দেখা যায়, কোন একজন মনীষী তত্ত্ব (theory) প্রচার করেন, পরে তাহা হয়তো কার্যে রূপান্তরিত হয়। যেমন মার্কসের তত্ত্ব লেনিনের কার্যে রূপ লাভ করিয়াছে। হিটলারের কর্মধারার মধ্যে নীটশেকে দেখিতে পাই। আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া

যায়। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী এক বিচিত্র ব্যতিক্রম। তাঁহার কাজ এমনই স্বকীয় বিশিষ্টতামণ্ডিত এবং কল্যাণকর যে তাহা ধীরে ধীরে তত্ত্বের আধারে ধরা হইয়াছে। পৃথিবীতে এমন দ্বিতীয় কোন নজীর আছে বলিয়া জানি না।

দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রেরিত চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিকের—শ্রমিক হিসাবে স্বার্থ এবং মানুষ হিসাবে মর্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া গান্ধীজি তথাকার ব্রিটিশ শাসন কর্তৃপক্ষের সহিত এক অতীব অসম সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া পড়েন। বিদেশীর সাম্রাজ্য-স্বার্থ ও শেতাঙ্গ-বণিক স্বার্থ সম্মিলিতভাবে ভারতবাসী ও ভারতের চুক্তিবদ্ধ দরিদ্র শ্রমিকের স্বার্থ-পরিপন্থী কর্ম করিতে থাকে। এই ব্যবহারের দুঃসহতা এবং রূঢ়তা একদা এমন নগ্ন ও তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল যে ভারতের ইংরেজ বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ পর্যন্ত প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গান্ধীজির নিকট এই সংগ্রাম কেবলমাত্র ভারতীয়দের দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাস ও সহজে জীবিকার্জনের অধিকার পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম ছিল না। তাঁহার নিকট ইহা মানুষের পূর্ণ মর্যাদা ফিরিয়া পাইবার সংগ্রাম-রূপেই প্রতিভাত হইয়াছিল। জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্র কেবলমাত্র বর্ণের কৃষ্ণত্বের জন্য যেন সংকুচিত না হয়; এবং নিরাপত্তা ও মানবিক মর্যাদা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তাহার জন্যই গান্ধীজি এই দুঃসাহসী ও অভূতপূর্ব সংগ্রামে ব্রতী হন। সত্যকার ক্ষমতাশালী ও হৃদয়বান কোন মানুষের পক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার তদানীন্তন অবস্থায় নীরব থাকা সম্ভবপর ছিল না। তাই বস্তুতঃ সমগ্র প্রবাসী ভারতীয়-সমাজ গান্ধীজির পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ভারতবাসীগণ যতই সংহত ও সুগঠিত হোন না কেন দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষের অকৃত্রিম প্রীতি ছাড়া তাহাদের জীবনে শান্তি সমৃদ্ধি এবং নিরাপত্তাবিধান করিবার অন্য কোন প্রশস্ত উপায় ছিল না; মর্যাদার তো নয়ই। ইহা বিবেচনা করিয়া মহাত্মা গান্ধী প্রতিকারের যে কর্মপন্থা প্রবর্তন করেন তাহাই পরবর্তীকালে সত্যাগ্রহ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

উন্নততর অস্ত্রের প্রয়োগ বা অধিকতর বলের প্রভাবে প্রতিপক্ষকে বিধ্বস্ত করা যাইতে পারে, সাময়িকভাবে তাহাকে পরাভূত করাও যায় ; কিন্তু এই পথে প্রীতি বা শ্রদ্ধা কিছুতেই অর্জন করা যায় না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরাভূত দেবতা জার্মানী প্রথম সুযোগেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই জার্মানীকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া পৃথিবীর ভাগ্যবিধাতারা এখনও শঙ্কায় কালাতিপাত করিতেছেন। জার্মানী যাহাতে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে না পারে তাহার জন্য কত চেষ্টাই না চলিতেছে। এমন কি বার্লিন শহরটার মাঝ বরাবর একটা পাচিল তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা নাকি সভ্যতার স্বর্ণ শিখরের কাছাকাছি পৌঁছাইয়াছি! শান্তির সময় মানুষের প্রতি এই রকম জঘন্য অমর্যাদা বিশ শতকের পূর্বে ঘটে নাই। দক্ষিণ আফ্রিকায় আন্দোলনে নামিবার পূর্বেই গান্ধীজি হিংসাশ্রয়ী শক্তির এই অসম্পূর্ণতা বা ব্যর্থতা অনুভব করিতে সমর্থ হন। তাই তিনি ঘোষণা করিলেন ঃ নিজের আচার আচরণ ও ভালবাসার দ্বারা প্রতিপক্ষের হৃদয়ের পরিবর্তন করিয়া সত্য যাহা, ন্যায় অনুমোদিত যাহা, এবং যাহা মানুষের ধর্ম সমর্থন করে তাহাই পালন করিতে হইবে, প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, প্রয়োজন হইলে একলাই করিতে হইবে ইহা হইল সত্যাগ্রহ।

সত্যাগ্রহ মহাব্রত উদ্‌যাপনের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার পরিবেশ কোন বিচারেই অনুকূল ছিল না। তথাপি ঘটনাচক্রে গান্ধীজিকে জন্মভূমি হইতে দূরে অপরিচিত পরিবেশে অতর্কিতে এই সংগ্রাম সুরু করিতে হয়। শ্রীভগবানের করুণায় তাঁহার ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও নিপুণতায় তিনি সাফল্য লাভ করেন। সেদিন গান্ধীজির প্রতিপক্ষের প্রধান ছিলেন জেনারেল স্মাটস্। ইনি পরে রাজনীতিবিদ ও সমর-নায়ক হিসাবে প্রভূত খ্যাতির অধিকারী হন। এই ব্যক্তি গান্ধীজির সত্তরতম জন্মদিনের স্মারকগ্রন্থে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া অকপট শ্রদ্ধার্ঘ্য জ্ঞাপন করেন। প্রতিপক্ষকে অকপটে এমন শ্রদ্ধা ইতিপূর্বে কেহ জানাইয়াছেন বলিয়া জানি না। গান্ধীজির আন্দোলনে কেবলমাত্র

জেনারেল স্মাটস্ যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন তাহাই নহে। বিস্তর দেশী বিদেশী মানুষ তাঁহার কর্মে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যোগদান করেন, নানাভাবে সাহায্য করেন। অনেক খ্রীষ্টান পাদ্‌রি গান্ধীজির কর্মের মধ্যে খ্রীষ্টতত্ত্ব জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে মনে করেন এবং তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হন। অন্যান্যেরা মুগ্ধ বিস্ময়ে গান্ধীজির এই নূতনতর অস্ত্রের নিপুণ প্রয়োগ ও তাঁহার অসামান্য সাফল্য সাগ্রহে প্রত্যক্ষ করিতে থাকেন। মানুষের হিংস্রতার নিকট, পাশব বলের নিকট আর অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে না এই চৈতন্য ক্রমশ বিস্তারলাভ করিতেছে। হানাহানিমুক্ত সুন্দরতর বিশ্ব বোধ হয়, আণবিক বোমা ও উন্নততর মারণাস্ত্র সত্ত্বেও, অসম্ভব কথা নহে।

সত্যাগ্রহ নামটির উৎপত্তির একটি ইতিহাস আছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের প্রারম্ভকালে ইহাকে বলা হইত Passive Resistance বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে সেখানে যাহা ঘটিতেছিল তাহার পূর্ণ প্রকাশ কথাটির মধ্যে ছিল না। সুতরাং গান্ধীজি তাঁহার Indian Opinion কাগজের পাঠকদের একটি নাম বাছিয়া দিবার আহ্বান জানাইলেন। ঐ আবেদনের উত্তরে গান্ধীজির আত্মীয় মগনলালজি 'সদাগ্রহ' নামটি পাঠান। তিনি 'সৎ' ও 'আগ্রহ' শব্দ দুইটির সন্ধি করিয়া 'সদাগ্রহ' কথাটি সৃষ্টি করেন। ইহার অন্তর্নিহিত অর্থটি গান্ধীজির বেশ পছন্দ হইল। আরব্ধ কর্মের মর্মকথাটি যেন ইহার মধ্যে সম্যক মূর্ত দেখিতে পাইলেন। গান্ধীজি লিখিয়াছেন, "এই লড়াইয়ের ইতিহাস আমার দক্ষিণ আফ্রিকার জীবনের, বিশেষ করিয়া আমার সত্যের প্রয়োগের ইতিহাস বলা যায়।" মগনলালাজির প্রেরিত শব্দটির সামান্য অদল বদল করিয়া গান্ধীজি গ্রহণ করিলেন। "সদাগ্রহ শব্দটিকে স্পষ্ট করিবার জন্য আমি মধ্যে 'য'-ফলা দিয়া 'সত্যাগ্রহ' এই গুজরাটী শব্দ বানাইলাম।" গুজরাটী "সত্যাগ্রহ" আজ বিশ্বের যাবতীয় ভাষাতেই ব্যবহৃত হইতেছে বলা চলে। ইংরাজি ভাষায় এই ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য গান্ধীজি

প্রথমে Passive Resistance শব্দটি ব্যবহার করিতেন। হেনরি ডেভিড থোরোর প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ Civil Disobedience এর উল্লেখ পূর্বে আমরা পাইয়াছি। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজির ঐতিহাসিক আন্দোলন আরম্ভ হইবার পর তিনি এই রচনাটি পড়েন। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ফলে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজির জেল হয়। সেখানে অবস্থানকালে কারা-গ্রন্থাগার হইতে থোরোর বইখানা প্রথম পান এবং পড়েন।

অনেক সমালোচক বলেন গান্ধীবাদের উৎস যেমন মহামতি টলষ্টয় তেমনি সত্যাগ্রহের কল্পনা গান্ধীজি পান থোরোর প্রবন্ধ হইতে। গান্ধীজি ইহার সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন: "আমি সত্যাগ্রহের পরিকল্পনা থোরোর লেখা হইতে লাভ করিয়াছি এমন কথা বলা ভুল। থোরোর প্রবন্ধ দেখিবার পূর্বেই দক্ষিণ আফ্রিকার কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন অগ্রগতি লাভ করিয়াছিল। ঐ আন্দোলন তখন নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন নামে পরিচিত ছিল। ···থোরোর বিখ্যাত রচনাটি আমার হাতে আসিবার পর তাহার শিরোনামাটি আমি আমার আন্দোলন ইংরেজি পাঠকদের বুঝাইবার জন্য ব্যবহার করিতাম। কিন্তু Civil Disobedience কথাটিও আমার আন্দোলনের প্রকৃত তাৎপর্য প্রকাশ করিতে সক্ষম নহে যখন মনে হইল তখন হইতে আমি Civil Resistance কথাটি ব্যবহার করিতে থাকি।"

উদ্ধৃতিটা একটু দীর্ঘ হইল। কিন্তু গান্ধীজি প্রবর্তিত সত্যাগ্রহ বুঝিতে হইলে এই বাক্য কয়েকটির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

সত্যাগ্রহের যথার্থ পরিচয় কি? শক্ত প্রশ্ন। ধর্ম যুদ্ধ বা প্রেমময় সংগ্রাম? ঠিক বলা হইল বলিয়া মনে হয় না। গান্ধীজির একটি পারিবারিক ঘটনা উল্লেখ করি। ইহা আমাদের উপলব্ধির সহায়ক হইবে। পত্নী কস্তুরবা অসুস্থ। গান্ধীজি নিজেই চিকিৎসা করেন। প্রাকৃতিক চিকিৎসা। অনেকদিন হইল অথচ রোগ নিরাময় হইতেছে না দেখিয়া গান্ধীজি নূতন পদ্ধতি প্রয়োগ করিবেন স্থির

করিলেন। ইহার জন্য রোগীর ডাল এবং নূন আহার ত্যাগ করিতে হয়। পত্নীকে তিনি তদনুরূপ অনুরোধ করিলেন। কস্তুরবা স্বীকৃত হইলেন না। গান্ধীজি নাছোড়বান্দা লোক। তিনি নানাভাবে তাঁহাকে রাজী করাইতে চেষ্টা করিতে যত্নবান হইলেন। কস্তুরবা একসময় বলিয়া ফেলেন "তোমাকে (গান্ধীজিকে) যদি কেহ নূন ও ডাল ত্যাগ করিতে বলে তাহা হইলে তুমিও ছাড়িবে না।" গান্ধীজি যেন এই রকম একটা সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি অবিলম্বে এক বৎসরের জন্য নূন ও ডাল ত্যাগ করিলেন। কস্তুরবার হাজার অনুনয় সত্ত্বেও তিনি সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করেন নাই। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, "ইহাকেই আমি 'সত্যাগ্রহ' বলিয়া পরিচয় দিতে চাই।"

গান্ধীজি বলিয়াছেন, সত্যাগ্রহীরা ঠকিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করেন। কস্তুরবার জন্যই তিনি নিজের আহার নিয়ন্ত্রণ করিলেন। মহাত্মাজির স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নিগ্রহ বরণের ফলে কস্তুরবার হৃদয়ের অনাগ্রহ নিমেষে বিদূরিত হইয়া শ্রদ্ধাপ্রীতিমণ্ডিত সাগ্রহের উদয় হইল। সত্যাগ্রহের অমোঘ শক্তি এই প্রেমময় সাধনার মধ্যে নিহিত। প্রেমের সামান্য মাত্র প্রকাশের দ্বারা কস্তুরবার দৃঢ়-প্রতিরোধের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। গান্ধীজি তাই বারংবার বলিয়াছেন প্রতিপক্ষকে ঘৃণা করিয়া শত্রু ভাবিয়া সত্যাগ্রহ করা যায় না। প্রতিপক্ষের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা না থাকিলে যথার্থ সত্যাগ্রহ করা যাইবে না। গান্ধীজি টলষ্টয়ের লেখা পড়িয়া ব্যক্তিজীবনের মত সমাজজীবনে এবং অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে প্রেমের অমোঘ প্রভাব সম্পর্কে বিশ্বাসবান হন। সত্যাগ্রহ সংগ্রামের পথ হইল প্রেমের পথ; ইহার হাতিয়ারও আত্মনিগ্রহ। প্রতিপক্ষকে আঘাত করা চলিবে না। তাহার অমঙ্গল কামনা করাও না। যা কিছু দুঃখ বেদনা আঘাত সব কিছু সত্যাগ্রহীকেই বরণ করিতে হইবে অসূয়াশূন্য ও অভিমানহীন চিত্তে। অন্যায় ও অন্যায়কারীর মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান সে সম্পর্কে সত্যাগ্রহীকে সদা জাগ্রত চৈতন্যের অধিকারী হইতে হইবে।

যাহার জন্য আমরা ত্যাগ স্বীকার করিতে বা দুঃখ বরণ করিতে সানন্দে ও সজ্ঞানে প্রস্তুত নই তাহার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করিবার অধিকারও আমাদের নাই। সেই জন্য গান্ধীজি সত্যাগ্রহ ও সত্যাগ্রহী সম্পর্কে কতকগুলি নীতি এবং সর্ত আরোপ করেন। তাহার প্রধান দুইটি হইল : সংযম বা 'Self Discipline'; এবং আত্মসম্বরণ বা 'Self Control'। সত্যাহীকে তাহার কর্মের দ্বারা সাধারণ মানুষের নিকট শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র হইতে হয়। স্বীকৃত সামাজিক সম্মানের অধিকারী না হইলে কার্যকরী সত্যাগ্রহ করা যায় না।

সত্যাগ্রহী কখনই অন্যায় এবং অন্যায়কারীর মধ্যকার পার্থক্য ভুলিবেন না। কারণ সত্যাগ্রহী তো অন্যায় দূর করিতে চান, অন্যায় আচরণকারীকে সংশোধন করিয়া তাহাকে সুস্থ মানুষ করিতে চান। ডাক্তার যেমন রোগের চিকিৎসা করেন—এও ঠিক তেমনি। রোগ ঘৃণার এবং ভয়ের। রোগী নহে। সত্যাগ্রহীর তাই জ্বলন্ত বিশ্বাস থাকার দরকার যে, পৃথিবীতে এমন পতিত কেহ নাই যাহাকে প্রেমের বারিধারার ধৌত করিয়া পূত ও পবিত্র করা যায় না। সত্যাগ্রহী কল্যাণ দ্বারা অকল্যাণকে; ক্রোধকে অক্রোধ দ্বারা অসত্যকে সত্য এবং হিংসাকে অহিংসার সাহায্যে অতিক্রম করিবেন। পৃথিবীকে কলুষমুক্ত করিবার দ্বিতীয় কোন পন্থা নাই। কেমন করিয়া এই রকম মন ও চরিত্রের অধিকারী হওয়া যায় তাহা ভাবিবার বিষয়। গান্ধীজি বলেন :

"যিনি সত্যাগ্রহী হইতে ইচ্ছুক তাহাকে প্রার্থনাশীল চিত্তে সতত আত্মানুসন্ধান এবং আত্মবিশ্লেষণের দ্বারা জানিতে হইবে যে, ক্রোধ, অসূয়া বা অন্য যে সকল মানবীয় দুর্বলতার বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ (Crusade) করিতে উদ্যত হইয়াছেন সে সকল অপরাধ হইতে তিনি মুক্ত কি না। ঐ বিচার এবং হৃদয়ের নির্মলতার মধ্যেই অর্ধেক বিজয় রহিয়াছে।"

গান্ধীজি প্রায়শ্চিত্তের উপর গুরুত্ব আরোপ করিতেন। Frailty thy name is woman শুধু নয়; মানুষেরও অহরহ পতন

ঘটিতেছে। ইহা অস্বাভাবিক কিছু নহে। কিন্তু পতনের দ্বারা ক্ষতি অপেক্ষাকৃত কম হয় যদি উপলব্ধি মাত্র আমরা স্বেচ্ছায় প্রায়শ্চিত্ত করিতে দ্বিধা না করি। আমরা যাহারা সুন্দর ও আনন্দময় জীবনের প্রত্যাশা রাখি তাহাদেরও জীবনের স্খলন পতন বিষয়ে বিশেষ সচেতন থাকা দরকার। সত্যাগ্রহীর পক্ষে ইহা বিস্মৃত হওয়া চলিবে না।

সত্যাগ্রহী অমিত বীর্যের অধিকারী হইবেন। মানুষ বীর্যবান হইলেই অনন্ত বিশ্বাস তাহার হৃদয়ে সঞ্চার হয়। গান্ধীজি বলিয়াছেন—প্রতিপক্ষ যদি বিশ বারও মিথ্যাচার করিয়া থাকে তথাপি সত্যাগ্রহীর তাহাকে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। মানব প্রকৃতি বা স্বভাবকে বিশ্বাস করিয়া চলা সত্যাগ্রহের অন্যতম মূল সর্ত। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। দিকে দিকে অবিশ্বাসের ও মিথ্যাচারের বিষবাহুল্য থাকা সত্ত্বেও একথা কি আমরা অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করি না যে, সমাজ সভ্যতা সব কিছু পারস্পরিক বিশ্বাসের উপর টিঁকিয়া আছে?

মানুষে প্রতি বিশ্বাসের অভাব ঘটিয়াছে বলিয়া বর্তমান বিশ্বে হিংস্র শক্তির প্রসার ঘটিতেছে। মানুষ উন্মাদের ন্যায় আপনার ধ্বংসের আয়োজনে ব্যাপৃত হইয়াছে। পৃথিবীর রাজনীতিবিদদের স্বীকৃত আচরণ হইল দেশের ও জাতির স্বার্থে প্রয়োজন মত দক্ষতার সহিত মিথ্যাকে সত্য বলিয়া চালানো। এই বিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তিগণ স্বদেশবাসীর সহর্ষ অভিনন্দন পাইয়া থাকেন। অনেক তথাকথিত নীতিবাগীশ ইহাতে কোন অন্যায় দেখেন না! বর্তমান রাশিয়ার নির্মাতা জোসেফ ষ্ট্যালিন বলেন—**Words are one thing actions another. Words are a concealment of bad deeds.** কথা এক কাজ আর। মন্দ কাজের আবরণ হইল কথা। এই ভাবে চলিলে আমরা কোন স্বর্গ রাজ্যে পৌছিব? এ পথে কোন কল্যাণ নাই। একমাত্র বিকল্প পথ সত্যাগ্রহের পথ।

গান্ধীজি আদর্শ সত্যাগ্রহী ছিলেন এ কথা শত্রু মিত্র আত্ম পর

সকলেই স্বীকার করেন। তথাপি একটি উদাহরণ উল্লেখ করিব। ইহার দ্বারা সত্যাগ্রহী গান্ধীর মহত্ব অতি সহজেই প্রকটিত হইবে। দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন ছিল প্রধানত ভারতবাসীর নাম নথীভুক্ত করানোর আইনগত বাধ্যবাধ্যকতার বিরুদ্ধে। এই সত্যাগ্রহ সাফল্য লাভ করে। কিন্তু জেনারেল স্মাট্‌সের সহিত আলোচনা করিয়া গান্ধীজি যে আপোষরফা করেন তাহাতে বহু ভারতীয় ক্ষুব্ধ হন। আলম নামে জনৈক ক্রোধান্ধ ভারতীয় এই ব্যাপারের জন্য মহাত্মাজিকে একদিন বেদম প্রহার করে। তাঁহার দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়; তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন। জ্ঞান লাভ করিবার পরই তিনি তাঁহার আঘাতকারীর খোঁজ করেন এবং তাহাকে মুক্তি দিবার অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, আলম আপনার বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করিয়াছেন। তাহার কৃত কর্মের দ্বারা মানুষের মঙ্গল সাধিত হইবে এই বিশ্বাসে তিনি আমাকে প্রহার করিয়াছেন। কোন মন্দ উদ্দেশ্য তাহার ছিল না।···ইহাই হইল প্রকৃত সত্যাগ্রহীর যথার্থ বিচার।

অনন্যসাধারণ নিষ্ঠা ও একাগ্রতা না থাকিলে সত্যাগ্রহী হওয়া যায় না। গান্ধীজি বলেন দড়ির উপর নৃত্যরত ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর মনোযোগী হইতে হইবে সত্যাগ্রহীকে। বিক্ষিপ্ত চিত্তে কাজ করিলে আর যাই হোক না কেন সত্যাগ্রহ করা যায় না।

সত্যাগ্রহী প্রতিপক্ষকে আত্মসংশোধনের পর্যাপ্ত সুযোগ দিবেন। সত্যাগ্রহ গোপন উদ্দেশ্যকে প্রকটিত করিয়া সত্য উদ্ভাষিত করে। ইহাতে গোপনতা বলিয়া কিছু নাই। প্রতিপক্ষের যুক্তি ও বিচারধারা সত্যাগ্রহীকে সহৃদয়তার সহিত অনুধাবন করিতে হইবে। বিরোধী পক্ষকে তিনি শোধরাইবার সুযোগ দিবেন। যদি তিনি সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে অক্ষম হন তবেই তার কৃত অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য সত্যাগ্রহ আন্দোলন করা যাইতে পারে। সত্যাগ্রহী হইবেন সৎ ও সত্যাশ্রয়ী। তাহাকে সর্বক্ষেত্রেই ক্রোধহীন চিত্তে শুভ সঙ্কল্পের

সারথি হইতে হইবে। সমগ্র কাজটি তিনি অহিংস পন্থায় প্রকাশ্যে সর্ব সাধারণের বোধগম্য ও বুদ্ধিগ্রাহ্যরূপে সম্পাদিত করিবেন। সকলেই ইহার অর্থ উদ্দেশ্য শুচিতা ও সত্যময় শুভময় কল্যাণধর্ম যেন বুঝিতে সক্ষম হন। এই খানটিতে অন্যান্য আন্দোলন হইতে সত্যাগ্রহের তফাৎটি বিশেষ লক্ষণীয়। রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রাম মানেই তো চক্রান্ত ও প্রতিহিংসা। গান্ধীজি বারংবার সাবধান করিয়াছেন—উদ্দেশ্য ও তাহা সাধনের পথ বা উপায় উভয়ই শুদ্ধ এবং মহৎ হইতে হইবে। নহিলে সব কিছু একটা প্রচণ্ড ধোকাবাজি ও বিষম অকল্যাণে পরিণত হইতে বাধ্য। গান্ধীজির সত্যাগ্রহ অস্ত্র মানুষকে এই অকল্যাণের পথ হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই বোধ হয় উদ্ভাবিত হইয়াছে।

সত্যাগ্রহীর মন লইয়া গান্ধীজি আইন অমান্য আন্দোলন করিয়াছেন। স্বাধীনতার পরে অনেকে ইহার প্রয়োজনমত ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীমতী লীলা রায় লিখিয়াছেন "শ্রেণী সংগ্রাম ও অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন কেবল সমপর্যায়েরই নয় একই বস্তুর দুই নাম। মার্কসবাদে উল্লিখিত শ্রেণী-সংগ্রাম সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু।" সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলন মূলে এক। সত্যাগ্রহকে আমরা অস্ত্র বলি বটে কিন্তু আসলে ইহা একটি পথ, বিকাশের পথ। ফুল যেমন আপনি ফুটিয়া ওঠে এবং ফলে পরিণতি লাভ করে সত্যাগ্রহীও তেমনি ধীরে ধীরে নিজের কর্মের মাধ্যমে বিকশিত হন এবং অসত্য অন্যায় মিথ্যা গোপনতা চক্রান্ত প্রভৃতি দুর্বুদ্ধির অবসান ঘটে ও সুবুদ্ধির উদয় হয়। ফুলের আত্মবিলোপের মধ্য দিয়া জন্মলাভ করে ফল। ফলই ফুলের একমাত্র স্বাভাবিক ও সার্থক পরিণতি। অতএব ফুলের সঙ্গে ফলের কোন বিরোধ থাকিতে পারে না। তেমনি সত্যাগ্রহেও কোন বিরোধের অবকাশ নাই। তাই ইহা সংগ্রাম নয়, সংশোধন বা সৃষ্টি।

গান্ধীজি বলিয়াছেন Compromise is inherent in

Satyagraha—সত্যাগ্রহের অন্যতম সর্ত আপোষরফা। এই আপোষরফার পথেই সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ফুল নূতনতর কল্যাণময় ফলে পরিণতি লাভ করে।`

সত্যাগ্রহীরা অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহের পথে সংগ্রাম করিতেছেন একথাটা সাধারণ্যে প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন। সেইজন্য গান্ধীজি নির্দেশ দিয়াছেন সত্যাগ্রহ আরম্ভের পূর্বে ব্যাপক আন্দোলন দ্বারা জনমত গঠন করিতে হইবে। যে ক্ষতিকর ব্যবস্থা ও কার্য বা নীতির পরিবর্তনের জন্য সত্যাগ্রহী সংগ্রাম করিবেন তাহা যেন সুস্পষ্টরূপে প্রত্যেকের নিকট বোধগম্য হয়। তাহা হইলেই মানবমনের স্বাভাবিক সমর্থন পাওয়া যাইবে। এবং সেই সকল ক্ষতিকর, অসত্য এবং অহিতকর কর্মে লিপ্ত ব্যক্তিগণ জাগ্রত জনমতের নিকট সহজেই নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে। এই পথে তাহাদের হৃদয়ের পরিবর্তনও শীঘ্র আসিবে।

আমরা দেখিয়াছি গান্ধীজি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অর্জনের আশায় বারবার অনশন করিয়াছেন। অন্যান্য প্রচেষ্টা তো অব্যাহত ছিলই। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী সুফল তাহার দ্বারা অর্জিত হয় নাই। জিন্নাসাহেবের মনের উপর সত্যাগ্রহী গান্ধী কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। অন্ততঃ বাহিরে তাহার কোন আভাস পাওয়া যায় নাই। একমাত্র জিন্নার জিদেই ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমান সকলের স্বার্থের বিরুদ্ধে দেশ ভাগ হইয়াছে—একথার দ্বারা জিন্নার ক্ষমতার প্রতি মাত্রাতিরিক্ত সম্মান দেখানো হয়। ভারতবর্ষের মুসলমানগণ একটি পৃথক রাজ্যপাট পাইবেন এই লোভে বশীভূত হইয়া জিন্নার শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। সে যাহাই হোক আপোষরফামূলক সত্যাগ্রহ সাধনার ব্যর্থতার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণরূপে এটিকে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। গান্ধী রচনার মধ্যে ইহার একটা গ্রহণযোগ্য উত্তর পাওয়া যায়।

গান্ধীজিকে একদা প্রশ্ন করা হয় সত্যাগ্রহের দ্বারা হিটলারকে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করা সম্ভব কিনা। তিনি যে উত্তর দেন তাহাতে

স্পষ্ট হয় যে, সত্যাগ্রহে পরাজয় বলিয়া কোন বস্তু নাই। ইহা কখন ব্যর্থও হয় না বহু সাধারণ সৈনিকের আনুগত্যের উপর হিটলারের শক্তি নির্ভরশীল। সত্যাগ্রহের দ্বারা তাহাদের হৃদয়ের পরিবর্তন হইতে পারে এবং হিটলারের প্রতি আনুগত্যও কমিতে পারে, ফলে হিটলারের ক্ষমতা হ্রাস পাইবে ও তাহার পরিবর্তন আসিবে। হিটলার ডিক্টেটর হোন আর যাই হোন—মানুষ তো বটে। কোন মানুষই সংশোধনের বাহিরে নন। অতএব স্বয়ং হিটলারেরও হৃদয়ের পরিবর্তন সম্ভব।

মহারাজ অশোক একদা কম অত্যাচার করেন নাই। একটি মাত্র ঘটনা চণ্ডাশোককে ধর্মাশোকে পরিণত করে। ইতিহাসের পাতা হইতে আরও দুই চারিটি উদাহরণ আহরণ করা যায়। কিন্তু এখানে তাহা অপ্রয়োজনীয়। সময় পাইলে গান্ধীজি জিন্না সাহেবের হৃদয় পরিবর্তন করিতে সমর্থ হইতেন। আর দেরি করিলে জিন্নাজির মতিগতি বদলাইবে ও ভারতীয় মুসলমানের মনে দেশ বিভাগের জন্য জিদ কমিয়া যাইবে আশঙ্কা করিয়া ইংরেজ স্বাধীনতার দিন নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। সেই নির্দিষ্ট দিনের পূর্বেই স্বাধীনতা ঘোষিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর ইতিহাসের এক ভয়াবহ ভ্রাতৃবিরোধ মাথা চাড়া দিয়া ওঠে। সেদিনকার মহা-শ্মশানে গলিত শব আর শিবাদলের মধ্যে গান্ধীজিকে খুঁজিয়া লইতে এতটুকুও কষ্ট হয় নাই। তাঁহাকে আমরা হত্যা করিয়া বাঁচিতে চাহিয়াছি! সত্যাগ্রহ গান্ধীজির নিকট ধর্মযুদ্ধ ছিল। কিন্তু সে ধর্ম—'ধর্ম নহে সম্পদের হেতু, সে নহে সুখের ক্ষুদ্র সেতু।' অন্যে পরে কা কথা, গান্ধীজি ইংরেজের দুর্দশার বিনিময়ে বা তাহাদের বেকায়দায় ফেলিয়া ভারতবর্ষের স্বাধীনতাও চান নাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কথাটি তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার রেলের শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের ধর্মঘট দ্বারা বিব্রত হইলে গান্ধীজি তাঁহার সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থগিত রাখেন। অথচ সরকারের সেই দুর্দিনের সুযোগে দাবি আদায় করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য ছিল। সত্যাগ্রহে এই প্রকার সুযোগগ্রহণ নিষিদ্ধ। বিরোধীপক্ষকে ভুল বা অন্যায় করা

হইতে বিরত রাখিতে হইলে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে প্রগাঢ় সহানুভূতি ও সমবেদনা থাকা চাই।

চৌরিচৌরায় হিংসাত্মক কার্য ঘটিলে গান্ধীজি সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিলেন। দেশের অনেকেই তাঁহাকে সে জন্য নিন্দা করিল ও কটুবাক্য বলিল। গান্ধীজি অটল অচল রহিলেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলনে হিংসা বর্জন করিতেই হইবে। ভারতবর্ষের পরবর্তী গণ-আন্দোলনগুলি দেখিয়া আজ অনেকে বলিয়া থাকেন গান্ধীজি সেদিন ঠিক কাজই করিয়াছিলেন। ১৯২৫ সনের আন্দোলনে পঞ্চাশ-ষাট হাজার লোক কারাবরণ করেন। ১৯৩০ সনের আন্দোলনে যোগদান-কারীর সংখ্যা অনেক বেশি। ১৯৪২ সনে দেখা গেল দেশ যে কোন ত্যাগের জন্য প্রস্তুত। অহিংসা ও সত্যাগ্রহে তখন জাতির একটা নির্ভরতা হইয়াছে।

সত্যাগ্রহ আন্দোলনে কোন নেতার দরকার গান্ধীজি স্বীকার করিতেন না। ইহাকে তিনি জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ বলিয়াই মনে করিতেন। প্রতিদিন আমরা সুন্দর জীবন-যাপনের জন্য কোন নেতার প্রয়োজন অনুভব করি না। সুতরাং সেই জীবনকে মালিন্যমুক্ত ও সুন্দরতর করিবার জন্য নেতার প্রয়োজন হইবে কেন? ১৯৪২ সনের ভারত ছাড় আন্দোলন বস্তুতঃ নেতৃত্বহীন জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান ছিল। সে আন্দোলনকে সার্থক আন্দোলন বলা চলে। ইহাকে অহিংসা ও সত্যাগ্রহ বলিতে কেহ স্বীকৃত হইবে না। কিন্তু যখন দেখি মেদিনীপুরে জনতা থানা দখল করিয়া হাতে বন্দুক পাইয়াও তাহা ব্যবহার করে নাই; বন্দুকগুলি ভাঙিয়া ফেলিয়াছে- তখন ইহাকে কি ভাবে ব্যাখ্যা করা যাইবে? গান্ধীজি হিংসাকে ভয় করিতেন না। ভয় করিতেন অহিংসার মন্ত্রে দীক্ষিত মানুষের হিংস্র আচরণে; সত্যাগ্রহীর মিথ্যাচারে।

সত্যাগ্রহ অহিংস আন্দোলন। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বিজয়কেতন উড্ডীন হইবার পর দেখি হিংস্র উপায়ে সোভিয়েট রাশিয়ায় বলশেভিক

মতবাদের প্রতিষ্ঠা হইল। গান্ধীজি বলিতেন "হিংসার দ্বারা অর্জিত ধন অহিংসার দ্বারা রক্ষা করা যায় না।" কিন্তু অহিংসার দ্বারা অর্জিত সাফল্য কি হিংসা বা হিংস্রতার দ্বারা ব্যর্থতায় পরিণত করা যায় না? অপরদিকে সর্বোদয়ের সঙ্গে সাম্যবাদের পার্থক্য কতটুকু! সর্বোদয়ের পথে হিংস্রতা অতর্কিতে আসিয়া একদিন ভারতবর্ষে বলশেভিক মতবাদ প্রকট হইতে পারে অনেকে এই আশঙ্কার কথা গান্ধীজির নিকট ব্যক্ত করেন। গান্ধীজি সেই রকম কোন সম্ভাবনার কথা একবারেই স্বীকার করেন নাই। পরন্তু তিনি বলেন সত্যাগ্রহই ইহাকে যথার্থভাবে প্রতিরোধ করিতে পারে। বলশেভিক মতবাদ বর্তমান বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার স্বাভাবিক পরিণতি। পশুশক্তি অপেক্ষা স্বাধীনতা ও ভালবাসা, এবং বস্তু অপেক্ষা নীতির উৎকর্ষে যদি আমরা আস্থা হারাই তাহা হইলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই আমাদের এই পুণ্যভূমিতে বলশেভিক মতবাদের প্রসার দেখিতে পাইব। সুতরাং সত্যগ্রহের মূলে যে ভগবদ্বিশ্বাস রহিয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। অবিশ্বাসী অপ্রেমী মানুষের দ্বারা নীতিনিষ্ঠ হওয়া সম্ভব নহে; সত্যাগ্রহ তো দূরের কথা। ভারতভূমি ধর্মভূমি, তাই এখানে ধর্মবিশ্বাসহীন বলশেভিক মতবাদ শ্রদ্ধার সঙ্গে কোনদিন গৃহীত হইবে না। তা ছাড়া বৈষম্য দূর করার হিংস্র পদ্ধতি অচিরেই নূতনতর এবং কঠিনতর বৈষম্য সৃষ্টি করিবে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

হিংস্র যুদ্ধে ঘৃণা, বিদ্বেষ, নিষ্ঠুরতা, অসতত্য প্রভৃতি যাবতীয় দুষ্প্রবৃত্তির সহিত একনায়কত্ব মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়ায়। 'গান্ধারীর আবেদন'-এর দুর্যোধনের ন্যায় তখন বলিতে হয়:

'দীপ্ত জ্বালা অগ্নি ঢালা সুধা
জয়রস, ঈর্ষাসিন্ধুমন্থনসঞ্জাত,
সদ্য করিয়াছি পান,—সুখী নহি তাত,
অদ্য আমি জয়ী।'

স্বাভাবিক নিয়মে সব সংগ্রামের একদিন অবসান হয়। মনুষ্যত্বের

অপমৃত্যুর সেই শ্মশানভূমিতে বিজয়ী বিজেতা সমান দুঃখী সমান ক্ষতিগ্রস্ত। অপরদিকে সত্যাগ্রহ সংগ্রামের ইতিহাসে পরাজয় বলিয়া কোন কথা নাই। ইহার মূল সূত্র "সংঘ শক্তিকে আশ্রয় করিয়াই মানুষকে গড়ার কাজে অগ্রসর হইতে হইবে। সেই প্রচেষ্টার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে তাহারা উত্তরোত্তর সিদ্ধিলাভের পথে অগ্রসর হইবে।··· সত্যাগ্রহ সামাজিক রূপান্তর সাধন করে কিন্তু ঘৃণা সৃষ্টি করে না,··· সত্যাগ্রহে তাহার শুভবুদ্ধি জাগ্রত করিয়া সত্যাগ্রহী স্বীয় প্রাক্তন প্রতিপক্ষের সহযোগিতা লাভ করিয়া নূতন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন।"

সশস্ত্র যুদ্ধের বিকল্প এই সত্যাগ্রহ। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ করিয়া আমরা কোন সমস্যার সমাধান করিতে পারি নাই। অস্ত্র মানুষের শক্তি সত্যসত্যই বৃদ্ধি করে এ কথা গান্ধীজি বিশ্বাস করিতেন না। কোন সত্যাগ্রহীই ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন না। গান্ধীজির কথাঃ When one was deprived of them (arms) generally there was nothing left but surrender. অর্থাৎ অস্ত্র-ধারীর অস্ত্রখানা চলিয়া গেলে তাহার আত্মসমর্পণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু সত্যাগ্রহী? তাহার তো কোন কিছু হারাইবার ভয় নাই। সত্যাগ্রহী তো আত্মপর সকলের হিতসাধনে একনিষ্ঠ যত্নশীল। আনন্দমাত্র তাহার পুরস্কার। সুতরাং তাহার হৃদয়ের ঐশ্বর্যও তাহার অমোঘ বীর্য হইতে কে তাহাকে বঞ্চিত করিতে পারে? কিন্তু সকলেই কি এই মহা আয়ুধের অধিকার লাভ করিবার যোগ্য?

মানুষ চেষ্টা করিলে নানা বিদ্যা ও বিবিধ কার্যে দক্ষতা অর্জন করিতে সমর্থ হয়। সত্যাগ্রহের ক্ষেত্রেও তাহা সত্য। কোন পথে ইহা লভ্য? জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণের পথে চলিয়া ইহা পাইতে হয়। ঈশ্বরে জ্বলন্ত বিশ্বাস ছাড়া আত্মপর সর্ব মানবকে সমানভাবে ভালবাসা যায় না; অহিংসার সাধনা ভিন্ন প্রতিপক্ষের অত্যাচারের শিকার হইয়া

তাহার হৃদয়ের পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করা সম্ভবপর নহে। এবং সরল সত্যাশ্রয়ী সেবাময় ও প্রার্থনাশীল জীবনযাপন ভিন্ন এই কাজের উপযোগী হওয়া যায় না। অতএব উপযুক্ত প্রস্তুতি ভিন্ন সকলের সত্যাগ্রহী হইবার অধিকার নাই। পতিতা ভগ্নিদের সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদানের আবেদনের উত্তরে গান্ধীজির বক্তব্য এই প্রসঙ্গে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। "সকলেই সত্যাগ্রহের সামিল হোক ইহা আমি কামনা করি। কিন্তু আমি সর্বক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া অননুতপ্ত কোন পেশাদার খুনীকে সত্যাগ্রহ সনদে স্বাক্ষর দিতে বাধা দিব।"

আজ বিশ্বব্যাপী মানুষনিধন-যজ্ঞের উন্মত্ত আয়োজন চলিতেছে। নিমেষে লক্ষ লক্ষ লোক হত্যা করিবার অভূতপূর্ব উদ্যোগ দেখিয়া মানুষকে স্তব্ধ হইয়া চিন্তা করিতে হইতেছে—ইহার পরিণতি কোথায়? চোখের বদলে চোখ চাই ইহাই যদি সকল মানুষের লক্ষ্য হয় তাহা হইলে একদিন পৃথিবীতে চক্ষুষ্মান মানুষ নাও থাকিতে পারেন। অতএব এই পথ কল্যাণ-পথ নহে। ততঃ কিম্? মানুষের বস্তুগত সঞ্চয়ের মাত্রাহীন স্ফীতি তাহাকে আজ পদে পদে বিড়ম্বিত করিতেছে। এই বিড়ম্বনার পথ ধরিয়া নানা বিরোধ আমাদের পীড়িত করিতেছে। দেশে দেশে বিরোধ, আদর্শে আদর্শে বিরোধ, শ্রমিক মালিকে বিরোধ লোভ লালসা হিংস্রতার বহুবিধ বিচিত্র রন্ধ্রপথে বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িতেছে। নানা মতবাদের ভক্তরা ইহার নিরাকরণের দাওয়াই লইয়া বিশ্বের হাটে হাটে ফিরি করিতেছেন। গণতন্ত্র, ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সাম্যতন্ত্র কত কি তার নাম। এক তন্ত্র অপর তন্ত্রকে আঘাত করিতেছে। ইহাও এক নূতনতর শ্রেণী-সংগ্রাম বোধ হয়। সকলেই বলিতেছেন আমারটাই শ্রেষ্ঠ, আর সব ঝুটা।

সত্য যাহা তাহা চিরকল্যাণময়। সে কাহাকেও আঘাত করে না। নিরাময় করাই তাহার কর্ম, তাহার ধর্ম। সংঘাতের মধ্যে তাই সত্য নাই। আছে কিছু ক্ষমতা লুব্ধ লোভাতুর মানুষের অপকৌশল। সেই

সামান্য সংখ্যক ভ্রান্ত মানুষের কর্মকৃতির জন্য সারা পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ অসহায়ভাবে মার খাইতেছে। কোথায়ও তুটি ক্ষুধার অন্নের জন্য হৃদয়বৃত্তির নির্বাসন, বর্ণের কৃষ্ণত্বের জন্য অমর্যাদা অসম্মান, আবার কোনখানে ক্লিষ্ট পীড়িত মানুষের মাথার উপর ডেমোক্লিশের খড়্গের মত তথাকথিত মিত্র অ-মিত্র সকলের আণব বোমা উদ্যত হইয়াছে। মানব সভ্যতার এই শোচনীয় দুর্গতির মধ্যে পরমাশ্রয় ও একমাত্র ভরসা মহামানব মহাত্মা গান্ধীর অভয়বাণী।

"ষণ্ডা যখন আসে তেড়ে
উঁচিয়ে ঘুষি ডাণ্ডা নেড়ে
আমরা হেসে বলি জোয়ানটাকে
ঐ যে তোমার চোখ-রাঙানো
খোকাবাবুর ঘুম-ভাঙানো,
ভয় না পেলে ভয় দেখাবে কাকে।"

এই ভয়-না পাবার সাধনা হইল সত্যাগ্রহের সাধনা। দিকে দিকে আজ মানুষের মনে ভয়হীনতা প্রকটিত হইতেছে। গান্ধীজি মানুষের ভয় দূর করিয়া দিয়াছেন। নূতন পথের সন্ধান দিয়াছেন। সে পথ হইল সত্যাগ্রহের সোজা সড়ক। সেই পথ দিয়া বিশ্বমানবের মুক্তি সমাসন্ন। মানবসভ্যতার পশ্চাৎ গতি নাই। সভ্যতার আদিকাল হইতে দিনে দিনে ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। ইতিহাসের ইহাই নিয়ম। সুতরাং আণবিক বোমার বিকট অট্টহাস্য বা তাহার হিংস্র পূজারীদের তাণ্ডবনৃত্যের মধ্যে ভয় পাইবার কোন প্রকৃত কারণ নাই। ইতিহাসে অনিবার্যতায় আমাদের সামনে নূতন প্রভাতের সূর্য উদিত হইবেই। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে মহামানব মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ মহামন্ত্র ভারতবর্ষের পুণ্যভূমিতে সেই পুণ্যপ্রভাতের প্রসন্ন বালার্ক। ভারতবর্ষের সার্বভৌম কবি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথও জীবন সায়াহ্নে এমনি

আশা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। সেই ঋষিবাক্য, সত্যবাক্য স্মরণ করিয়া আজিকার সত্যাগ্রহ কীর্তনের সমাপ্তি করিতেছি।

"আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর—একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে।"

—০—

অনশন

FAST এই ইংরেজী শব্দটির বাঙলা হইল উপবাস। উপবাস ধর্মসাধনার অঙ্গ বা সোপান বলিয়া স্বীকৃত। গান্ধীজি ঐ উপবাসের সোপান দিয়া ধর্মাতিরিক্ত, রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধানে পৌঁছাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই উপবাসকে আমরা অনশন নামে অভিহিত করিয়াছি। কিন্তু **Fast** বলিলে যাহা বুঝি, অনশন শব্দটির দ্বারা তাহা যথার্থরূপে ব্যক্ত হয় না। তথাপি দীর্ঘকাল যাবৎ বহু-ব্যবহারের ফলে অনশন কথাটি এই প্রসঙ্গে গ্রাহ্য হইয়াছে। ইহার প্রকৃত অর্থ যাহাই হোক, গান্ধী-আলোচনার অনশন বলিলে আমরা **starvation** না বুঝিয়া fast বুঝিয়া থাকি। সেই অর্থেই অনশন শব্দটি এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে।

স্বেচ্ছায় বা ঘটনাচক্রে উপবাস এবং বাধ্যতামূলক অনাহার উভয়কেই অনশন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। মানুষ যখন স্বেচ্ছায় সংবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া কল্যাণব্রত উদ্‌যাপনের অঙ্গরূপে খাদ্য বর্জন করেন, তাহাকে আমরা অনশন বলি না, বলি উপবাস। ধর্মাশ্রয়ী মানব-জীবনে উপবাস একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। সাধনার প্রস্তুতিপর্বে ইহা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। কথিত আছে, মহাপুরুষেরা ভগবানের দর্শন লাভের জন্য দীর্ঘকাল উপবাসী থাকিয়াছেন। আমাদের

দৈনন্দিন জীবনে কলহ-বিবাদের পরিণতিতে প্রতিপক্ষের উপর প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে অনেককে খাদ্য বর্জন করিতে দেখিয়াছি। ইহার ফলে সমগ্র পরিবারে তীব্র-আলোড়ন সৃষ্টি হয়। মহাত্মা গান্ধী জন-জীবনে যে অহিংস-অসহযোগ বা সত্যাগ্রহের প্রবর্তন করেন তাহারই স্বাভাবিক এবং যুক্তিসিদ্ধ অনুষঙ্গ হইল প্রার্থনা ও অনশন।

শৈশবেই গান্ধীজির জীবনে উপবাসের প্রভাব পড়ে। গান্ধী জননী পুতলী বাঈ ছিলেন সে যুগের বারব্রতপরায়ণা ধর্মাপ্রাণ হিন্দুরমণী। "পূজা পাঠ না করিয়া কখনও খাইতেন না।" উপবাস তাঁহার নিত্য সঙ্গী ছিল। আত্ম-জীবনীর প্রায় সুরুতেই এ বিষয়ে গান্ধীজি একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন।

ধর্মের আঙ্গিণা হইতে অনশন কেমন করিয়া সমাজের ও রাষ্ট্রের বিবিধ সমস্যার সমাধানে প্রযুক্ত হয়, গান্ধীজির লেখায় তাহার বিবরণ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা পাই রাজকোট অনশনের (১৯৩৯) প্রাক্‌কালে সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবৃতিতে। গান্ধীজির কথায়, "বালক বয়সে আত্মশুদ্ধির জন্য আমি উপবাস সুরু করিয়াছিলাম। পরে আমার একটি ভ্রান্ত পুত্রের জন্য দীর্ঘ অনশন করি।" ইহার অল্প পরেই জনৈক বন্ধুকন্যার ভ্রমাত্মক আচরণ সংশোধনের উদ্দেশ্যে গান্ধীজি আবার অনশন করেন। আত্মজীবনীর চতুর্থভাগে এ বিষয়ে তাঁহার অন্তরঙ্গ আলোচনাটি এখানে উদ্ধৃত করা অসঙ্গত হইবে না। "জোহানেসবার্গে কিছুদিন থাকিতেই দুইজনের পতনের সংবাদ পাওয়া গেল।......এই ঘটনা আমাকে বজ্রাঘাত করিল।......অভিভাবক বা শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে যাহারা থাকে তাহাদের পতন হইলে তত্ত্বাবধায়ক অল্পবিস্তর দায়ী হন।......আমার বোধ হইল, যদি এই পতনের জন্য আমি প্রায়শ্চিত্ত করি তবে যাহারা পতিত হইয়াছে তাহারা আমার দুঃখ বুঝিবে ও তাহাদের নিজ দোষের জ্ঞান জন্মিবে ও দোষ কতকটা স্খালন হইবে। এই জন্য আমি ৭ দিনের উপবাস ও সাড়ে চার মাস একবেলা আহারের ব্রত গ্রহণ করিলাম।......এই

প্রকার স্থির করার পরেই আমি হাল্কা বোধ করিলাম, শান্ত হইলাম, দোষীদিগের উপর ক্রোধ রহিল না, দয়া হইল।"

চলতি বিচারে পতিত দুইজনের শাস্তি পাওয়ার কথা। আদিকাল হইতেই এই বিচারধারা চলিয়া আসিতেছে। দেশভেদে, কালভেদে শাস্তির রকমফের ঘটিতে পারে কিন্তু মূলনীতি সর্বত্রই অপরিবর্তিত রহিয়াছে। কিন্তু নানাভাবে শাস্তিবিধান করিয়াও অপরাধ নির্মূল করা দূরে থাকুক, সার্থকভাবে নিবারিত করা যায় নাই। সুতরাং স্বীকার করিতে হয় যে, মানুষ স্বভাবতই অপরাধ-প্রবণ, অথবা অপরাধীকে শাস্তি দান অপরাধ নিবারণের যথার্থ ও সত্য উপায় নহে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য মানবহিতৈষী মহাজনেরা নানা কর্মসূত্র নির্ধারণ করিয়াছেন। মানুষের স্বভাবে অপরাধ-প্রবণতা বর্তমান - ইহা বৈজ্ঞানিক বিচারে স্বীকৃত হয় নাই। অপরাধ নিবারণের প্রচলিত বিধিব্যবস্থার পরিবর্তন করিয়া ইহাকে ত্রুটিশূন্য করিবার চেষ্টা অনেকেই করিয়াছেন। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এই প্রচেষ্টাটিই বস্তুতঃ একটি অখণ্ড কর্মপ্রবাহ। কোন যুগে কোন ক্ষেত্রেই ইহাতে যে ছেদ পড়ে নাই তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। মানবসমাজের বা অন্যকথায় মানব-সম্পর্কের এই মৌলিক ত্রুটি দূর করিবার জন্য গান্ধীজি সত্যাগ্রহ মহামন্ত্রের প্রবর্তন করেন। ইহাকে প্রচলিত প্রায়শ্চিত্তের রকমফের বলিতে পারি। অপরের মঙ্গলকামনায় সানন্দে ও স্বেচ্ছায় যে আত্মনিগ্রহ বরণ করাকেই আমরা সত্যাগ্রহ বলি। অহিংস আচরণ এবং প্রার্থনাশীল জীবন-যাপন করা সত্যাগ্রহীর পক্ষে অত্যাবশ্যক। এই সর্ত পূরণ না করিয়া সত্যাগ্রহ পালন করা যায় না। বিপদে আপদে তিনি একমাত্র ভগবানের শরণ গ্রহণ করিবেন। অন্যবিধ সাহায্য সহায়তার উপর নির্ভর বর্জনীয়। আর সত্যাগ্রহীর শেষ আশ্রয় হইল এই অনশন বা উপবাস। গান্ধীজি লিখিতেছেন (হরিজন ১৮ মার্চ, ১৯৩৬) "আমৃত্যু নিগ্রহ বরণ করা এবং সেই কারণে অবিরাম অনশন করা সত্যাগ্রহীর শেষ অস্ত্র।"

সকল অস্ত্র যখন ব্যর্থ হইয়াছে তখনই মানুষ শেষের অস্ত্রটি প্রয়োগ করে। মোক্ষম অস্ত্রটি সে সযত্নে পৃথক করিয়া রাখে। সাধারণ অস্ত্রে যদি কার্য সম্পাদন করা একান্তই সম্ভবপর না হয় তবে শেষমুহূর্তে এই ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া বিজয়শ্রী লাভের আয়োজন করা হয়। অস্ত্রটি যখন অসাধারণ তখন প্রয়োগকর্তা নিশ্চয়ই সাধারণ হইতে পারেন না। অসাধারণ জিনিস ব্যবহারের জন্য অসাধারণ যোগ্যতার অধিকারী হওয়া অবশ্য প্রয়োজন। সকল সত্যাগ্রহীর তাই অনশন করিবার যোগ্যতা নাই। ইহার জন্য বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন, শিক্ষাও দরকার। গান্ধীজি ঔষধের সহিত উপমা দিয়া বলিয়াছেন—"কয়েকটি বিশেষ কার্যকর ঔষধের মত বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে বিরল ক্ষেত্রেই মাত্র (অনশন) গৃহীত হওয়া উচিত।"

মহাত্মা গান্ধীর বিশ্বাস ছিল, অনশন পৃথিবীর প্রথমতম মানুষ আদমের মতই প্রাচীন। সত্যাগ্রহকে তিনি সত্যের শক্তি বলিয়া বর্ণনা করিতেন। ইহা আত্মশক্তিও বটে। এই ক্ষেত্রে অনশনের গুরুত্ব অশেষ। অনশন সুরু করিবার পূর্বে কয়েকদিন গান্ধীজির নিকট প্রার্থনার দিন বলিয়া চিহ্নিত থাকিত। প্রার্থনার দ্বারা তিনি নিজেকে ভগবানের পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া দিতেন। তাঁহার এই সমর্পিত চিত্তে দৈববাণী ধ্বনিত হইত। সেই ঐশ্বরিক বাণীর দ্বারা গান্ধীজি বহুক্ষেত্রে পরিচালিত হইয়াছেন। তিনি এক স্থানে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—Fasting is only good when it comes in answer to prayer and as felt yearning of the soul. দৈববাণী বা অন্তরের বাণী সাধারণের নিকট অনেক সময় দুর্বোধ্য ও অবিশ্বাস্য হইয়া থাকে। ইহা মূঢ়তা মাত্র। যাহা ইন্দ্রিয়ের অগোচর বা বুদ্ধি ও জ্ঞানগ্রাহ্য নহে তাহাই আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। অথচ ঈশ্বর সম্পর্কে জানিবার কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়াও আমরা অবিশ্বাস প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হই না। ইহা মূঢ়তা ছাড়া আর কি হইতে পারে! শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন—"সকলেই বলে ভগবান দেখাইয়া দাও কিন্তু সেজন্য চেষ্টা করে না।"

১৯৪৩ সন। গান্ধীজির বয়স ৭৪ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। ইংরেজ বন্দী-শিবির আগা খাঁ প্রাসাদে তিনি তখন কারাজীবন যাপন করিতে-ছেন। সেই অবস্থায় তাঁহাকে একুশ দিনের অনশন করিতে হয়। কোন্ শক্তির জোরে তিনি এই অনশনব্রত উদ্‌যাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা এক মহাবিস্ময়! বিশ্বাসী মানুষ বলেন, ঈশ্বরের আশীর্বাদেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ঐ সময় গান্ধীজির নিকটে ছিলেন। অনশনব্রতের শেষে তিনি মন্তব্য করিয়াছিলেন—He was very near to death. Mahatmaji fooled us all.—তিনি মৃত্যুর অতিশয় সন্নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহাত্মাজি আমাদের সকলকে বোকা বানাইয়া দিয়াছেন। পুণার যারবেদা জেলে অনশনের সময় রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজিকে দেখিতে যান। তিনি লিখিয়াছেন—"মহাত্মাজির শীর্ণ শরীর, শীর্ণতম কণ্ঠস্বর প্রায় শোনা যায় না।…অথচ চিত্তশক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয়নি। চিন্তারধারা প্রবহমান চৈতন্য অপরিশ্রান্ত। …মানসিক জীর্ণতার কোন চিহ্নই তো নেই।"

এখানে বাইবেলের ST. Mathew'র একটা কথা স্বভাবতই মনে পড়ে। সরষের দানার মত তিল পরিমাণ বিশ্বাসেও পর্বত টলে। বিশ্বাসীর নিকট অসম্ভব বলিয়া কিছু নাই। কোন্ উপায়ে? Howbiet this kind goeth not out by prayer and fasting.

অনশনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে গান্ধীজি বলিয়াছেন—My fast is intendent to rouse souls of man. আত্মার জাগরণ! দিল্লীতে গান্ধী-জীবনের শেষ অনশনের প্রথম দিন এ সম্পর্কে গান্ধীজির একটি অবিস্মরণীয় উক্তি আছে · This is a fast really for the purification of my own soul. It is an appeal to God to purify the souls of all and to make them sane. আত্মার পরিশুদ্ধন! গান্ধীজির ভাষায় cleansing.

গান্ধী-সহচর প্যারেলালজি লিখিয়াছেন—It is not the physical act of fasting but the spiritual content ot the fast that gives it its potency. উপবাসের ফলে অধ্যাত্মশক্তির জাগরণ হয় এবং সেইটাই ইহার প্রকৃত শক্তি।

অনশনের একটা বিশেষ উপলক্ষ থাকে বটে, কিন্তু তাহার দ্বারা উদ্দেশ্যসিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনশনকারীর হৃদয়টিও নির্মল হয়। গান্ধীজি একটি সুন্দর উপমা দিয়াছেন: অতিথির শুভাগমন উপলক্ষে আমরা ঘর চুণকাম করি। কিন্তু তাহার প্রত্যাগমনের সঙ্গে সঙ্গে চুণকাম অন্তর্হিত হয় না। তেমনি অনশনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার পরও অনশনের দ্বারা লব্ধ হৃদয়ের নির্মলতা রহিয়া যায়। বাইবেল বলেন, আত্মা খোয়াইয়া সমগ্র বিশ্ব পাইলেও কোন লাভ নাই। What is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul. অনশনের পথে আত্মা অটুট থাকে, সুন্দরতর হয়।

অনশনের মর্মকথাটি সহজবোধ্য নহে। গান্ধীপুত্র দেবদাসও দেখা যায় ইহার মর্ম গ্রহণে সমর্থ হন নাই। ইহা জানিয়া গান্ধীজি তাহাকে "গজেন্দ্র মোক্ষ" পাঠ করিবার নির্দেশ দেন। ইহা পাঠ করিলে নাকি সহজেই অনশনের মর্ম অবগত হওয়া যায়।

উপবাসের নানা রকমফের আছে। অহোরাত্র, এক বেলা, একদিন উপবাস যেমন আছে তেমনি আবার নির্জলা ও লঘু আহার সহ উপবাসের বিধান রহিয়াছে। প্রায়োপবেশনও ইহার মধ্যে পড়ে। কাজের চাপ কোন কারণে বাড়িয়া গেলে গান্ধীজি খাওয়া কমাইয়া দিতেন। ব্যক্তিগত দরকারের যেমন তেমনি দেশ ও রাষ্ট্রের বৃহত্তর প্রয়োজনে অনশনের প্রয়োগ সম্ভব। কিন্তু "প্রায়োপবেশনের মূলে একমাত্র সত্যকে ব্যক্ত করিবার অদম্য আকুতি থাকিবে।" —ইহাই ছিল গান্ধীজির নির্দেশ সত্যকে প্রকাশ করা বা মানা সহজ কথা নহে। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন 'সবচেয়ে বড় ভীরুতা তখনই

প্রকাশ পায় যখন সত্যকে চিনতে পেরেও মানতে পারি নে। সে ভীরুতার ক্ষমা নেই।” আমাদের সেই ক্ষমাহীন ভীরুতার হাত হইতে উদ্ধার করিবার যখনই প্রয়োজন হইয়াছে তখনই গান্ধীজি প্রায়োপবেশন করিয়াছেন।

ঘটনাপ্রবাহের উপর প্রভাব হ্রাস পাইলে অর্থাৎ তাহার নিয়ন্ত্রণের বাহিরে গেলে অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে কোন প্রকারেই যখন তাহার গতি পরিবর্তন করা যায় না বা তাহার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভবপর হইতেছে না তখনই অনশনের প্রয়োজন ঘটে। কলিকাতা অনশনের সময় (১৯৪৬) গান্ধীজি কথাটি স্পষ্ট করিয়া বলেন **“What my words in person cannot do, my fast may.”** আমার কথা যাহা করিতে পারে না, অনশন তাহা করিতে সক্ষম হইতে পারে।

বহুবিধ কারণে অনেক সময় আমরা অজ্ঞাতে অমঙ্গলকে মঙ্গল বলিয়া গ্রহণ করিয়া নিজের এব. দেশ ও দশের ক্ষতি করিয়া থাকি। এই রকম সময়ে বিচার বিবেচনা যুক্তি তর্ক বড় একটা কাজে আসে না। ঈশ্বরবিশ্বাসী সত্যাশ্রয়ী মানুষ লোকপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া তখন যদি অনশনব্রত পালন করেন তবেই ভ্রান্তবুদ্ধির নিরসন হয়, সত্যদৃষ্টি লাভ করে এবং অমঙ্গল দূর হইয়া মঙ্গল প্রতিষ্ঠা পায়। প্রেম সত্যসত্যই মৃত্যুঞ্জয় হইতে পারে। মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের নিকট অসম্ভব কিছু নাই। সাবিত্রীর মৃত্যুঞ্জয়ী ভালবাসার ফলেই তো সত্যবান পুনর্জীবন লাভ করেন।

ঐতিহাসিক পুণা অনশনের সময় গান্ধীজি যারবেদা জেলে। সর্দার প্যাটেল ও মহাদেব দেশাই তখন সেখানে তাঁহার সহবন্দী ছিলেন। ঐ অনশনের সিদ্ধান্ত বিজ্ঞাপিত হইবার পর ইঁহাদের সহিত আলোচনা-প্রসঙ্গে গান্ধীজি বলেন :

It (fast) is a law of Satyagraha that when a man has no weapon in his hands and when he cannot

think of a way out, he should take the final step of giving out his body.

অন্ধকারে যখন কোন পথ দেখা যাইতেছে না তখন জীবন বিসর্জন দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। এই আলোচনায় তিনি রাজপুত রমণীদের জহর ব্রতের কথা স্মরণ করেন।

প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারত ভ্রমণ উপলক্ষে দেশব্যাপী বয়কট আন্দোলনের মধ্যে বোম্বাইয়ে ভয়াবহ দাঙ্গা দেখা দেয়। গান্ধীজি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার মনে হইল তিনি যেন সম্পূর্ণরূপে শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছেন। সেই উন্মত্ত হিংস্র জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে তিনি ব্যর্থ হইলেন। ইহার ফলে গান্ধীজির অহিংস-সাধনা সমালোচনার সম্মুখীন হয়! দুঃখ ও দুর্যোগে অহিংসা যদি হিংস্র ও পাশব বৃত্তির হাত হইতে মানুষকে উদ্ধার করিতে না পারে তবে তাহার প্রয়োজন কি? এই রকম নানা চিন্তায় গান্ধীজি যেন বিমূঢ় হইয়া গেলেন। তাঁহার মুখে একটি মাত্র কথা Then what to do? কি করা? চিত্তের সেই একান্ত অশান্ত অবস্থার মধ্যেই ঐ বিপর্যয়ের প্রতিকারকল্পে অনশনের কথা তাঁহার চিত্তে উদয় হয়। যেখানে নিরপরাধ নর-নারী-শিশু আততায়ীর হাতে অসহায়ভাবে নিহত হইতেছে, সেখানে গান্ধীজি নীরব নিষ্ক্রিয় দর্শক হইয়া থাকিবেন ইহা অকল্পনীয়। অনশনের ফল কি হইবে তাহা হয়তো তখন মহাত্মা গান্ধীর চিত্তে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় নাই। কিন্তু তিনি নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিলেন—

If I may not give myself to be killed through human agency I must give myself to God to be taken away by refusing to eat till he heard my prayer.

হয় ভগবান আমার প্রার্থনা শুনিবেন—মানুষে মানুষে হানাহানি বন্ধ হইবে, না হয় যতক্ষণ তাহা না হইবে ততক্ষণ খাদ্য বর্জন করিব।

অনশনের সঙ্কল্প গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজির তীব্র মানসিক যন্ত্রণার উপশম হয়। তাঁহার বিক্ষুব্ধ চিত্ত শান্ত হইয়াছিল!

মনের শান্ত অবস্থাই তো শান্তি। যাহাকে ভালবাসি শ্রদ্ধা করি তাহাকে সর্ব-অমঙ্গলের স্পর্শ হইতে সুরক্ষিত রাখিবার কার্যকর উপায় করিতে পারিলে আমরা শান্তিলাভ করিয়া থাকি। মানুষ যাহার ভাই সেই গান্ধীজির নিকট বিশ্বের প্রতিটি মানুষই ছিল শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র। এইজন্য গান্ধীজি অনশন ব্রত পালন করিবার পূর্ণ অধিকারী ছিলেন। সংক্ষেপে পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিতে যিনি দ্বিধাহীন একমাত্র তিনিই ইহা করিতে পারেন। অনশন সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন "শুদ্ধ অনশনে স্বার্থপরতা, ক্রোধ, অবিশ্বাস এবং অধৈর্যের কোন স্থান নাই। যাহার অন্তরে শক্তি নাই তাহার অনশন করিবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্যও অনশন অচল। প্রার্থনার পরম পরিণতিতে উপবাসের উদয় হয়। গভীর ভগবদ্বিশ্বাস ভিন্ন প্রার্থনা ভিক্ষার সামিল। আর ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ। অনশনের যন্ত্রণাভোগের (passion) দ্বারা নৈতিক চেতনা জাগ্রত হয়।" অধিকাংশ মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে সুবিধা অনুসারে নীতি নির্ধারণ ও প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যথার্থ নীতিবোধের শাসন জীবনের সর্বক্ষেত্রে সুদৃঢ় না হইলে, শঠতা, হিংস্রতা, বিকৃতি এমন কি একনায়কত্বের পথটি প্রশস্ত করা হয়। আমাদের জীবনকে নির্মল সুনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই গান্ধীজি জীবনভোর নানা লাঞ্ছনা যন্ত্রণা (passion) ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কৃতকর্মের প্রাসাদে রাজনীতিশাস্ত্র নীতিশাস্ত্রের কল্যাণতিলকে চর্চিত হইয়াছে।

প্রত্যেকটি অনশনের পূর্বে গান্ধীজি প্রার্থনাশীলচিত্তে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতেন। প্রতিটি অনশনের সিদ্ধান্ত অকাট্য যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিত। কখন কখন অন্তরঙ্গ অনুগামী ও সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনাও করিতেন। কিন্তু সিদ্ধান্তগ্রহণ' ও ফলাফলের দায়িত্ব নিজের উপরেই রাখিতেন। পূর্বে বলা হইয়াছে,

অনেক ক্ষেত্রে গান্ধীজি অন্তরের বাণীর দ্বারা পরিচালিত হইতেন ইহা ভিন্ন তিনি সকলকে মুক্ত রাখিবার জন্যই পূর্ণ দায়িত্ব নিজের উপরেই রাখিতেন। বোম্বাইয়ের দাঙ্গা নিবারণের জন্য অনশন করিলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু প্রমুখ নেতৃবর্গ দাবি করিলেন, তাঁহাদের সহিত আলোচনা করিয়া গান্ধীজির এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা দরকার ছিল। গান্ধীজি সবিনয়ে অথচ যথোচিত দৃঢ়তার সহিত তাঁহাদিগকে জানাইয়া দিলেন—আমি মানুষ হিসাবে উপবাস করিয়াছিলাম, কংগ্রেস কর্মী হিসাবে নহে। এইখানে গান্ধীজি নিজেকে সাধারণ রাজনৈতিক নেতার ঊর্ধ্বে তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন—ইহাকে আমরা মানবধর্ম বা মানবিকতা বলিতে পারি। আমরা ব্যক্তিস্বার্থ দলীয়স্বার্থের নিকট খর্ব করিতে শিখিয়াছি ; দলের স্বার্থ অপেক্ষা দেশের সামগ্রিক ও সার্বজনীন কল্যাণ বড় ইহাও স্বীকার করিয়াছি। কিন্তু খুব কম ক্ষেত্রে আচার-আচরণে তাহা রক্ষিত হয়। দেশ ও জাতির স্বার্থ অপেক্ষা বিশ্বমানবলোকের মঙ্গল অধিকতর কাম্য ইহা পৃথিবীর মানুষের আচরণে কদাচিৎ প্রকটিত হয়। সমস্ত মত ও পথ, দেশ ও কালের গণ্ডীর ঊর্ধ্বে মানবসত্য। তথাপি অনশনের জন্য গান্ধীজিকে নানা বিদ্রূপ বাক্য শুনিতে হইয়াছে।

অনশনের ভুল ও বিকৃত ব্যাখ্যা তো অহরহ হইয়া থাকে। মর্ম-বেদনা, মানবিক ধর্ম ও শুভকামনা হইতে যাহার উদ্ভব তাহাকে সুবিধা আদায়ের কৌশল বলিয়া অপপ্রচার করিতে অনেকে দ্বিধা করেন নাই। অনশনের দ্বারা কিছু চাপ সৃষ্টি হয় এবং এইজন্যই ইহার অপব্যবহারও কখন কখন হইতে পারে। মহাত্মাজি এ সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, অভীষ্ট সিদ্ধির বাসনা ত্যাগ করিলে অপব্যবহার সংকুচিত হইবে। প্রচলিত ব্যবস্থার দ্বারা যখন নির্দিষ্ট ঘটনার গতি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারা যায় না বা কোন কারণে ভ্রান্তি যখন প্রবল আকার ধারণ করে তখন প্রতিকারের উপায় হিসাবে অনশন অনুমোদিত হইয়াছে। কিন্তু গান্ধীজি বলিতেন—

ফললাভের জন্য আমি অনশন করিতে চাহি না। তবে একথাও সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছেন, অনশনের ফল আপনা আপনি উদয় হইয়া থাকে। মহাত্মা বলিতেন, অনশন করা প্রয়োজন বিবেচিত হইয়াছে করিয়াছি, অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে এই আশায় করি নাই। কিন্তু ফলের দ্বারা বিচার করিলেও দেখা যায়, গান্ধী-জীবনের প্রতিটি অনশনই সার্থক হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন—I have no recollections of a single experiment of mine in fasting having been fruitless effort. আমার অনশন ব্যর্থ হইয়াছে এমন একটি ঘটনাও মনে পড়ে না। হরিজন পত্রিকার (১৮-২-৩৬) লিখিলেন "সার্বজনীন হিতার্থে উপবাস করিলে উদ্বিগ্ন হইবার কারণ নাই। উপকার হইবে এই আশায় কিন্তু অনশন করা সমীচীন নয়। কেহ ইচ্ছা করুন আর নাই করুন, অনশনের পরিণাম বা ফল পাওয়া যাইবেই। কিন্তু সম্ভাবনা আছে ভাবিয়া কিছু করা অনুচিত।"

যাবতীয় মানবীয় বিধিব্যবস্থার মত উপবাসও সঙ্গত এবং অসঙ্গত উভয় ভাবেই প্রযুক্ত হইতে পারে। এ বিষয়ে অবৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতে গেলে উপবাসকারীর যেমন ক্ষতি হয় তেমনি ক্ষুণ্ণ হয় ইহার উদ্দেশ্য। ১৯৩৩-৩৪ সালে মেথর-পল্লীতে জনৈক কর্মী পল্লীবাসীদের পানদোষমুক্ত করিবার উদ্দেশ্য ঘোষণা করিয়া অনশন করেন। এমন ক্ষেত্রেও কার্যটি অসঙ্গত হইতে পারে। নির্ধারিত উপবাস সমাপ্ত হইলে গান্ধীজি চিঠি লিখিয়া জানাইলেন অনশন করা ঠিক হয় নাই। কারণ ইহার মূলে ছিল আহত অভিমান। অহিংসা চরমতম নম্রতার নামান্তর মাত্র। নম্র হৃদয়কে নম্রতর করিবার সাধনা ভিন্ন যথার্থ অনশন করা যায় না।

গান্ধী-জীবনে উপবাসের ন্যায় প্রায়োপবেশনও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল ইহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। অনশন যেমন সাধারণ্যে প্রচারিত ছিল, প্রায়োপবেশন তেমন ছিল না। তবে আশ্রমিকদের চিত্তে, কর্মীদের মধ্যে ও অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর উপর ইহার প্রভাব খুবই

কার্যকর হইত। ১৮ই মার্চ ১৯৩৯ হরিজন পত্রিকায় তিনি লিখিলেন ... "প্রায়োপবেশন" এক শক্তিশালী অস্ত্র। ইহা সকলে প্রয়োগ করিতে সক্ষম নন। ঈশ্বরে জ্বলন্ত বিশ্বাস না থাকিলে ইহা নিরর্থক হয়। অন্তরের অন্তঃস্থলে ইহার আবির্ভাব ঘটে। দক্ষিণ আফ্রিকায় এক বেলা আহার করিয়া ৪॥ মাস কাটান। বিহারের দাঙ্গার সময় তিনি দীর্ঘ দিন প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন। ইহার ফলে বিহার সরকার ও সেখানকার কর্মীগণ অন্যবিধ উদ্যোগ-আয়োজন ও প্রচেষ্টা ছাড়াই দাঙ্গা প্রশমনের ব্যাপারে অধিকতর উদ্যোগী ও যত্নশীল হইয়াছিলেন। প্রায়োপবেশনের দ্বারা আমরা সংযত হই, সংকল্পে দৃঢ় থাকিবার শক্তি লাভ করি।

গান্ধীজির উপবাসকে কবি বলিয়াছেন—"সে তো অনুষ্ঠান নয়, সে এক বাণী, চরম ভাষার বাণী।" অতীত পৃথিবীর বহু ভাষা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। গান্ধীজির এই চরম ভাষা আমাদের বোধগম্য নাও হইতে পারে। অনাগত দিনের মানুষ ইহার পাঠোদ্ধারে সমর্থ হইবেন—এই গান্ধী-বাণীর মধ্যে মানব মুক্তির সূত্র পাইবেন।

অনশন শেষে গান্ধীজির ইচ্ছা অনুযায়ী একটি করিয়া ছোট্ট অনুষ্ঠান হইত। এই অনুষ্ঠানে নানাধর্মের প্রার্থনা সঙ্গীত এবং ফল ও মিষ্টান্ন বিতরণ করা হইত। সেখানে গান্ধীজির নির্দেশে সেবক মেথর ও চাকরেরাও উপস্থিত থাকিবার আমন্ত্রণ পাইতেন। অনশনের দিন-গুলিতে তাঁহারা যে সেবা করিয়াছেন তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইত। সবশেষে গান্ধীজি একটি বাণী দিতেন এবং পরে সাধারণতঃ কস্তুরবা বা অন্য কোন মান্য প্রিয়জনের হাত হইতে লেবুর রস পান করিয়া অনশন ভঙ্গ করিতেন। সারা দেশ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিত।

সুন্দরতর পৃথিবী রচনাভিলাষী মানুষের নিকট গান্ধীজীবন চিরকাল অনুপ্রেরণার আধার হইয়া থাকিবেন এবং তাঁহার অহিংসা-সত্যাগ্রহ-প্রার্থনা-উপবাস ব্যক্তি জীবনের সীমা অতিক্রম করিয়া তাঁহারই প্রদর্শিত

পথে একদিন জন-জীবনে ও রাষ্ট্র-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং আমাদের এই ধূলার ধরণীতে স্বর্গ নামিয়া আসিবে।

ভাবীকালের মানুষকে পথ প্রদর্শনের জন্য গান্ধীজি বহুবার অনশন করিয়াছেন। একান্ত ব্যক্তিগত উপবাসগুলি বাদ দিয়া গান্ধীজির অনশনের একটি তালিকা সংকলন করিয়া আজিকার আলোচনা শেষ করিতেছি।

১। ১৯১৩। দক্ষিণ আফ্রিকা। ফোনিকস্ আশ্রম। ৭ দিন অনশন। এবং ৪॥ মাস একবেলা আহার। আশ্রমিকের নৈতিক পতনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত।

২। ১৯১৪। ঐ। ঐ। ১৪ দিন অনশন।

৩। ১৯১৮। ভারতবর্ষ। আমেদাবাদ। কাপড়-কলের ধর্মঘটী শ্রমিকদের হিতার্থে আমৃত্যু অনশন শুরু করেন। তিন দিনেই মিটিয়া যায়।

৪। ১৯২১। ঐ। বোম্বাই। প্রিন্স অব ওয়েলসকে স্বাগত জানানোকে কেন্দ্র করিয়া বোম্বাইয়ে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় তাহার নিরসনের জন্য ৪ দিন অনশন। (১৯শে নভেম্বর হইতে ২২শে নভেম্বর)।

৫। ১৯২৪। ঐ। দিল্লী। ২১ দিন। হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ করিয়া শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। ৮ই অক্টোবর তিনি অনশন ভঙ্গ করেন।

৬। ঐ। সবরমতী আশ্রম। ৭ দিন। ছাত্রদের নীতিহীন আচরণ সংশোধনের উদ্দেশ্যে ছিল এই অনশন।

৭। ১৯৩২। ঐ। যারবেদা জেল। আপ্পাসাহেব পট্টবর্দ্ধনের দাবির সমর্থনে অনশন। তিনি জেলের মধ্যে ধাঙ্গড়ের কাজ করিবার অধিকার দাবি করেন।

৮। ঐ। ঐ। হিন্দুসমাজকে বর্ণহিন্দু ও অবর্ণহিন্দু এই দুইভাগে বিভক্ত করিবার ব্রিটিশ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আমৃত্যু অনশন। আরম্ভ—

২০শে সেপ্টেম্বর সন্তোষজনক মীমাংসার ফলে ২৬শে সমাপ্ত হয়।

৯। ১৯৩৩। ঐ। ঐ। হরিজন-আন্দোলনে শক্তি সঞ্চারের জন্য ২১ দিনের অনশন। জেল-কর্তৃপক্ষ অনশন আরম্ভ হইবার পর গান্ধীজিকে মুক্তি দেন। মুক্তির পর তিনি পুণায় প্রাণকুঠিতে অবস্থান করিয়া অনশনের অবশিষ্ট দিনগুলি অতিবাহিত করেন।

১০। ১৯৩৩। ঐ। ঐ। গান্ধীজি তখন ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের ফলে জেলে। ঐখানে হরিজন-কর্ম করিবার অধিকার দাবি করেন। সরকার তাহা প্রত্যাখ্যান করিলে অনশন সুরু করেন। ৭ম দিনে মুক্তি পান।

১১। ১৯৩৪। ভারতবর্ষ। সেবাগ্রাম। আজমীরের জনসভায় জনৈক কুসংস্কারাচ্ছন্ন বর্ণহিন্দু একজন হরিজনকে প্রকাশ্যে আঘাত করে। ইহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ৭ দিনের অনশন।

১২। ১৯৩৯। ঐ। রাজকোট। শাসনকর্তার সহিত প্রজা-পরিষদের বিরোধে প্রজাদের সপক্ষে আমৃত্যু অনশন। বড়লাটের হস্তক্ষেপে চার দিনে সমাপ্ত।

১৩। ১৯৪৩। ঐ। আগা খাঁ প্রাসাদে বন্দী অবস্থায়। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরকারী অপপ্রচারের বিরুদ্ধে ২১ দিনের অনশন।

১৪। ১৯৪৭। ঐ। কলিকাতা। বেলেঘাটা। ১৫ই আগষ্ট। স্বাধীনতা দিবসটি গান্ধীজি উপবাসে কাটান। দেশ বিভাগের জন্য মর্মপীড়া হইতে এই অনশন বলিয়া অনুমিত।

১৬। ১৯৪৭। ঐ। কলিকাতা, বেলেঘাটা। হিন্দুমুসলমান দাঙ্গা নিরোধ ও সাম্প্রদায়িক শান্তি-স্থাপনের প্রয়াসের উদ্দেশ্যে আমৃত্যু অনশন সুরু করেন। কিন্তু অবস্থার উন্নতি ঘটায় ৪র্থ দিনের শেষে অনশন ভঙ্গ করেন।

• ১৬। ১৯৪৮। ঐ। দিল্লী। স্বাধীন ভারতবর্ষের সমগ্র রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও গান্ধীজি সাম্প্রদায়িক

সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য ১৩ই জানুয়ারি আমৃত্যু অনশন আরম্ভ করেন।

সাম্প্রদায়িক শান্তি ফিরিয়া আসিলে ১৮ই জানুয়ারি তিনি অনশন ভঙ্গ করেন।

ইহার মাত্র বার দিন পরে তিনি মরদেহ ত্যাগ করেন।

প্রার্থনা

মহাত্মা গান্ধীর প্রার্থনা তাঁহার মতই ভুবন বিখ্যাত হইয়া আছে। তিনি তাঁহার অন্তরের নিভৃত রাজ্যের নীরব প্রার্থনাটিকে দীর্ঘকাল যাবৎ সায়ংকালীন প্রার্থনা সভায় বাঙ্ময় করিয়া তুলিতেন এবং তাহা ছিল লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের বিচিত্র ও বিবিধ প্রেরণার উৎস। গান্ধীজির প্রার্থনা ছিলঃ ব্যক্তিজীবনের তপশ্চর্যাকে জনজীবনের মধ্যে প্রসারিত করিবার প্রচেষ্টা; ব্যক্তিগত সত্যনিষ্ঠা পবিত্রতা ও কল্যাণবোধকে সর্বজনের চিত্তে উদ্বোধন করা। এই আকাংখা হইতে গান্ধীজীবনের একক প্রার্থনা ভারতবর্ষে আসিবার পর সামুহিক প্রার্থনার রূপ ধারণ করে। দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থানকালেই গান্ধীজির জীবনে প্রার্থনার উদয় হইয়াছিল। তখন তিনি একাকী প্রার্থনা করিতেন।

১৯৪৬ সনে (১২ জানুয়ারি) একটি প্রার্থনা সভায় গান্ধীজি বলেনঃ "প্রার্থনা জীবন। যে মানুষ প্রার্থনা করেন না তিনি রিক্ত, নীরস।" ইহাই বোধহয় প্রার্থনার মর্মকথা। অন্যত্র পাই, "প্রার্থনাই আমার (গান্ধীজি) প্রাণ বাঁচাইয়াছে। ইহা না হইলে অনেকদিন আগে পাগল হইয়া যাইতাম।......সময়ে সময়ে হতাশ হইয়া পড়িতাম। সেই হতাশার ভাব কাটাইয়া উঠিয়াছি শুধু প্রার্থনার জন্য।" গান্ধী মহাজীবনের কর্মে এই প্রার্থনার প্রভাব খুব

সহজেই অনুভব করা যাইত। দীর্ঘকাল প্রার্থনাশীল জীবন যাপন করিয়া নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের আলোকে তাঁহার যে সত্যদর্শন হইয়াছিল তাহাই জীবন সায়াহ্নে এখানে ব্যক্ত করিয়াছেন। গান্ধীজি নিজেকে সাধারণ মানুষ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। কিন্তু স্বীয় সাধু সংকল্পের দৃঢ়ভূমিতে দাঁড়াইয়া নির্ভয়ে যে বিপুল ও বিস্ময়কর পরিশ্রম করিয়াছেন তাহার দ্বারাই তিনি জগৎবরেণ্য হইয়াছেন। প্রার্থনার প্রভাবে তিনি সাধুসঙ্কল্পে দৃঢ় থাকিতে পারিয়াছেন, পরিশ্রম করিতে সমর্থ হন। প্রার্থনা-সভার প্রবেশ পথে তাঁহার আত্মোৎসর্গ ভারতবাসীর পক্ষে এক অতীব মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। ইহা বর্তমান শতকের শোচনীয়তম শোকাবহ ঘটনা। তথাপি প্রার্থনাভূমিতে মহাপ্রয়াণ বোধহয় নিরন্তর প্রার্থনাশীল গান্ধী-জীবনের যুক্তিসিদ্ধ পরিণতি ; পূর্ণাহুতি।

ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকায় (২রা সেপ্টেম্বর ১৯২৪) গান্ধীজি লিখিলেন— No act of mine is done without prayer. প্রার্থনা ছাড়া আমার কোন কাজ হয় না। ইহা তো আমাদের সকলেরই কথা। প্রার্থনাশীল চিত্তই হইতেছে বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি। মন একান্ত অহমিকাচ্ছন্ন ও মূঢ় হইলেই প্রার্থনা বিমুখ হয়। আবার গান্ধীজির কথায়ও পাই : What he may regard as answer of prayer may be echo of his pride. অনেক সময় যখন মনে হয় ভগবান প্রার্থনায় সাড়া দিয়াছেন তখন হৃদয়ের অন্তরালে অহমিকাই হয় তো উঁকি দেয়। নীরবে নত হইয়া আমাদের মনোরাজ্যে অনুসন্ধান করিলে এ কথা সহজেই বুঝিতে পারি—গর্বোদ্ধত অহমিকা হইতে মুক্ত ও কর্তব্যনিষ্ঠ হইতে হইলে প্রার্থনা অপরিহার্য।

প্রার্থনা আধ্যাত্মিক সাধনার সহিত জড়াইয়া রহিয়াছে। গান্ধীজি বলিতেন প্রার্থনা আত্মশুদ্ধির উপায়। দেহ রক্ষার জন্য যেমন আহার্যের দরকার তেমনি আত্মার জন্য প্রয়োজন প্রার্থনার। বিক্ষুব্ধ চিত্ত শান্ত হয় প্রার্থনায়। গান্ধীজি অকপটে স্বীকার করিয়াছেন

নানা অশান্ত আবর্তে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিয়াও তাঁহার চিত্তে যে অখণ্ড শান্তি বিরাজ করিত ইহার একমাত্র কারণ ঐ প্রার্থনা। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনা সঙ্গীতগুলি তাহার অতিপ্রিয় ছিল।

প্রার্থনা আমরা সকলেই করিয়া থাকি। প্রার্থনা মানে চাওয়া। ক্ষমতাবানের নিকট নিত্য কত প্রার্থনাই না আমরা করিতেছি। ধন চাই, মান চাই, জন চাই, চাকরি চাই, বিচার চাই, প্রতিকার চাই। কখন মানুষের নিকট যুক্তকরে নত হইয়া চাই; সেটা ভিক্ষা। কখন আপন কৃতকার্মের জোরে চাই; সেটা হক পাওনা, দাবি। অপর দিকে দেবতার পাদপদ্মে অঞ্জলি দিয়া জয়ং দেহি, যশো দেহি—যখন বলি তখনও, কেহ বা জয় এবং যশের উপযুক্ত করিয়া নিজেকে গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছি, কেহ বা নিজের যোগ্যতার কথা না ভাবিয়া ভগবানের অলৌকিক শক্তির উপর নির্ভর করিতেছি। আবার জৈব প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে মানুষের একটি দ্বিতীয় জীবন আছে—অমৃত জীবন। রূপ-রস-গন্ধ, প্রেম-ভক্তি-ভালবাসামণ্ডিত সে জীবন। প্রার্থনার মঙ্গল-আলোকে তাহা সত্য-শিব-সুন্দরের অমৃতময় ভূমিতে উত্তীর্ণ হয়। আমাদের প্রতিদিনকার জৈব জীবন সাধনায়, লোক-ব্যবহারে এই অমৃত সাধনার সচেতন স্পর্শ আমরা সুনিয়ন্ত্রিত প্রার্থনার দ্বারাই লাভ করিতে পারি।

বালক বয়সে মহাত্মা গান্ধী দাসী রম্ভার নির্দেশে রাম নাম জপ করিয়া ভূতের ভয় মুক্ত হইয়াছিলেন। প্রার্থনা ভীরু হৃদয়ে সাহস সঞ্চার করিল। এ রকম অভিজ্ঞতা আমাদের সকলেরই অল্প বিস্তর আছে। পরবর্তী জীবনে গান্ধীজি সচেতনভাবে প্রার্থনা-নির্ভর হইয়াছিলেন। কিন্তু আমরা হই না। আমরা বিপদে পড়িলে হে ভগবান রক্ষা কর বলি বা মানত করি, কিন্তু নিত্য নিয়মিত নম্র প্রার্থনার দ্বারা জীবন নিয়ন্ত্রিত কদাচিত করিয়া থাকি।

দক্ষিণ-আফ্রিকাতেই গান্ধী-জীবনে সচেতন প্রার্থনার উদয় হয়। কিন্তু ইহা একটি সুনির্দিষ্ট সুষ্ঠু ও সর্বজনীন রূপ পায় বহু বৎসর পরে।

ব্যক্তিগত প্রার্থনা লইয়া বিশেষ কোন সমস্যা নাই। মানুষ তাহার রুচি, প্রয়োজন ও প্রবণতা অনুসারে প্রার্থনা পদ্ধতির অনুসরণ করিবেন — সেখানে কাহারো কিছু বলিবার নাই—কাহারো কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই ; ইহা একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনার কল্যাণ বা মোক্ষলাভের মধ্যেই ইহা সীমিত। কিন্তু গান্ধীজি তো কখন নিজেকে লইয়া বিব্রত থাকেন নাই। তিনি মনে করিতেন আমরা সামাজিক জীব বলিয়া নিজের মোক্ষলাভেই মাত্র সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না। মূলতঃ এই বোধ হইতেই তিনি সকলের সঙ্গে একত্রে সমবেত প্রার্থনা—অনুষ্ঠানের প্রয়োজন বোধ করেন।

মহাত্মা গান্ধীর দিনের কাজ আরম্ভ হইত প্রার্থনা-অনুষ্ঠানের দ্বারা। গান্ধীজির কথায়, আমরা যখন নিদ্রা হইতে জাগরিত হই তখনই আমাদের দিনের সুরু হয়। গান্ধীজির দিন আরম্ভ হইত রাত্র ৩৷৷০ টায়। তখনই প্রার্থনা। সাধারণতঃ আশ্রম-পরিবারের লোকজনই ইহাতে যোগদান করিতেন। কখন কখন আশ্রমে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও উপস্থিত থাকিতেন। এক রাত্রে রবীন্দ্রনাথ সবরমতী আশ্রমে উপস্থিত। শেষ রাত্রের প্রার্থনায় যোগদান করা কবির পক্ষে কষ্টকর হইতে পারে বিবেচনা করিয়া গান্ধীজি কবিকে বলেন—আপনার ভোরের প্রার্থনায় যোগদান করিয়া কাজ নাই। মাহাত্মার নিষেধ কবি শুনেন নাই। তিনি ঐ প্রার্থনাসভায় যোগদান করেন এবং গান গাহিয়া শোনান। "অন্তর মম বিকশিত কর অন্তরতর হে"—কবি কর্তৃক ঐ প্রার্থনা সভায় গীত এই গানটির বহু উল্লেখ পাওয়া যায় গান্ধী রচনায়। রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনা-সঙ্গীত গান্ধীজির খুব প্রিয় ছিল। "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে"—গানটি এবং তাঁহার এমন আরও অনেক গান গান্ধীজিকে বিশেষ অনুপ্রেরণা দান করিত। ৪৫-৪৬ সনে গান্ধীজি যখন সোদপুরের খাদি প্রতিষ্ঠানে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন তখন অপরাহ্ণের প্রার্থনাসভায় প্রতিদিন রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনের ব্যবস্থা ছিল। গান্ধীজি যাহাতে গানগুলি

ভাল করিয়া অনুধাবন করিতে পারেন সেজন্য একটি অভিনব পদ্ধতি অনুসৃত হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনা-সঙ্গীতগুলি গান্ধীজির খুব প্রিয় ছিল। এগুলি সম্যকরূপে অনুধাবন করিতে আগ্রহী হইয়া তিনি প্রতিদিনকার নির্বাচিত সঙ্গীতগুলিকে দেবনাগরী হরফে রূপান্তরের নির্দেশ দেন এবং হিন্দীতে ইহার মর্মানুবাদও লিখিয়া দিবার জন্য বলেন। শ্রীযুক্ত রতনমণি চট্টোপাধ্যায়ের ব্যবস্থায় দেবনাগরী হরফে সেই গানগুলি ও তাহার হিন্দী অনুবাদ প্রতিদিন কলিকাতাস্থ শক্তি প্রেসে মুদ্রিত হইয়া সোদপুরে প্রেরিত হইত। একখানি কাগজের একদিকে দেবনাগরী হরফে বাঙলা রবীন্দ্র-সঙ্গীত অপর দিকে ঐ হরফেই তাহার হিন্দী তর্জমা। অনেকগুলি এই রকম মুদ্রিত কাগজ আমি রতনদার নিকট দেখিয়াছি। কে এই হিন্দী তর্জমা করিয়াছিলেন তাহা জানিতে পারি নাই। অনুবাদকের নাম রতনদা মনে করিতে পারেন নাই।

হিন্দী অংশের তলায় লেখা আছে ঃ "মহাত্মা গান্ধীজিকে সোদপুর খাদী প্রতিষ্ঠান মেঁ রহনেকে সময় শামকী প্রার্থনা মেঁ গায়ী গয়ী হৈ।"

ভোরের প্রার্থনার সুরু হইত একটি জাপানী মন্ত্র দিয়া -নম্যো হো রেঙ্গে ক্যো। যাঁহারা জ্ঞানের আলোক লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের নমস্কার করি। অন্ধকার হইতে আলোকে উত্তীর্ণ হইবার সাধনাই মানব-সভ্যতার ইতিহাস। তমসো মা জ্যোতির্গময় ভারত-আত্মার প্রার্থনা। সুতরাং সেই আলোক যাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের নমস্কার করিয়া দিবসারম্ভ, ইহা অপেক্ষা সুন্দর উপাসনা আর কি হইতে পারে? ইহার পর দুই মিনিট নীরবতা পালন করা হইত। সেই সময়ে গান্ধীজি মালা জপ করিতেন। জাপানী স্তোত্রটির একটি সুন্দর ইতিহাস আছে। ১৯৩৬ সনে মগনলবাড়িতে জনা বার জাপানী সাধু গান্ধীজির দর্শনে আসেন। দর্শনার্থী দলের নেতার আগ্রহে তাঁহার দুই শিষ্যকে পরে গান্ধীজি আশ্রমে থাকিবার অনুমতি দেন ইহার একজন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ইংরেজ কর্তৃক বন্দী হইবার পূর্বক্ষণ।

পর্যন্ত আশ্রমে ছিলেন। এই ব্যক্তি সর্বদাই গভীর নিষ্ঠা সহকারে শৃঙ্খলা ও সময়ানুবর্তিতার সহিত সাগ্রহে সর্বকার্য সম্পন্ন করিতেন। তিনি কাজকর্মের অবসবে ঢোলক বাজাইয়া জাপানী ভাষায় ভজন গান করিয়া বেড়াইতেন। গানটি ছিল নম্যো হো বেঙ্গে ক্যো। গানের অন্তরেব কথাটি গান্ধীজির হৃদয় স্পর্শ করে এবং তিনি এটিকে প্রার্থনায় প্রথম স্থান দান করেন। সকাল সন্ধ্যা উভয় প্রার্থনাতেই এই জাপানী প্রার্থনা মন্ত্রটি উচ্চারিত হইত। প্রার্থনাব দ্বিতীয় মন্ত্র ছিল একটি সংস্কৃত মন্ত্র —ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোক -

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যসিদ্ধনম্।

এই পৃথিবীতে যাহা কিছু নশ্বব তাহার সমস্তকেই পবমেশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদন করিতে হইবে। সেই নিমিত্তই ত্যাগের দ্বারা সমস্তই উপভোগ কবিবে, অর্থাৎ সমস্তই তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া ভোগ কবিবে। কাহাবো ধনে লোভ কবিও না। ইহাব পর অন্যান্য স্তোত্রাদি ক্রম অনুসাবে আবৃত্তি কবা হইত। তদন্তব ভজন। শেষ ভজনটি ছিল বিখ্যাত বামধুন। বামধুন গীত হইবাব সময় গান্ধীজি কখন কখন যোগদান কবিতেন। যখন নিজে গাহিতেন না তখন তালি বাজাইয়া তাল দিতেন। প্রভাতকালীন প্রার্থনার আর একটি বিখ্যাত ভজন "বৈষ্ণব জন তো তেনে কহিয়ে জে পীড় পরাঈ জানে বে'—বৈষ্ণব তিনিই যিনি পরের দুঃখ অনুভব কবিতে পাবেন। রামধুনের পব গীতা পাঠ হইত। গীতা পাঠের জন্য উচ্চারণের বিশুদ্ধতা গান্ধীজি অতিশয় প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিতেন।

ভোরের প্রার্থনার সময় আশ্রমবাসীদেব কে কি পরিমাণ সূতা কাটিয়াছেন তাহা জানাইবার রীতি ছিল। একখানা খাতা হইতে রোল কলের ন্যায় নাম ডাকা হইত। উদ্দিষ্ট ব্যক্তি সূতা কাটার পরিমাণ বলিতেন এবং তাহা লিখিয়া লওয়া হইত। সভায় আশ্রম-বাসী কেহ উপস্থিত না হইলে গান্ধীজি অনুপস্থিতির কারণ অনুসন্ধান

করিতেন। ব্যক্তিগতভাবে সকলেরই সুখদুঃখের তিনি খোঁজ রাখিতেন। প্রত্যেকেরই সুবিধা অসুবিধার প্রতি তাঁহার স্নেহশীল জাগ্রত দৃষ্টি ছিল। কিন্তু একান্ত আলস্য বা অমনোযোগিতার জন্য কেহ প্রার্থনা-সভায় যোগদান করিতে বিরত হইলে গান্ধীজি দুঃখিত হইতেন। জনৈক আশ্রমবাসীর অনুপস্থিতির উপর গান্ধীজির মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া মনুবেন লিখিয়াছেন—Perhaps it is my fault. Otherwise after having come here with great interest, why should he not participate in the prayer, important as the prayer is? অপরে প্রার্থনার স্থলে অনুপস্থিত হইয়াছেন কিন্তু ত্রুটি গান্ধীজির! সকলের অকৃতির জন্য আশ্রম-পতি নিজেকে দায়ী করিতেছেন। অপরের ত্রুটি সংশোধন করিবার পূর্বে নিজের ত্রুটির অনুসন্ধান আমরা ক'জন করিয়া থাকি? এখানেও গান্ধীজি অতুলনীয়। সার্থক প্রার্থনা ভিন্ন মানুষ বোধ হয় কখনই এত উচ্চ স্তরে উপনীত হইতে পারে না।

গান্ধীজির দিনচর্যায় প্রার্থনার একটি সুনির্দিষ্ট স্থান ছিল তাহা সকলেই আমরা জানি। কিন্তু ইহার গুরুত্ব সম্পর্কে সাধারণতঃ খেয়াল করি না। সংশয়-সন্দেহ-নৈরাশ্য এবং অভিমান-আশঙ্কা-অসন্তোষের পীড়নে আমাদের জীবন প্রায় প্রতিনিয়তই ক্ষত বিক্ষত হইতেছে। সেই ক্ষত যাহাতে বিপুল ক্ষতি করিতে না পারে তাহার জন্য মানুষকে প্রার্থনার দ্বারস্থ হইতে হয়। প্রার্থনা শক্তি সঞ্চার করে, ভয় দূর করে; ইহা আমাদের অভীষ্টসিদ্ধির ব্রতে অবিচলিত রাখে। অপর দিকে প্রার্থনার প্রসাদে বিশ্বাস জলন্ত হয়, আদর্শ অনির্বাণ থাকে। আর ঐ বিশ্বাস এবং আদর্শবোধের প্রভাবে আমরা সত্য ও মঙ্গলের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হই এবং আনন্দময় কল্যাণকর্মে ব্রতী থাকিবার শক্তি পাই। মহাত্মা গান্ধীর মত ও পথের অন্যতম সার্থক উত্তরসুরী বিনোবাজি স্নান আহার ও নিদ্রার সহিত প্রার্থনার তুলনা করিয়া বলিয়াছেন—"এ তিনের যে যে গুণ প্রার্থনারও সেই গুণ আছে।

নিদ্রা হইতে মানুষের উৎসাহ ও বিশ্রামলাভ হইয়া থাকে। প্রার্থনা হইতে লাভ কবি মনের বিশ্রাম ও উৎসাহ। আহারে শরীরের পোষণ হয়। প্রার্থনাব দ্বারা মনের পোষণ হয়। স্নানে হয় শরীরের শুদ্ধি ; মনের শুদ্ধি হয় প্রার্থনায়।”

প্রার্থনা আরম্ভ কবিবার পূর্বে মনকে প্রস্তুত করিবার জন্য কয়েক মিনিট নীরবে নত হইয়া থাকিবার বিধান আছে। গান্ধীজি বলিতেন ‘দো মিনিটকী শান্তি।’ এই প্রকার মৌন মুহূর্তে মানুষ তাহার মনের গোপনতম ইচ্ছা ও প্রবণতার মুখোমুখি আসিয়া দাঁড়ায়। নিজেকে সে পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিবাব অবকাশ পায়। আমাদের চিন্তা ও আচরণেব ত্রুটি ঐ মুহূর্তে সহজে ও সম্পূর্ণরূপে নিজের নিকট অবাবিত হয়, আমরা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই ত্রুটি কোথায়, বিচ্যুতি কি। আর তখনই মাত্র প্রার্থনা আমাদিগকে নূতন উদ্যমে ত্রুটিহীন চিন্তা ও কর্মে প্রবৃত্ত হইতে সাহায্য করে। প্রার্থনাব দ্বাবা আমবা নিত্য নবজন্ম প্রাপ্ত হই। সামান্য সময়ের প্রার্থনা জীবনে কি করিয়া অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে সে বিষয়ে বিনোবাজির একটি চমৎকাব উক্তি এখানে স্মবণ করা যাইতে পারে: দিনে দশ পনব মিনিটের আহাব দ্বারা আমরা পুষ্টি লাভ করি ; তাহাতেই দেহ বাঁচে। প্রার্থনাব সময় দশ মিনিটে আমরা যে প্রার্থনা কবি তাহাব দ্বাবা মন শান্ত হয়, আমরা ত্রুটি মুক্ত হইয়া কল্যাণব্রতে ব্রতী হইবার শক্তি পাই। প্রার্থনার আসনে বসিয়াই আমরা বিশ্বজনীন ভগবদ্‌শক্তি যেমন অনুভব করিতে পারি, তেমনি অতি সহজে বিশ্বমানবের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া নিজেদের চিনিতে পাবি। সুতবাং ঐ দশ মিনিটেব প্রার্থনার মূল্য যে অসামান্য ইহা স্বীকাব করিতেই হইবে।

সান্ধ্যকালীন প্রার্থনা গান্ধীজির শেষ জীবনে বিশেষ আকর্ষণের বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। প্রার্থনান্তিক ভাষণে তিনি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ছোট বড় সকল বিষয়ে তাঁহার মতামত জ্ঞাপন করিতেন। অহিংস-অসহযোগের উদ্‌গাতা এবং ভারতীয় মহাজাতির অবিসম্বাদী

নেতা গান্ধীজির মুখনিঃসৃত প্রত্যেকটি কথা সারা বিশ্বের মানুষ উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেন। স্বাধীনতার পর বেতারে প্রার্থনা-ভাষণ প্রচারিত হইত। এই দিক দিয়া প্রার্থনা সভা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠে। প্রার্থনা-সভার কার্যক্রমের একটা সূচী গান্ধীজি নিজে রচনা করেন। প্রত্যূষের প্রার্থনার জাপানী মন্ত্র এবং উপনিষদের স্তোত্র বৈকালিক সভায়ও আবৃত্তি করা হইত। ইহার পরে পঠিত হইত যথাক্রমে গীতার স্থিতপ্রজ্ঞের শ্লোকগুলি, কোরাণ এবং জেন্দ আভেস্তা। সৈয়দ আব্বাস তোয়েবজির নাতনী গান্ধী-আশ্রমে কোরান শিক্ষা দিতেন। তাঁহার আগ্রহে কোরান হইতে তাঁহারই নির্বাচিত বয়াৎগুলি প্রার্থনা-সূচীতে যুক্ত হয়। জেন্দ আভেস্তার মন্ত্রগুলি বাছিয়া দেন ডাক্তার গিল্ডার। ইহার পর ভজন এবং স্থানীয় ভাষায় ভক্তিমূলক গান গাওয়া হইত। শেষ হইত রামধূন দ্বারা। রামধূন গীত হইবার সময় শ্রোতারা হাততালি দিয়া প্রার্থনায় সক্রিয়ভাবে যোগদান করুন ইহা গান্ধীজি পছন্দ করিতেন। এ জন্য গান্ধী শিবিরের কর্মীরা কখন কখন শ্রোতাদের পূর্বাহ্ণে তালিম দিতেন। কাঁথিতে খাদি প্রতিষ্ঠানের শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত ও গান্ধীজির আশ্রম পরিবারের কানু গান্ধীকে এই রকম তালিম দিতে দেখা গিয়াছে। কাঁথিতেই বোধ হয় গান্ধীজি (১৯৪৬ সনে) বিদ্যালয়ে প্রার্থনা প্রবর্তনের কথা বলিয়াছিলেন।

প্রার্থনাসভায় কোরান পাঠ লইয়া নানা স্থানে ধর্মান্ধ ব্যক্তিরা আপত্তি করিতেন। কোরান পাঠে কোথায়ও হিন্দু, কোথায়ও বা মুসলমানেরা বিরোধিতা করিয়াছেন। এই রকম আপত্তির সম্মুখীন হইলে তিনি প্রার্থনাই বন্ধ করিয়া দিতেন। দিল্লীতে এক প্রার্থনা সভায় (১৮।৯।১৯৪৭) তিনি এ বিষয়ে বলেন—"কোরানের স্তোত্র আবৃত্তিতে যদি একজনও আপত্তি করে তবে প্রকাশ্যে আমি প্রার্থনা করিব না। আবার এ কথাও আপনাদের মনে রাখিতে হইবে যে, বুঝিয়া সুঝিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া যে সব স্তোত্র প্রার্থনায় যুক্ত করা হইয়াছে তাঁহার কোন অংশ আমি বাদ দিতে পারি না।" প্রার্থনা

সভায় তিনি তর্ক বিতর্ক করিতে স্বীকৃত হইতেন না। ভদ্ররীতির দোহাই দিয়া বলিতেন, "যাহারা কোরান আবৃত্তি সহ সমগ্র প্রার্থনা সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করেন তাঁহারাই মাত্র সভায় (প্রার্থনা সভায়) আসিবেন।"

প্রার্থনাসভায় বে-আদপি গান্ধীজির অসহ্য ছিল। মনু গান্ধী ওআভা গান্ধী প্রার্থনাসভায় বেসুরো ভজন শুনিয়া একদিন সশব্দে হাসিয়া ফেলেন। সেজন্য অবশ্য অচিরাৎ তাঁহারা প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিন্তু গান্ধীজির মনে হয় "মহিলাদ্বয় প্রার্থনার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।" সেজন্য তিনি ক্ষুব্ধও হন প্রার্থনা সভায় ভাষণ দিবার সময় তিনি বলেন "রাগ করিয়াছিলাম নিজের উপর। কারণ আমার কাছে থাকিয়া মানুষ হইলেও আমি উহাদের এই শিক্ষা দিতে পারি নাই যে, প্রার্থনাকালে তদ্‌গত হইয়া নিজেদের ভগবানে সমর্পণ করিয়া দিতে হয়।" প্রার্থনাশীল চিত্ত বোধ হয় অপরের দোষ অনুসন্ধানে কালাতিপাত না করিয়া নিজের দোষ শোধরাইতে সচেষ্ট হয়। পূর্বেও গান্ধীজির আচরণে ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

প্রার্থনার শেষে গান্ধীজি হিন্দীতে যে আলোচনা করিতেন বাঙলা দেশে শ্রোতাদের তাহা বাঙলা ভাষায় তর্জমা করিয়া দিতেন শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত এবং কখন কখন অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু। গান্ধীজি বলিয়াছেন "প্রার্থনান্তিক ভাষণগুলি প্রার্থনারই অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে শুনিতে ও বুঝিতে হইবে।" গান্ধীজি মিতভাষী ছিলেন। তাঁহার বাক্যগুলি ছিল সংক্ষিপ্ত। স্বল্পতম শব্দে তিনি ভাব প্রকাশ করিতেন। ইহার ভাষান্তর করা খুবই কঠিন কাজ। ভ্রম প্রমাদ এড়াইবার জন্য প্রার্থনা সভায় বক্তৃতার লিখিত নোট গান্ধীজি দেখিয়া দিবার পর সংবাদ পত্রাদিতে প্রকাশের জন্য দেওয়া হইত। স্বাধীনতার পর প্রার্থনান্তিক ভাষণ বেতারে প্রচারের ব্যবস্থা হয় একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

গান্ধীজীবনে প্রার্থনা কখন বন্ধ হয় নাই। যেখানে যে অবস্থায়

থাকিয়াছেন তাহার মধ্যেই প্রার্থনার আয়োজন করিয়া নিতেন। কোন কোন দিন প্রার্থনা সভায় হয়ত দু পাঁচজন লোক থাকিতেন আর কোন দিন বা হাজার হাজার মানুষ। স্বাধীনতার প্রাক্কালে দাঙ্গাবিধ্বস্ত কলিকাতায় বেলিয়াঘাটার হায়দরি ম্যানশনে তিনি যেদিন আসেন সেদিন প্রার্থনাসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল গৃহাভ্যন্তরে; বাহিরের কেহই উপস্থিত ছিলেন না। কয়েকদিনের মধ্যেই প্রার্থনা-সভায় লক্ষ লোকের উপস্থিতি দেখা গিয়াছিল। ইহাই গান্ধীজি! প্রয়োজনে তিনি মহিলাদের জন্য পৃথক সভায়ও যোগদান করিয়াছেন।

গান্ধীজির আকাংখা ছিল আমরা সকলেই নিজ নিজ পরিবারের শিশু ও অন্যান্যদের লইয়া নিত্য প্রার্থনা করি। তাঁহার যে একাদশ মহাব্রত মন্ত্রটি প্রার্থনায় উচ্চারিত হইত তাহা হইল :

"অহিংসা সত্য অস্তেয় ব্রহ্মচর্য্য অসংগ্রহ।
শরীর-শ্রম অস্বাদ সর্বত্র ভয়বর্জন॥
সর্বধর্মী সমানত্ব স্বদেশী স্পর্শ-ভাবনা।
হী একাদশ সেবাবী নম্রত্বে ব্রত নিশ্চয়ে॥"

প্রসঙ্গত স্মরণ করা যাইতে পারে রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ যুগপ্রবর্তক মনীষিগণ প্রার্থনাশীল জীবনযাপন করিতেন। সকল ধর্মেই প্রার্থনার প্রয়োজনীতা স্বীকৃত। ইহা হইতেই বুঝা যায় ব্যক্তি-জীবনেও প্রার্থনা অপরিহার্য। ব্যক্তির সামগ্রিক উন্নতি ভিন্ন দেশ বা জাতির প্রকৃত মুক্তি হইতে পারে না। খাঁটি মানুষ হইবার জন্য প্রত্যেককেই চেষ্টা বা সাধনা করিতে হয়। সাধনার সোপান হইল প্রার্থনা। গান্ধী-শতাব্দীতে আমরা গৃহে গৃহে গান্ধীজির প্রার্থনা-মন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তনে যদি প্রয়াসী হই তাহা হইলে দেশে নূতন মানুষ হইবে, সে মানুষের উপর নির্ভয়ে নির্ভর করা চলিবে। অতএব পারিবারিক প্রার্থনা পুনঃপ্রবর্তন হোক আমাদের গান্ধী শতবর্ষের প্রার্থনা।

বা ও বাপু

প্রকৃত প্রস্তাবে আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের উচ্চনীচ শিক্ষিত অশিক্ষিত কোটি কোটি মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে শ্রদ্ধা ও প্রীতির স্বতোৎসারিত সুষমার দ্বারা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী হইয়াছেন মহাত্মা গান্ধীজি ও বাপু ; কস্তুরবাঈ হইয়াছেন কস্তুরবা অথবা কেবলমাত্র 'বা'। আমাদের দেশে এমন নজীর বিরল। স্মরণকালের মধ্যে আর একটি দম্পতিকে আমরা ভালবাসা ও ভক্তির আবেগে নূতনতর সম্বোধনে পূজা করিয়াছি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব হইয়াছেন ঠাকুর বা পরমহংসদেব ; মাতা সারদামণি হইয়াছেন শ্রীশ্রীমা। ঠাকুর ও শ্রীমা এবং বাপু ও বা এই দম্পতিদ্বয়ের জগৎ পৃথক। তথাপি ঘটনাটির মধ্যে যে ঐক্য রহিয়াছে তাহার ভিত্তি বোধ হয় এক। গান্ধীজি যদি সাধুসন্তের ন্যায় জীবনযাপন না করিতেন, কস্তুরবা যদি নীরবে গান্ধীজির সাধনা ও কর্মের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য আপনাকে তিল তিল করিয়া নিঃশেষে উৎসর্গ না করিতেন তাহা হইলে তাঁহারা জন-হৃদয়-তন্ত্রীতে এমন সার্বজনীম আনন্দধ্বনি তুলিতে সমর্থ হইতেন বলিয়া মনে হয় না।

বা অর্থাৎ মাতা। যুগল জীবনের প্রারম্ভকালে গান্ধীজি স্ত্রীকে কস্তুরবাঈ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শেষের দিকে শুধু মাত্র 'বা'

বলিতেন। কস্তুরবাঈও পূর্বে অনেক স্থলে গান্ধীজিকে বুঝাইতে গিয়া 'ছেলেদের বাবা' বলিয়াছেন। পরবর্তীকালে তিনিও বাপু বলিতেন। বাপু মানে পিতা। এই পরিবর্তন লক্ষণীয়। ইহা সচরাচর ও সহজে ঘটে না। শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক সারদামণিরপূজার কথাটি এই কথায় মনে পড়ে।

পোরবন্দরে মোহনদাস আর কস্তুরবাঈয়ের বাড়ী ছিল পাশাপাশি। কস্তুরবাঈয়ের পিতা গোলকদাস মাকানজি ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। মোহনদাস গান্ধীর পিতৃদেবের সামাজিক মর্যাদা ছিল। ব্যবসায় না থাকিলেও অর্থাদি একেবারে কম ছিল না। তাহা যদি না হইত তবে তাঁহার মৃত্যুর পরেও এই পরিবার গান্ধীজিকে বিলাত পাঠাইয়া ব্যারিষ্টার করিয়া আনিবার ব্যয় নির্বাহ করিতে সমর্থ হইত না। সে সময়ের প্রচলিত রীতি অনুসারে খুব অল্প বয়সে ইঁহাদের বিবাহ হয়। উভয়ে সম বয়সী ছিলেন। গান্ধীজি তখন স্কুলের ছাত্র। বিবাহের পূর্বে উভয়ের সঙ্গে পরিচয় ছিল ; শিশুকালে তাঁহারা একত্রে খেলাধূলাও করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। দীর্ঘ ৬০ বৎসরেরও অধিককাল ইঁহারা দাম্পত্য-জীবন যাপন করেন। ১৯৪৪ সনে ইংরেজ সরকারের বন্দী অবস্থায় কস্তুর-বা পরলোক গমন করেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকায় অখ্রীস্টান বিবাহিতা স্ত্রীর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার আন্দোলনের সময় 'বা' বলেন জেল হইতে তিনি জীবন্ত ফিরিবেন না। ৩০ বৎসর পরে তাঁহার সে কথা সত্য হইল। গান্ধীজিও তখন বন্দী। তাঁহার কোলে মাথা রাখিয়া তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ভারতীয় হিন্দু নারীর ইহা অপেক্ষা অধিক কাম্য কিছু নাই। কস্তুর-বার শেষকৃত্য (২২-২ ১৯৪৪) সমাপ্ত করিয়া আসিয়া গান্ধীজি কতকটা স্বগতোক্তির ন্যায় বলেনঃ বা ছাড়া আমি জীবন কল্পনা করিতে পারি না। তাঁহার পরলোকগমনের ফলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হইল তাহা পূর্ণ হইবার নহে। …ষাট বৎসর আমরা একত্রে জীবন যাপন করিয়াছি। আমার কোলে শুইয়া তিনি চলিয়া গেলেন। ইহা অপেক্ষা সুন্দর আর কি হইতে পারিত!" সুখ দুঃখ দ্বন্দ্ব কোলাহলের কর্মতরঙ্গসঙ্কুল জীবনে

কস্তুরবা গান্ধীজির সহিত প্রায় ছায়ার মত ফিরিয়াছেন। বস্তুতঃ বিলাতে ব্যারিষ্টারি পড়া এবং প্রথম দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রার সময় ভিন্ন তাঁহাদিগকে দীর্ঘ বিচ্ছেদ ভোগ করিতে হয় নাই। কস্তুরবার মৃত্যুর পর তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ওয়াভেল গান্ধীজিকে একটি শোকবার্তা পাঠান। তাহার উত্তরে তিনি লেখেন—I felt the loss more than I had thought I should....... We were a couple outside the ordinary...We ceased to be two different entities......The result was that she became truly my better half, কস্তুরবার মৃত্যুতে যতটা দুঃখ বোধ হইবে গান্ধীজি অনুমান করিয়াছিলেন, বস্তুতঃ তদপেক্ষা বেশী শোকাভিভূত হইয়া পড়েন। নিজেদের তিনি সাধারণ দম্পতি হইতে পৃথক বলিয়াছেন এবং প্রকৃত অর্থেই কস্তুরবা তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্ধাঙ্গ রূপে পরিণত হন।

কস্তুরবা মৃত্যুর পূর্বে বেশ কিছুদিন রোগভোগ করেন। রোগশয্যায় গান্ধীজি প্রায় সর্বক্ষণ উপস্থিত থাকিতেন। মৃত্যু যখন অবধারিত মনে হইয়াছিল তখন কলকাতা হইতে বিমানে করিয়া আনা সে সময়কার দুর্মূল্য ঔষধ পেনিসিলিনও তিনি দিতে নিষেধ করেন। তিনি তাঁহাকে শান্তিতে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইবার সুযোগ দিবার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। কস্তুরবার প্রতি গান্ধীজির প্রেম কত গভীর তাহা সর্বদা অনুমান করা যায় না। আগা খাঁ প্রাসাদে বন্দী জীবন যাপনকালে যে তুলসী গাছটির সামনে বসিয়া কস্তুরবা নিত্য প্রার্থনা করিতেন, মুক্তি পাইয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া আসিবার সময় গান্ধীজি সেটি সঙ্গে করিয়া আনেন। প্রাসাদ ত্যাগ করিবার পূর্বে কস্তুরবা ও মহাদেব দেশাই-এর শেষ চিহ্ন যেখানে রাখা হইয়াছিল সেখানে প্রার্থনা করেন ও পুষ্পার্ঘ্য দেন। এই তুলসী গাছটি পরে সেবাগ্রামে কস্তুরবার কুটিরের সামনে তিনি নিজ হাতে রোপন করেন।

কস্তুরবা নিরক্ষর মহিলা ছিলেন। তৎকালে ঐ অঞ্চলে স্ত্রী-শিক্ষার

প্রচলন হয় নাই। পরে অবশ্য তিনি গান্ধীজির চেষ্টায় গুজরাটী কিছু কিছু লিখিতে ও পড়িতে পারিতেন। অনেকবার গান্ধীজি কস্তুরবাকে লেখাপড়া শিখাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, কিন্তু কোনবারই তাহা তেমন ফলপ্রসূ হয় নাই। বিবাহের পর প্রথম সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিতে কেহই উৎসাহী হন নাই। বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিবার পর গান্ধীজি আর একবার চেষ্টা করিলেন। ব্যারিষ্টারের স্ত্রী লেখা পড়া না জানিলে মান সম্মান থাকে না, সুতরাং গান্ধীজি কস্তুরবাকে লেখাপড়া শিখাইতে বদ্ধপরিকর হইলেন। ফলোদয় হইল না। প্রবীণ বয়সে কারাগারেও একবার গান্ধীজি কস্তুরবাকে ভারতবর্ষের ভূগোল শিখাইতে চেষ্টা করেন। অনেক চেষ্টা করিয়াও কস্তুরবা পাঞ্জাবের নদীগুলির নাম মনে রাখিতে পারেন নাই। কলিকাতাকে পাঞ্জাবের রাজধানী বলিতে তিনি দ্বিধা করেন না দেখিয়া এই প্রচেষ্টা বোধ করি পরিত্যক্ত হয়। কেতাবী বিদ্যা কম থাকিলেও কস্তুরবা একজন যথার্থ শিক্ষিতা নারী ছিলেন। কস্তুরবার লেখাপড়ার জ্ঞান কম থাকা সত্ত্বেও গান্ধীজি তাঁহাকে একদা শিক্ষিকার কার্যে নিযুক্ত করেন। চম্পারণে গ্রামোন্নয়নের কাজে গান্ধীজি ব্যাপৃত হইয়া কয়েকটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সকল বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষক নিয়োগ করিবার যে নীতি নির্ধারণ করেন তাহা আজিও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি ঠিক করেন: "শিক্ষকের লেখাপড়ার বিদ্যা কম থাকে তো থাকুক, কিন্তু চরিত্রবান হওয়া চাই।" গান্ধীজির আহ্বানে কস্তুরবা এই স্থলে কর্ম গ্রহণ করেন। সঙ্গে ছিলেন অবন্তিকা বাঈ, আনন্দী বাঈ, দুর্গাবেন ও মণিবেন।

তের বৎসর বয়সে গান্ধী ও কস্তুরবার বিবাহ হয়। গান্ধীজি লিখিতেছেন "আমরা উভয়ে প্রায় এক বয়সের ছিলাম। তথাপি স্বামীর প্রভুত্ব আরম্ভ করিতে আমার বিলম্ব হইল না।" কিন্তু সরল স্বাধীন চিত্ত ও দৃঢ় সংকল্পের কস্তুরবার নিকট গান্ধীজির প্রভুত্ব ফলাইবার চেষ্টা তেমন সার্থক হয় নাই। নানা অশান্তি হইয়াছে, কলহ হইয়াছে কিন্তু

শেষ পর্যন্ত উভয়ে সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া আনন্দের পরিবেশ ফিরাইয়া আনিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ছিল বলিয়াই ইহা সম্ভব হইত। কস্তুরবার আচরণ হইতে গান্ধীজি সত্যাগ্রহের প্রেরণা লাভ করেন বলা যাইতে পারে। গান্ধীজি বলিয়াছেন "পত্নীই তাঁহার অদ্ভুত সহ্যশক্তি দ্বারা জয়লাভ করিতেন।" এই সহনশীলতার সঙ্গে বিনম্র সেবা ভারতীয় হিন্দুনারীকে বিশেষ গৌরবের অধিকারী করিয়াছে। সত্যাগ্রহের মূল কথা তো ইহা হইতে ভিন্ন নহে।

হিন্দুনারীর গৌরবের যথার্থ উৎস যে স্বামী সংসার ও সর্বমানবের জন্য দুঃখবরণ আজিকার শিক্ষিতা নারী তাহা স্বীকার করিবেন আশা করি না। তাহাদের উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে গান্ধীজির আর একটি উক্তি নিবেদন করিব—"আজ আমি মোহান্ধ পতি নই [পত্নীর] শিক্ষকও নই। আজ ইচ্ছা করিলে কস্তুরবা আমাকে ধমকাইতে পারেন। আজ আমরা পরীক্ষিত মিত্র।" সহনশীলতা এবং সেবার পথ দিয়াই 'ধমকাইবার' এই অধিকার এবং মিত্র হইবার গুণ অর্জন করিতে হয়। আর কোন পথ আছে বলিয়া জানা যায় নাই। সীতা, সাবিত্রী, দয়মন্তী, তারামতি এই পথের পথিক ছিলেন বলিয়া আজিও শ্রদ্ধায় স্মরণীয়া হইয়া আছেন।

গান্ধীজির নারী ও সামাজিক অবিচার সম্পর্কিত লেখাগুলি পড়িতে পড়িতে অনেক সময়ই কস্তুরবার কথা আমাদের মনে পড়ে। ও-গুলি লিখিবার সময়ও যে গান্ধীজি কস্তুরবার দ্বারা প্রভাবিত হন নাই তাহা হইতেই পারে না। রবীন্দ্রনাথ যেমন বৈষ্ণব কবিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

'সত্য করি কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেম ছবি।'

এখানেও তেমনি যখন পড়ি গান্ধীজি লিখিতেছেন "পুরুষ সর্বদাই ক্ষমতালিপ্সু।" তখন কি কস্তুরবার প্রতি স্বীয় অবিচারের কথাটা মনে হইয়াছিল? ক্ষমতা-লোলুপতার উৎসও তিনি খোঁজ করিয়া বাহির করিয়াছেন। বয়স উভয়ের সমান। পরস্পরকে পরস্পরের প্রয়োজন।

অথচ একমাত্র পুরুষ কেন কর্তৃত্ব করিবে? গান্ধীজি বলিলেন, সম্পত্তির উপর পুরুষের পূর্ণ অধিকার এই ক্ষমতা দান করে। স্বাধীন ভারতবর্ষে এই বিভেদ লুপ্ত হইয়া নারী পুরুষ উভয়ের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে ইহা নিঃশব্দে হইয়াছে। পাশ্চাত্যেও ইহার জন্য বহু বর্ষের আন্দোলন প্রয়োজন হইয়াছিল।

গান্ধীজি যখন লেখেন—"আমাদের কৃষ্টিতে যাহা ভাল তাহা রক্ষা করিয়া, তাঁহারা (নারী) আত্মশক্তির বলে সমাজকে সংযত, পবিত্র করিয়া সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবেন। ইহা সীতা, দ্রৌপদী, সাবিত্রী, দয়মন্তীগণের কাজ, বিলাসমগ্না, পৌরুষধর্মী এবং তথাকথিত প্রগতিশীল নারীর নহে।"

এই সকল লিখিবার সময় কস্তুরবার কথা গান্ধীজির নিশ্চয়ই মনে পড়িয়াছিল। নারীর উপর চিরকাল তিনি গভীর আস্থা রাখিতেন। কিন্তু কস্তুরবা গান্ধীজির নিকট মূর্তিমতী আদর্শ নারী হইয়া উঠেন। অলঙ্কার নারীর সর্বাধিক প্রিয় বস্তু বলিয়া কথিত। একান্ত বালিকা না হোক, কিশোরী বয়সে কস্তুরবা স্বামীর উচ্চশিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য অলঙ্কারগুলি খুলিয়া দিয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে প্রত্যাবর্তনের সময়ে ভারতীয়েরা প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ গান্ধীজিকে নানাবিধ মূল্যবান উপহার দেন। ইহার মধ্যে কস্তুরবাকে দেওয়া ৫০ গিনির একছড়া সোনার হার ছিল। গান্ধীজির উপহারপ্রাপ্ত সমগ্র সামগ্রী সেখানকার জনহিতকর কর্মে দান করিয়া আসেন। গোল বাধিল কস্তুরবার হারটি লইয়া। বা ওটি দিতে নারাজ। গান্ধীজি জোর করিলেন না। অনেক বুঝাইলেন। শেষে এমনও বলিলেন—"এ হার তোমার সেবার জন্য না আমার সেবার জন্য দিয়াছে?" কস্তুরবা দমিবার পাত্র নন, উত্তর করিলেন "আচ্ছা, তাহাই হইল। তোমার সেবা তো আমারও সেবা। আমাকে যে রাতদিন খাটাইয়াছ, যাহাকে ইচ্ছা বাড়িতে রাখিয়াছ! আর আমাকে দিয়া দাসীগিরি করাইয়াছ তাহার কি?" কস্তুরবা অবশ্য শেষ পর্যন্ত গান্ধীজির ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং

হারটি দিয়া দেন। ইহা কস্তুরবা চরিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ। ল্যুই ফিশার বলিয়াছেন—

'She had rid herself of antitouchable prejudices ; was a reguler spinner and a sincere but not uncritical Gandhian.

কস্তুরবা অস্পৃশ্যতা বর্জন করিয়াছিলেন, নিয়মিত চরকায় সূতা কাটিতেন। তিনি নিষ্ঠাবতী গান্ধীবাদী হইলেও সমালোচনা করিতে ইতস্তত করিতেন না। কিন্তু প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নীরবে নত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেও দ্বিধা করেন নাই। ঐ গুণের জন্য ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ কস্তুরবাকে এই ক্ষেত্রে গান্ধীজি অপেক্ষাও বড় বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। ইহার একটি ঘটনা এই।

গান্ধী সেবা সংঘের সম্মেলন উপলক্ষে গান্ধীজি সপরিবারে উড়িষ্যায় যান। ধর্মপ্রাণ হিন্দুর নিকট পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরের আকর্ষণ খুবই প্রবল। কিন্তু এই মন্দিরে হরিজনদের প্রবেশ অধিকার নাই জানিয়া গান্ধীজি সেখানে যাইতে অস্বীকার করেন এবং তাঁহার অনুগামীদেরও যাইতে নিষেধ করেন। কস্তুরবা এবং দুর্গাবেন গান্ধীজির নির্দেশ উপেক্ষা করিয়াই হোক বা না জানিয়াই হোক মন্দিরে প্রবেশ করিয়া পূজা দেন। এই সংবাদে গান্ধীজি অত্যন্ত মর্মাহত ও ক্ষুব্ধ হন। প্রিয়জনদের পর্যন্ত স্বমতে আনিতে ব্যর্থ হইয়াছেন দেখিয়াই তাঁহার দুঃখ। গান্ধীজির হৃদয়বেদনা অনুভব করিতে কস্তুরবার মুহূর্তমাত্র সময় লাগে নাই। তিনি অকপটে গান্ধীজির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ব্যাপারটা মিটাইয়া ফেলিলেন। এমন সহজ হওয়া মোটেই সহজ কথা নহে।

কস্তুরবার জীবনের উপর দিয়া অনেক বিপর্যয় গিয়াছে। কিন্তু তিনি কখন বিচলিত হন নাই। কি পারিবারিক জীবনে কি তাহার বাহিরে সর্বত্রই তিনি গান্ধীজির মতই শান্ত ও নিরুদ্বেগ এবং নীরব কর্মসাধিকা। অপরদিকে গান্ধীজির খ্যাতি যত বাড়িয়াছে কস্তুরবার

উপর চাপও তত বেশি পড়িয়াছে। গান্ধীজি সারাজীবনে বহুবিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়াছেন। জীবনযাত্রা সরল করিবার পরীক্ষা, প্রাকৃতিক চিকিৎসার পরীক্ষা, খাদ্য পানীয়ের পরীক্ষা, অনাসক্তির পরীক্ষা ইত্যাদি তিনি সমগ্র জীবন ধরিয়া করিয়াছেন। তাঁহার প্রভূত সদ্বিবেচনা ও সহানুভূতি সত্ত্বেও কস্তুরবাকে এজন্য অমানুষিক শ্রম করিতে হইয়াছে। শ্রমের কথায় পরে আসিতেছি। প্রথমে গান্ধীজির বিবেচনার একটা গল্প বলি।

সবরমতি আশ্রম। একদিন ঠিক দুপুর বেলার অতিথি আসিয়াছেন। কস্তুরবা সবে হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর একটু বিশ্রাম করিতে গিয়াছেন। কিন্তু অতিথি সৎকারের জন্য কিছু আহার্য চাই। গান্ধীজি পা টিপিয়া টিপিয়া নিঃশব্দে নিজেই রান্নাঘরে আসিলেন। জনৈক সাহায্যকারীকে বলিলেন কস্তুরবার বিশ্রামের ব্যাঘাত না ঘটাইয়া একজনের আহার্য সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিলে তিনি তাহাকে পুরস্কৃত করিবেন। এই সদ্বিবেচনা বোধহয় গান্ধীজিরই সাজে। এমন অনেক ঘটনা আছে। আগা খাঁ প্রাসাদে অসুস্থ কস্তুরবা একবার পুরণপুরী (একপ্রকার মিষ্টান্ন) খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইহা খাইলে তাহার শরীর খারাপ হইতে পারে বলিয়া গান্ধীজি তাঁহাকে কৌশলে নিবৃত্ত করেন। মাত্র একটি কথা: 'তুমি যদি না খাও তবে আমি খাইব।' গান্ধীজি খাইবেন এই আনন্দে কস্তুরবা নিজের খাবার ইচ্ছা সংযত করিলেন। কি অনবদ্য সুন্দর উপায়ে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিয়াছেন। ইহা সচরাচর দেখা যায় না। গান্ধীজি যে বলিয়াছেন তাঁহারা অসাধারণ দম্পতি ছিলেন ইহার মধ্যে এতটুকুও অতিরঞ্জন নাই।

কস্তুরবার পিতৃদেব ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। বাপের বাড়ী শ্বশুর বাড়ী সর্বত্রই রান্নাঘরটা বাড়ীর গৃহিণীদের হাতে থাকিলেও অন্য কোন কাজ তাঁহাদের সাধারণতঃ করিতে হইত না। গান্ধীজি আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যে সকল কার্য প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিয়াছেন

তাহার অন্যতম হইল 'শরীর শ্রম' ও অস্বাদ। কস্তুরবাকে যাঁত ঘুরাইয়া গম পেশাই করিতে দেখি। রান্না-বান্না তো ছিলই। বাসনপত্র মাজা এমন কি পায়খানা প্রস্রাব পরিষ্কার করিতেও হইত। সকল কর্মের শেষ ও গুরুতর ধাক্কাটি গিয়া পড়িত কস্তুরবার উপর। দক্ষিণ আফ্রিকায় (১৮৯৮) একটি খ্রীষ্টান কর্মচারীর মূত্রাধার পরিষ্কার করা লইয়া গান্ধীজি কস্তুরবার মধ্যে দারুণ কলহ আত্মপ্রকাশ করে। গান্ধীজি বলিলেন—"এমন ঝকমারি আমার বাড়ীতে চলিবে না।" কস্তুরবা উত্তর দিলেন: "তবে তোমার ঘর তোমারি থাকুক, আমি চলিয়া যাই।" গান্ধীজি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিবার জন্য প্রকৃতই উদ্যোগী হইলেন দেখিয়া কস্তুরবা শান্ত স্বরে বলিলেন "তোমার তো লজ্জা নাই, আমার আছে। একটু লজ্জিত হও।···আমি মেয়ে মানুষ বলিয়া তোমার লাথি খাইয়া থাকিতে হইবে। এখন তোমার লজ্জা হোক। দরজা বন্ধ কর। কেহ দেখে তো কাহারো পক্ষেই তাহা গৌরবের হইবে না।" এই ভর্ৎসনায় গান্ধীজির চেতনা ফিরিয়া আসিল। এই রকম আরও কিছু ঘটনা আছে, সে সব বহুবিদিত বলিয়া উল্লেখ করিলাম না।

লজ্জাশীলা সম্ভ্রমময়ী এই মহিয়সী নারী নীরবে তিল তিল করিয়া আপনাকে গান্ধীজির বিকাশের জন্য উৎসর্গ করিয়াছেন। আশ্রমের বৃহৎ পরিবারের প্রতিটি মানুষকে অসীম স্নেহে ও যত্নে মাতার ন্যায় সর্বদা রক্ষা করিয়াছেন। তাই তিনি সকলের বা, মাতা। গান্ধীপত্নী বলিয়া যে তাঁহার এ সম্মান ইহা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে। বা অবশ্য বলিতেন আমাকে যে শ্রদ্ধা করা হয় সে ঐ স্বামীর জন্যই। এমন পতি হয় না। অনেক ক্ষেত্রে তিনি গান্ধীজি অপেক্ষা মহত্তর ছিলেন। সূর্যের আলোর দ্যুতিতে চন্দ্রালোক যেমন নিস্প্রভ হইয়া যায়, তেমনি গান্ধীসূর্যের কিরণের আড়ালে কস্তুরবা চাঁদখানা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে।

গান্ধীজির অনশন তাঁহারই মত বিখ্যাত। 'মেয়াদী' অনশন' বা

আমরণ অনশন—সর্বদাই কস্তুরবাকে দেখি গান্ধীজির পাশে। প্রিয়তম মানুষটি নিজেকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর পদতলে সমর্পণ করিতেছেন—কস্তুরবাকে নিরুপায়ভাবে তাহা প্রত্যক্ষ করিতে হইতেছে। এ যে কি অপরিসীম মর্মযাতনা তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। অবিচলিত নিষ্ঠাবতী কস্তুরবা এই সময় সব কিছু শ্রীভগবানের পাদপদ্মে অর্পণ করিয়া যন্ত্রের মত সকল কাজ করিতেন। এমন দিন গিয়াছে ডাক্তাররা প্রতিমুহূর্তে মহাগুরু নিপাত আশঙ্কা করিয়া কাল গুনিতেছেন—সারা দেশ উতরোল। কস্তুরবা কিন্তু ভাঙ্গিয়া পড়েন নাই, চোখের জলে বুক ভাসান নাই। গান্ধীজির পাশে বসিয়া আছেন। নির্দিষ্ট সময় তাহার তুলসী গাছটির সামনে বসিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন। অচিন্তনীয় এই স্থৈর্য। গান্ধীজির অনশনের সময় কস্তুরবা দিনে একবার মাত্র আহার করিতেন। তাহাও দুধ এবং ফল মাত্র। তাঁহার জীবদ্দশায় গান্ধীজির শেষ অনশনের সময় কস্তুরবা ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য ২৪ ঘণ্টায় দু বার ফল ও দুধ খাইতে স্বীকৃত হন।

আবার যখন গান্ধীজি অনশন ভঙ্গ করিয়াছেন তখন সেখানে যত খ্যাতিমান প্রিয় লোক থাকুন না কেন লেবুর রসের প্রথম গ্লাসটি গ্রহণ করিয়াছেন কস্তুরবার হাত হইতে। ইহাকেও এক অসাধারণ ঘটনা বলিয়া আমি মনে করি। কস্তুরবার মৃত্যুর পর গান্ধীজি প্রথম অনশন করেন কলকাতায়। তখন বার বার তিনি বা-কে স্মরণ করিয়াছেন। অনশনের সময় বা তাঁহাকে যে সেবা ও সাহায্য করিতেন তাহা বলিয়া শ্রীমতী মনু গান্ধীকে নানা নির্দেশ দিতে দেখি। বা নেই কত ভাবনা! গান্ধীজি জনৈকা মহিলাকে এক চিঠিতে লেখেন ঃ

But for her (Kasturba) unfailing co-operation I might have been in the abyss···She helped me to keep wide awake and true to my vows. She stood by me in all my political fights and never hesitated to take the plunge......to my mind she was a model of true education.

মর্মার্থ : সতত কস্তুরবার সহযোগিতা না পাইলে আমাকে অতলে তলাইয়া যাইতে হইত। তিনি আমাকে আমার আদর্শ পালনে অতন্দ্র থাকিতে সাহায্য করেন। সকল রাজনৈতিক সংগ্রামে তিনি আমার পাশে পাশে ছিলেন—আমার নিকট তিনি প্রকৃত শিক্ষার পুর্ণ আদর্শ। কস্তুরবার প্রতি গান্ধীজি বহুক্ষেত্রে এমন অনেক শ্রদ্ধাশীল বাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন। বাক্যগুলি পড়িলেই বুঝা যায় প্রীতি ও শ্রদ্ধার রসে সম্পূর্ণরূপে জারিত না হইলে কোন লেখনি হইতে এমন কথা বাহির হইতে পারে না। আর একটি সুন্দরতর কথা পাই লর্ড ওয়াভেলের নিকট লিখিত পূর্বোক্ত চিঠিতে।

"She was a woman always of a very strong will, which in our early days I used to mistake for obstinacy. But that strong will enabled her to become quite unwittingly my teacher in the art and practice of non-violent non co-operation."

তাহার ইচ্ছাশক্তি দৃঢ় ছিল। প্রথম বয়সে আমি ইহাকে একগুঁয়েমী বলিয়া ভুল করিতাম। অজ্ঞাতসারে তাঁহার দৃঢ় ইচ্ছার দ্বারা তিনি আমার অহিংস-অসহযোগের নীতি ও প্রয়োগ বিষয়ে আমার শিক্ষক হইয়া ওঠেন।

ভালবাসার গভীরতা ছাড়া দাম্পত্য-জীবনে পারস্পরিক শ্রদ্ধা সঞ্চার করে না। গান্ধীচিত্তের প্রেম কত অতলস্পর্শী ছিল তাহা বুঝি যথার্থভাবে অনুমান করা যায় না। গান্ধীজি নিজে অসুস্থ। হুপীং কাসিতে কষ্ট পাইতেছেন, খুবই কষ্ট। নিজের কষ্টের কথা তেমন কিছু না বলিয়া কহিলেন—It reminds me of Ba's last illness. এই কষ্ট আমাকে কস্তুরবার শেষ রোগের কথা মনে করাইয়া দিতেছে। রোগযন্ত্রণার মধ্যে তিনি কস্তুরবাকে স্বপ্ন দেখিতেছেন। I had a dream, I saw her [Kasturbai] standing there. আমি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম কস্তুরবা ঐখানে দাঁড়াইয়া আছেন।

কস্তুরবার মৃত্যু দিনটি গান্ধীজির উপবাসের দিন ছিল। ঐ দিন তিনি শিশুদের মধ্যে ফল বিতরণ করিতেন। গান্ধীজি গর্বে বলিতেন— **Ba delighted more in feeding than in eating** কস্তুরবা খাওয়া অপেক্ষা খাওয়ানোতেই বেশি আনন্দ পাইতেন। ভারতীয় নারীর হৃদয়ের ধর্ম খাওয়ানো, খাওয়া নহে। কত মাকে আমরা দেখিয়াছি প্রস্তুত খাদ্য অন্যকে খাওয়াইয়া সামান্য একটু তলানি যাহা পড়িয়া আছে তাহার দ্বারাই পরম পরিতৃপ্তির সহিত আহার করিতেছেন।

তথাকথিত শিক্ষাহীন একটি নারী গান্ধীজির সহিত দক্ষিণ আফ্রিকা গিয়াছেন, বিলাত গিয়াছেন, ভারতবর্ষের নানা প্রান্তের তো কথাই নাই। দেশ বিদেশের অতিথি অভ্যাগতকে তিনি গান্ধী আশ্রমে আপ্যায়িত করিয়াছেন। ভোজসভায় কস্তুরবা গান্ধীজির পাশেই বসিতেন। দেশী বিদেশী অতিথি প্রায়ই সেখানে থাকিতেন। তাহার মধ্যেই কস্তুরবা গান্ধীজিকে হাত পাখা দিয়া ধীরে ধীরে হাওয়া করিতেন। সমগ্র কাজটিকে কস্তুরবা গান্ধী-সেবার অঙ্গ মনে করিতেন। গান্ধীজিও সর্বত্র কস্তুরবাঈ-এর সান্নিধ্য কামনা করিতেন। কস্তুরবা অনুপস্থিত থাকিলে বা আসিতে বিলম্ব করিলে গান্ধীজি খোঁজ লইতেন।

গান্ধীজির উপর কস্তুরবার অসামান্য নির্ভরতা ছিল। ডারবানে অসুস্থ কস্তুরবাকে মাংসের জুস্ দিবার জন্য ডাক্তাররা নির্দেশ দেন। ডাক্তাররা এমনও বলেন যে উহা খাইতে না দিলে কস্তুরবার প্রাণরক্ষা করা সম্ভব নাও হইতে পারে। গান্ধীজি ইহাতে চিন্তিত হইলেন। কিন্তু কস্তুরবা সকল চিন্তা দূর করিয়া পরম নির্ভয়ে বলিলেনঃ "আমার দ্বারা মাংসের জুস খাওয়া চলিবে না। মানব জন্ম বারেবারে হয় না। তোমার (গান্ধীজি) কোলে আমি মরিয়া যাই ভাল, কিন্তু আমার দেহ যেন অপবিত্র করা না হয়।"

মানব জন্ম বারবার হয় না—এ বিশ্বাস কস্তুরবা কোথা হইতে পাইলেন? গান্ধীজির প্রভাব ছাড়া তাঁহার এ বোধ কি এত সহজে হইত!

এই সময় এক স্বামীজি কোথা হইতে আসিয়া কস্তুরবাকে মাংসের জুস খাইবার প্রয়োজনীয়তা এবং ঔচিত্য সম্পর্কে জ্ঞান দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিরক্ত কস্তুরবা যে জবাবটি দিয়াছিলেন গান্ধী ও কস্তুরবাকে বুঝিবার পক্ষে তাহা প্রয়োজনীয়। জবাবটি হইল ঃ "স্বামীজি, আপনি যাহাই বলুন, আমার মাংস খাইয়া ভাল হওয়ার দরকার নাই। আপনার পায়ে পড়ি আমার মাথা ধরাইয়া (বক বক করিয়া) দিবেন না। আর যদি কথা বলিতে হয়, তবে ছেলেদের বাপের সহিত পরে বলিবেন।" গান্ধীজির বিচারের উপর সব ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। এমন নির্ভরতা সুলভ নহে।

গান্ধীজি কস্তুরবা সম্পর্কে এমন শত সহস্র কথা ও কাহিনী বিবৃত করা যায়। আজ আর একটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ করিয়া এ তর্পণ শেষ করিব। সত্যাগ্রহ আলোচনা প্রসঙ্গে ঘটনাটি কিঞ্চিৎ বিবৃত করা হইয়াছে। তথাপি গান্ধী কস্তুরবাকে বুঝিবার জন্য ইহার পুনরুল্লেখ মার্জনীয় বিবেচিত হইবে আশা করি। গান্ধীজি চিকিৎসা করিতে, বিশেষতঃ প্রাকৃতিক চিকিৎসা করিতে বড় ভালবাসিতেন। একবার কস্তুরবাঈয়ের কঠিন পীড়ায় গান্ধীজি তাঁহার চিকিৎসা বিদ্যা প্রয়োগ করিতে থাকেন। কোন ফলোদয় হইতেছে না দেখিয়া তিনি কস্তুরবা-কে নূন এবং ডাল খাইতে নিষেধ করেন। কিন্তু কস্তুরবা বলিলেন ডাল ও নূন ছাড়িয়া বাঁচিব কি করিয়া? গান্ধীজি অমনি বই আনিয়া তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইলেন মানবদেহের জন্য নূনের কোন প্রয়োজন নাই, দুর্বল শরীরে ডাল খাইতে নাই। কস্তুরবা উহা শুনিতে চাইলেন না। আলোচনার মধ্যে তিনি বলিয়া ফেলিলেন—"তোমাকে (গান্ধীজি) যদি কেহ নূন ও ডাল ছাড়িতে বলে তবে তুমিও ছাড়িবে না।" গান্ধীজি সেই মুহূর্ত হইতে নূন ও ডাল খাওয়া এক বৎসরের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কস্তুরবা সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন; তাঁহার অনুশোচনা হইল ঃ তিনি বলিলেন ঃ

"আমাকে মার্জনা কর, তোমার স্বভাব জানিয়াও কেন আমি এমন কথা বলিতে গেলাম!" কস্তুরবার অনুনয় ও মিনতি সত্ত্বেও গান্ধীজি প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিলেন না। তিনি গান্ধীজিকে টলাইতে পারিলেন না। কস্তুরবা রুগ্না, সুস্থ থাকিলেও গান্ধীজির প্রতিজ্ঞার ইতরবিশেষ হইত না। চোখের জলের সহিত গভীর দীর্ঘশ্বাস মিশিয়া কস্তুরবার কণ্ঠ হইতে গান্ধী চরিত্রের মর্ম কথাটি যেন উচ্চারিত হইল: "তুমি বড় জেদী, কাহারো কথা শোন না।"—সত্যিই কস্তুরবা যথার্থই চিনিয়াছিলেন একলা চলার মন্ত্রে দীক্ষিত ভারতবর্ষের নিঃসঙ্গ পথিক গান্ধীজিকে। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে বা বলিতেছেন আমার মৃত্যুর পর দুঃখ করিবেন না। তাহা যেন আনন্দের কারণ হয়। মৃত্যুর পর গান্ধীজি বলেন—বাকে ছাড়া আমার জীবন কল্পনা করিতে পারি না।......অদৃশ্য হইলেও তিনি আমার এক অংশ।

গান্ধী মহাজীবনের অনেক ভাষ্য রচিত হইবে, কস্তুরবার কথাও বহুজনে কীর্তন করিবেন। কিন্তু গান্ধী কথায় কস্তুরবা ও বা'র চোখে গান্ধীকে দেখা—এই দেবদুর্লভ চরিত্র দুইটিকে যথার্থভাবে জানিবার বুঝিবার এবং এমন কি উপলব্ধি করিবার পক্ষে অপরিহার্য।

কবি ও গান্ধী

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজি উভয়েই যুগপুরুষ। প্রায় সম-সময়ে নিজ নিজ ক্ষেত্রে মৌলিক সাধনার দ্বারা তাঁহারা ভারতবর্ষকে নূতনতর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। একজন সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দিকপাল, অন্যজন রাষ্ট্রনীতি ও জনসেবার ক্ষেত্রে অনন্য, পথিকৃৎ নেতা। বস্তুতঃ তাঁহাদের কর্মক্ষেত্রকে বিপরীতধর্মী যদি নাও বলা যায়, তথাপি পরস্পরের মধ্যে ব্যাপক ও গভীর পার্থক্য যে বর্তমান তাহাতে দ্বিমতের অবকাশ নাই। অথচ উভয়ের কর্মসাধনায় বিভেদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা যে ভারতবর্ষের বিশিষ্টতা তাহা ভাস্বর ও বাঙ্‌ময় হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের উভয়েরই বিপুল ও বিস্ময়কর কর্মপ্রয়াসের সেইটাই প্রকৃত ভিত্তি। এইখাইনে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে পারিলে কবি ও গান্ধীজিকে ভারতীয় বিশিষ্টতার বিগ্রহ বা ভারতধর্মের মূর্ত প্রতীক বলিয়া বুঝিতে কষ্ট হয় না।

অল্প কথায় এই বিশিষ্টতার স্বরূপ প্রকাশ বা সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায় না। ইহা সত্ত্বেও যখন বলা হয়, সমন্বয় সাধন প্রচেষ্টার প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগই ভারতীয় চরিত্রের বিশিষ্টতা তখন সম্ভবত আমরা সত্যের নিকটতম হই। পাকিস্তান সৃষ্টির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া এই মতের অসারতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা অপেক্ষাকৃত

সহজ। কিন্তু কয়েকজন অভিসন্ধিপরায়ণ ক্ষমতালোলুপ মানুষ ব্যতীত ভারত পাকিস্তানের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের পাকিস্তান সৃষ্টির দ্বারা বিন্দুমাত্র কল্যাণ সাধিত হয় নাই। আজ ভারত পাকিস্তান উভয় দেশের মানুষ কি অপরিসীম মর্মপীড়া অনুভব করিতেছেন, একে অন্যকে কেবল একটিবার মাত্র চোখের দেখা দেখিবার জন্য কি পরিমাণে ব্যাকুল হইয়াছেন, তাহা বুঝাইবার জন্য বোধ হয় কোন যুক্তির প্রয়োজন নাই, আমরা নিজেদের হৃদয় দ্বারে কান পাতিলেই ইহা বুঝিতে সক্ষম হইব।

ভারতবর্ষের কবি আর ভারতের রাষ্ট্রনেতার মধ্যে সাদৃশ্য থাকিবে ইহাই প্রত্যাশিত এবং স্বভাবসুন্দর। গান্ধীজি ও কবির রচনা হইতে নানা বিষয় লইয়া কেহ কেহ আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন, উভয়ের মধ্যে কিছু কিছু মতপার্থক্য ও দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতা থাকিলেও মূলতঃ এক সত্য ও কল্যাণ-ভাবনার দ্বারা এবং মানবকল্যাণের অখণ্ড চিন্তার দ্বারা উভয়েই পরিচালিত হইতেন। রবীন্দ্রনাথের মত সার্বভৌম কবি রাজনীতির আঙিনায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, জন-আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতেছেন, এমন আশ্চর্য ঘটনা পৃথিবীতে বড় বেশী ঘটে নাই। জনজীবনের দুঃখ-সুখ, ব্যথা-বেদনা, আনন্দ-বিরাগকে কবি তাঁহার কাব্যে-কথায়, গানে-গাথায়, গল্পে উপন্যাসে ভাষা দিয়াই তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। বস্তুগতভাবে কিছু করিতে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত তিনি শান্ত হইতেন না। তাই মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাই বিবিধ রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোভাগে। কিন্তু রাজনীতির দাবি সর্বগ্রাসী। কবি মন তাহা মিটাইতে পারে না। তাই কবিকে অচিরে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। কখনও চিত্ত কিঞ্চিৎ শান্ত, কখনও আশাভঙ্গের বেদনায় ক্লিষ্ট। সভা-সমিতি-বক্তৃতার আন্দোলনকে কবি কর্মে রূপান্তরিত করিলেন—শিলাইদহ, পতিসর, শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতনে। আজিকার বিশ্বভারতী-শ্রীনিকেতন কবির এই প্রচেষ্টার উৎকৃষ্টতম ও উজ্জ্বলতম ফসল।

অপর দিকে গান্ধীজি রাজনৈতিক আন্দোলনের শীর্ষবিন্দুতে অবস্থান করিয়াও গঠনকর্মের উপর যে গুরুত্ব আরোপ করেন পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার দ্বিতীয় নজীর নাই। একদিকে গঠনকর্ম অন্যদিকে সত্যাগ্রহ এই দ্বিবিধ উপায়ে গান্ধীজি ভারতবর্ষে নূতন সাধনায় ব্রতী হন। কবির কর্মের যেমন দুইটি ক্ষেত্র—কাব্যসাধনা ও কর্ম-সাধনা, গান্ধীজিরও তেমনি দুইটি ধারা—সত্যাগ্রহ ও গঠনকর্ম। গীতাঞ্জলির সহিত বিশ্বভারতীর যে যোগ বা সমন্বয়, ডাণ্ডির সহিত সবরমতির যে যোগ এবং মিলন, তাহাই প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতীয় মৌলিকতার উজ্জ্বল ও বিশিষ্ট উদাহরণ। ইহা অবশ্যই স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, কবির পক্ষে সম্যকরূপে এখনকার চলিত রাজনীতিকে অনুধাবন ও অনুসরণ করা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি রাষ্ট্রনেতার পক্ষেও কবি মানসের উপলব্ধি যথার্থভাবে অনুভব করার চেষ্টা নিরর্থক। গান্ধীজি ও রবীন্দ্রনাথ এই সত্য স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

চলিত রাজনীতির অনেক প্রশ্নে কবির সঙ্গে গান্ধীজির গুরুতর মতভেদ সত্ত্বেও কবি গান্ধীজির মতামতকে শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রয়োগ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। গান্ধীজিও রাজনৈতিক প্রশ্নে কবির মতামতকে নাকচ করিয়া দিতেও দ্বিধা করেন নাই। কোন একটি রাজনৈতিক প্রশ্নে কবির অনুরোধ বাস্তব বুদ্ধির বিচারে গান্ধীজি গ্রহণ করিতে সমর্থ হন না। গান্ধীজি কবিকে ভুল বুঝিলেন না। তিনি জানিতেন, "I am quite clear, the matter is too complicated for Gurudev to handle." (এনড্রুজ সাহেবকে লিখিত পত্র)। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে কবির বিচার-বিবেচনার উপর গান্ধীজির যেমন বিপুল আস্থা ছিল তেমনি কবির শুভেচ্ছাকে তিনি বিশেষ মূল্যবান বিবেচনা করিতেন। ইহার বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। একটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ করি। ঐতিহাসিক পুণা অনশনের পূর্বে গান্ধীজি কবির মতামত ও আশীর্বাদ চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

গান্ধীজির মতামত যে সর্বদা কবির নিকট গ্রহণীয় বিবেচিত হয়

নাই তাহার উল্লেখ পূর্বে করিয়াছি। প্রয়োজনে কবি গান্ধীজির প্রতিবাদ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু সে প্রতিবাদে অশ্রদ্ধার লেশমাত্র থাকিত না। বিহার ভূমিকম্প, চরকা প্রভৃতি লইয়া গান্ধীজির সহিত কবির একদা প্রবল বিতণ্ডা হয়, ইহা আজ সর্বজনবিদিত ঘটনা। আবার গান্ধীজির বিরুদ্ধে বাংলা দেশের চিত্তে একদা যে বিপুল বিরূপতা দেখা দিয়াছিল রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সেইদিন দৃঢ়কণ্ঠে গান্ধীজিকে সমর্থন করিতে দ্বিধা করেন নাই। কবির প্রতিবাদের ধরনটি কত মনোরম ছিল তা বাদ-প্রতিবাদের পাঠকগণ অবগত আছেন। নীচের ছোট্ট ঘটনাটি হইতেও তাহার কিছু অনুমান করা যাইতে পারে।

গান্ধীজি খাদ্যাদি লইয়া নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতেন। কি করিয়া যেন তাঁহার ধারণা হয় ঘি বা তেলে ভাজিলে পুরি বিষ হইয়া যায়। কথাটা তিনি কবিকেও জানাইলেন। কবি তো শুনিয়া অবাক হইয়া গেলেন। বাদপ্রতিবাদের ভিতর না গিয়া তিনি সহজ করিয়া জানাইলেন, বিষ যদি হয় তবে তাহা এত সামান্যই যে তেমন কোন ক্ষতি করিতে সমর্থ হয় না। আমি বহু বর্ষ যাবৎ পুরি খাইতেছি কিন্তু তেমন কোন বিষক্রিয়া হয় নাই। এ প্রসঙ্গের আলোচনা ওইখানেই শেষ হইয়াছিল।

গান্ধীজির মধ্যেও একটি কবিমানস বরাবর ছিল। রাজনীতির কোলাহলের মধ্যে সেটি বিকশিত হইতে পারে নাই, কিন্তু উপাদানটি তাঁহার হৃদয়ে রহিয়া গিয়াছিল। তিনি একবার কাকা কালেলকারকে বলেন, "দেশসেবার নিমিত্ত আমি যদি কিছু ত্যাগ করিয়া থাকি-সে ইংরাজি সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ। পয়সা রোজগার ও গণ্যমান্য হইবার বাসনা ত্যাগ করাকে আমি ত্যাগই বলি না।" কবি বা সাহিত্যিক মানসের অধিকারী না হইলে এমন মর্মস্পর্শী কথা বলা যায় কি? কাব্য সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্ততা ভারতীয় মনের আর একটি বিশিষ্টতা।

প্রচলিত রাজনীতি হইতে অসত্য হিংসা ঈর্ষা ও বিদ্বেষ গান্ধীজি তাঁহার স্বকীয় পদ্ধতিতে বিদূরিত করিতে কৃতসঙ্কল্প ছিলেন। প্রতি-পক্ষকে তিনি ধ্বংস করিয়া জয়লাভ করিতে চাহেন নাই। তিনি চাহিয়াছিলেন সকলকে স্বমতে আনিয়া সহযোগিতার ভিত্তি রচনা করিতে। ভিন্ন পরিবেশে সত্য ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে কিন্তু মূলতঃ সে এক ও অভিন্ন। অতএব অনৈক্যের ভিত্তি সর্বদাই দুর্বল হইতে বাধ্য। কবির সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনার মূলেও যে এই কথা কয়টি সতত ক্রিয়াশীল তাহা যে কোন পাঠকের নিকটেই সহজে প্রতিভাত হয়। এই সাদৃশ্যের জন্যই রবীন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ কবি হইয়াও রাজনীতির আঙিনায় উপস্থিত। গান্ধীজি রাষ্ট্রনেতা হইয়াও কাব্য ও সাহিত্যের তীর্থবারি বহন করিয়া চলিয়াছেন। উভয়েই নিজেদের চিন্তাকে কর্মের বাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যোগী ছিলেন। কিন্তু কবি চিরকালই কর্মীর অগ্রগামী হইয়া থাকেন। কবির ভাবকল্পনা কর্মীর সাধনায় বাস্তব রূপলাভ করে।

শ্রীযুক্ত নারায়ণ চৌধুরী গান্ধীজি ও গুরুদেব সম্বন্ধে আলোচনায় লিখিয়াছেন, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের নান্দী রচনা করেন তেমনি এক হিসাবে রবীন্দ্রনাথও গান্ধীজির আগমনের পূর্বভাস তাঁর রচনায় দেন। রবীন্দ্রনাথের ধনঞ্জয় বৈরাগী চরিত্রটির মধ্যে গান্ধীজির জীবনাদর্শের প্রতিবিম্ব দৃশ্যমান। রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও প্রসঙ্গতঃ লিখিয়াছেন, "কবি বহুদিন হইতে বলিতেছিলেন ভারতবর্ষের যিনি নায়ক হইবেন তিনি হইবেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ফকির। এই আদর্শায়িত নেতার মূর্তি হইতেছে ধনঞ্জয় বৈরাগী। আর আধুনিক যুগে মহাত্মা গান্ধী সেই নীতিকে কেবল বাক্যে নহে, জীবনে বরণ করিয়া লইয়াছেন।" রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে গান্ধীজির আবির্ভাবের বহু পূর্বে কবির ধনঞ্জয় বৈরাগী সৃষ্টি হইয়াছে। ব্যাপারটিকে আকস্মিক বা কাকতালীয় বলিয়া ইহার গুরুত্ব অনেকে আমরা লঘু করিতে চাহি। কিন্তু শিশুতীর্থ কবিতা যখন পড়ি, তখন কি মনে হয়

না গান্ধীজিকে হত্যার ঘটনার পরেও এমন একটি কবিতা লিখিত হইতে পারিত ঃ

"জনতার মধ্য থেকে কে-একজন হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে
অধিনেতার দিকে আঙুল তুলে বললে
মিথ্যাবাদী, আমাদের প্রবঞ্চনা করেছ।
ভর্ৎসনা এক কণ্ঠ থেকে আরেক কণ্ঠে উদগ্র হতে থাকল। ...
অবশেষে একজন সাহসিক উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ তাঁকে মারলে প্রচণ্ড বেগে।

... ...

পরস্পরকে তারা শুধায়, কে আমাদের পথ দেখাবে।
পূর্ব দেশের বৃদ্ধ বললে,
আমরা যাকে মেরেছি সেই দেখাবে।

... ...

সকলে দাঁড়িয়ে উঠল, কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গান করলে।
জয় মৃত্যুঞ্জয়ের জয়।"

গান্ধীজি নিহত হন ১৯৪৮ সনে। কবিতাটির রচনাকাল ১৯৩১। গান্ধীজির মহাপ্রয়াণে ১৭ বৎসর পূর্বে।

কবির অনেক সৃষ্টির মধ্যে গান্ধীজির চরিত্র ও কর্মাদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ফাল্গুনী নাটকের দাদা চরিত্রে গান্ধীজির ভাবমূর্তি প্রত্যক্ষ-গোচর। এই নাটকটি যখন রচিত হয় তখন গান্ধীজি শান্তিনিকেতনে। অতএব কবি প্রভাবিত হইয়াছেন বলাই সমীচীন। তাঁহার দিব্যদৃষ্টি ধনঞ্জয় বৈরাগীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই। রবীন্দ্র-রচনাবলীর মধ্যে আরও বহু উদাহরণ ছড়াইয়া আছে। যেমন, ধরা যাউক গোরা। গোরা বিচারালয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে অস্বীকার করে। সে স্থানটা পড়িতে পড়িতে কি মনে হয় না মহাত্মার অসহযোগ আন্দোলনের নেতা ও কর্মীরা ইংরেজ আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই! গোরার সৃষ্টি অসহযোগ পূর্বকালে।

ইহা ভিন্ন গান্ধীজির জীবন এবং কর্মের উপরও কবির রচনা

আছে। সে সকল আলোচনার অবকাশ এখানে নাই। এখানে তুইটি মহাজীবনের যে সূত্র ধরিয়া প্রথম যোগাযোগ ঘটিল সেই কথাটি এবং সমানধর্মী হৃদয়ের তুই একটি ঘটনামাত্র বিবৃত করিয়া এ প্রসঙ্গের শেষ করিব।

দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজি একটি আশ্রম বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ফিনিক্স স্কুল। বিদ্যালয়ে বিশেষ কোন পাঠ্যক্রম ছিল না। কোন পরীক্ষায় পাস করানোর জন্য ইহাদের পড়ানো হইত না। কঠিন কায়িক পরিশ্রমের সহিত ধর্ম ও নীতি শিক্ষা এবং সাধারণ পাঠাভ্যাস ছিল আবশ্যিক। শিক্ষার্থীদের মধ্যে গান্ধীজির পুত্রেরাও ছিলেন। স্বদেশে ফিরিবার পূর্বে গান্ধীজি এই স্কুলের ছাত্রদের ভারতবর্ষে এনড্রুজের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি তাহাদিগকে প্রথম কিছুকাল মহাত্মা মুন্সীরামের (শ্রদ্ধানন্দ) হরিদ্বারস্থ গুরুকুল আশ্রমে রাখেন। সেখানে নানা অসুবিধা দেখা দিলে এনড্রুজ সাহেব ইহাদিগকে লইয়া শান্তিনিকেতনে আসিলেন। কবি ও গান্ধীজি উভয়েরই বন্ধু ছিলেন এনড্রুজ। কবি পরবর্তীকালে তাঁহাকে দীনবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করেন। বলা বাহুল্য কবির সম্মতিক্রমেই এনড্রুজ আশ্রিমকদের শান্তিনিকেতনে আনিতে সমর্থ হন। গান্ধীজি তখন তেমন কোন খ্যাতি অর্জন করেন নাই। কেবলমাত্র আদর্শের প্রতি অনুরাগের জন্যই কবি ফিনিক্স স্কুলকে শান্তিনিকেতনে আশ্রয় দিতে স্বীকৃত হন। তিনি আরও আশা করিয়াছিলেন, তাঁহার নিজ আশ্রমিক বিদ্যালয় ও গান্ধীজির ফিনিক্স স্কুলের যোগাযোগের ফলে উভয়ের কল্যাণ সাধিত হইবে।

ফিনিক্স স্কুলের ছাত্রদল শান্তিনিকেতনে থাকিতে থাকিতে গান্ধীজি প্রথম এখানে আসেন। কবি তখন কলিকাতায়। তুইদিন পরে মহামতি গোখলের পরলোকগমনের সংবাদ পাইয়া গান্ধীজি পুণা রওনা হন। গোখলের প্রতি গান্ধীজির প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। এই পুরুষ প্রধানের মৃত্যুতে গান্ধীজি এতই শোকাহত হন যে, তিনি এক বৎসর নগ্নপদে চলিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন, এবং তাহা ব্রতধারীর ন্যায় নিষ্ঠার সহিত পালন করেন।

ভারতবর্ষ হইতে যাঁহারা দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজির সহিত যোগাযোগ স্থাপন করেন তাঁহাদের মধ্যে মহামতি গোখলে ও কবির উল্লেখ পাই। দীনবন্ধু এনড্রুজকে গোখলে দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজির নিকট প্রেরণ করেন। এনড্রুজ কবির শুভেচ্ছাও লইয়া যান। অতএব গোখলের প্রতি গান্ধীজির শ্রদ্ধামিশ্রিত অনুরাগের হেতু সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু তাহার গভীরতা কত বেশি তাহা এই ঘটনাটির দ্বারা স্পষ্ট হইল। ইহাও কবির সহযোগশূন্য নহে।

পরবর্তী ৬ই মার্চ গান্ধীজি পুনরায় শান্তিনিকেতনে আসেন। এই সময় শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক বিদ্যালয়ে তিনি আত্মনির্ভরতার কর্মসূচী প্রবর্তনে অগ্রণী হন। ১০ মার্চ ঠাকুর চাকর সব বিদায় দিয়া ছাত্র শিক্ষকগণ সম্মিলিতভাবে রান্না, বাসনমাজা, এমন কি, ঝাড়ুদারের কাজও করিতে শুরু করিলেন। দ্বিধা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ পরিকল্পনাটি অনুমোদন করেন। ইহা অবশ্য চল্লিশ দিনের বেশি চলে নাই গ্রীষ্মাবকাশের পর পুরাতন ঠাকুর চাকরের ব্যবস্থা স্বাভাবিক ভাবে প্রবর্তিত হইল। কেহ প্রতিবাদ করিলেন না। ছাত্র শিক্ষকদের সহিত গান্ধীজিও নানা কাজে নিজে হাত লাগাইতেন। এই ব্রতারম্ভের দিনটিকে শান্তিনিকেতনে গান্ধীদিবস রূপে আজও শ্রদ্ধার সহিত পালিত হয়। গান্ধীদিবসে ঠাকুর, চাকর, মেথর, ঝাড়ুদার প্রভৃতি সকল কর্মীর ছুটি। আশ্রমিকেরা নিজেরাই তাহাদের সব কাজ নিজের হাতে করেন। গান্ধীজি প্রবর্তিত আত্মনির্ভরতার আদর্শকে কবি এই ভাবে স্বীকার করিয়া লন, যদিও নানা কারণে শান্তিনিকেতনে তাহা সর্বদা অনুসরণ করা সম্ভব হয় নাই। শ্রদ্ধা জানাইবার এমন অনাড়ম্বর ও সহজ পদ্ধতি আর দেখি নাই। মহাপুরুষের আবির্ভাব তিথিতে স্কুল কলেজ ছুটি হয়। কিন্তু তাহা তো বস্তুত বিনোদন মাত্র!

কাকা তাঁহার নিজস্ব সরস ভঙ্গীতে গান্ধীজি ও কবির প্রথম সাক্ষাৎকার' বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি নিজে এই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারের সময় শান্তিনিকেতনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখিতেছেন:

"রবিবাবুর দীর্ঘ বপু, ভব্য মূর্তি, শুভ্রকেশ, সুদীর্ঘ শ্মশ্রু ও সুন্দর পোশাক সব কিছুই ছিল সৌম্য ও সুন্দর।" আর গান্ধীজি "খাটো ধুতি পরনে, কোর্তা গায়ে, কাশ্মীরি টুপি মাথায়। গান্ধীজি দাঁড়াইলেন যেন সিংহের সম্মুখে ইঁদুর।···রবিবাবু গান্ধীজিকে পাশে কৌচের উপর বসিতে ইশারা করিলেন। গান্ধীজি দেখিলেন মেঝেতেও গালিচা পাতা, আর কৌচ কেন? তিনি মেঝেতে বসিয়া পড়িলেন। রবিবাবু কি করেন, তিনিও ফরাসে বসিলেন।"

গান্ধীজির পোশাক বিষয়ে আমরা অবগত আছি, তাঁহার ক্ষীণ তনু আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু তিনি কৌচের উপর না বসিয়া মেঝের উপরে বসিলেন কেন? কবিকে নীরবে শ্রদ্ধা জানাইতে কি গান্ধীজি এই উপায় অবলম্বন করেন? শ্রদ্ধা জানাবার ভারতীয় পদ্ধতির সঙ্গে ইহার মিল আছে।

গান্ধীজি ও কবি উভয়ে সরকারী খেতাব পান। কবির ছিল নাইটহুড, গান্ধীজির কাইজার-ই-হিন্দ। জালিয়ানওয়ালাবাগের নিধন যজ্ঞের প্রতিবাদে কবি নাইটহুড ত্যাগ করেন। আর বিহার সরকার যখন গান্ধীজিকে বিহার ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে নির্দেশ দিলেন, তখন এই অন্যায় আদেশের প্রতিবাদে গান্ধীজি তাঁহার পদকটি বড়লাটকে ফিরাইয়া দিবার নির্দেশ দেন। তিনি তখন চম্পারনে।

দুইটি ক্ষেত্র ভিন্ন হইলেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদের মানসিকতা এই উপাধি প্রত্যর্পণের বা অত্যাচারীর প্রদত্ত সম্মান ত্যাগের মধ্যে দৃষ্ট হয়। ইহা আকস্মিক যোগাযোগ না ভারতধর্মে ক্ষোভ প্রকাশের চিরন্তন পন্থা সে কথা কে বলিবে?

গান্ধীজি বা রবীন্দ্রনাথ কেহই কোন কর্মকে তুচ্ছ বলিয়া অবহেলা করেন নাই। ক্ষুদ্র বৃহৎ যে কাজই তাঁহারা হাতে লইয়াছেন তাহাই অতিশয় যত্নের সহিত সম্পাদন করিতেন। তাইতো দেখি একজনের হাতে ক্ষুদ্র একটি ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় হইয়াছে ·বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, অন্য জনের যত্নে চরকা হইয়াছে ভারতীয় স্বরাজ

সাধনের উপায়। চম্পারনে গান্ধীজি উদয়াস্ত পরিশ্রম করিতেছেন অথচ শত শত মাইল দূরে তাঁহার আশ্রমটির বিবিধ তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রয়োজনের কথা তিনি ভোলেন না। আশ্রম পরিচালকদের ছোট-বড় বিবিধ বিষয়ে খুঁটিনাটি উপদেশ পাঠান নিয়মিত। এমন কি ইহাও লিখিতে ভোলেন না যে, বাতাসের দিক পরিবর্তন হইয়াছে অথবা দুই একদিনের মধ্যে হইবে, সুতরাং মল চাপা দিবার ক্ষেত্রটির স্থান পরিবর্তন প্রয়োজন। আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটি তুচ্ছ। কিন্তু আশ্রমবাসীদের স্বাস্থ্য রক্ষার্থে অবশ্য পালনীয়। অহোরাত্র কঠিন দায়িত্বশীল কর্মের মধ্যে নিমজ্জিত থাকিয়াও গান্ধীজি এই সব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় অবহেলা করিতেন না বলিয়াই বোধ হয় তিনি মহাত্মা হইয়াছেন।

বাহিরের বহু বিচিত্র ক্ষুদ্র বৃহৎ দাবি রবীন্দ্রনাথ সহাস্যে মিটাইয়াও শিলাইদহ-পতিসরে কৃষির উন্নতি ও কৃষকের উন্নতি বিধানের জন্য যে আয়োজন করিয়াছেন তাহা এতই সুদূরপ্রসারী এবং ব্যাপক ছিল যে পুত্র ও জামাতাকে বিদেশ হইতে কৃষিবিশেষজ্ঞ করিয়া আনিয়া সেখানে কর্মে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই আয়োজন করিয়াও তিনি বসিয়া থাকিতে পারেন নাই। এক সময় মনে পড়িল জমির আইলে আনারস গাছ লাগাইলে বিনা ব্যয়ে বিনা পরিশ্রমে কৃষকেরা কিছু বাড়তি অর্থ পাইবেন। তিনি চিঠি লিখিলেন আনারস গাছ লাগাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভুবন-বিখ্যাত কবি হইয়াও তিনি চাষীকে আনারস গাছ লাগাইবার উৎসাহ দিতে যত্নশীল। লোকপ্রীতির এমন আনন্দময় উদাহরণ সুদুর্লভ।

সম্ভব অসম্ভব নানা দাবি সহাস্যে মানিয়া লইতে অভ্যস্ত ছিলেন বলিয়া কবির শরীর মনের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়িত। তাহা সত্ত্বেও তিনি আশ্রিত অনুচর সেবক ও সহকর্মীদের প্রয়োজনের প্রতি সতত সচেতন থাকিতেন। বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ নাই। একটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ করি। শ্রীযুক্ত সাধনা কর ও সুধীর কর 'শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গ' গ্রন্থে লিখিয়াছেন "গুরুদেব ছেলেদের সঙ্গে লাইব্রেরির উপরকার

দোতলায় খড়ের ঘরে থাকিতেন। এই ঘরের ছেলেরা বড় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। তাই তাঁহাকে কিছুকাল সেখানে থাকিতে হইয়াছিল।" অন্তরে কি অপরিসীম স্নেহ থাকিলে কবির মত মানুষের পক্ষে ছাত্রাবাসে অবস্থানের ক্লেশ স্বীকার করা সম্ভব তাহা বুঝি অনুমানও করা যায় না। পুরাকালের গুরুদেব ইহা অপেক্ষা অধিক কিছু কি করিতেন? বিক্ষোভের ফলে এখন আমাদের বিদ্যালয়গুলি অবসন্ন, শিক্ষকগণ চিন্তিত, অনেকে দিশাহারা। কবির মত বিরাট পুরুষ যাহা করিয়াছেন তাহাই আমাদের সামর্থ্যানুসারে ক্ষুদ্র আকারে করিতে পারিলে সমস্যার সুরাহা হইতে পারে। অসহিষ্ণু বিপথগামী বিদ্যার্থীকে স্বপথে ও স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে কবির পথই একমাত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অন্য কোন সার্থক পথ নাই। এমনি অখণ্ড ভালবাসার দ্বারা গান্ধীজিরও নানা কর্ম নিয়ন্ত্রিত হইত। তাহারই একটি উপাখ্যান বলিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব।

জেলে গান্ধীজি একবার দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী জনৈক হাবসী কয়েদীকে সাহায্যকারী পাইলেন। কেহ কাহারও ভাষা বোঝেন না। গান্ধীজির অসুবিধা ঘটাইবার জন্য জেল কর্তৃপক্ষ সচেতনভাবে এই বিচিত্র ব্যবস্থা করেন। গান্ধীজি কিন্তু নিরুদ্বেগ। মুখের ভাষা বুঝিতে না পারিলে কি হইবে, হৃদয়ের ভাষা তো সারা বিশ্বের এক। অল্প দিনের মধ্যেই একটি সুযোগ উপস্থিত হইল। হাবসী কয়েদীকে বিছা জাতীয় কোন বিষধর পোকায় কামড়ায়। সে যন্ত্রণায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে। চিকিৎসার সহজ ও সুলভ ব্যবস্থা তখন জেলখানায় ছিল না। গান্ধীজি উপস্থিত বুদ্ধিমত ক্ষতস্থান চিরিয়া সেখানে মুখ লাগাইয়া খানিকটা রক্ত চুষিয়া ফেলিলেন। ইহাতে কয়েদীটির যন্ত্রণার উপশম হইল। হৃদয়ে কি গভীর ভালবাসা থাকিলে একজন হাবসী কয়েদীর দেহ হইতে মুখ দিয়া বিষাক্ত রক্ত চুষিয়া বাহির করা যায় তাহা বুঝিতে হইলে মানুষের প্রতি যে ভালবাসা থাকা প্রয়োজন তাহার বোধ করি আজ একান্ত অভাব ঘটিয়াছে।

মহাত্মা ১৯৪৫ সনের ১৮ই ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে দীনবন্ধু এনড্রুজের নামে উৎসর্গীকৃত হাসপাতালের ভিত্তিশিলা স্থাপন করেন। এই উপলক্ষে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহাও গান্ধী রবীন্দ্রনাথ সম্পর্ক বুঝিবার পক্ষে বিশেষ মূল্যবান। তিনি অকুণ্ঠচিত্তে ঐ সভায় বলেন, "শান্তিনিকেতন আমার শান্তির তীর্থ।" দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর গান্ধী-পরিবারকে এইখানে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া এই স্থানে আসা তাঁহার নিকট তীর্থযাত্রার ন্যায় আনন্দকর। গান্ধীজিকে আমরা শান্তির দূত বলিয়া জানি। তিনি শান্তিনীতি অনুশীলনে এবং তাহার পুষ্টিসাধনের প্রেরণা যে কবি ও শান্তিনিকেতন হইতে পান ইহা বলিতেও গান্ধীজির কোন দ্বিধা হয় নাই। গান্ধী মানস গঠনে এবং তাহার কর্ম নিয়ন্ত্রণে কবির প্রভাব অনন্যতুল্য। এই সম্পর্কে বিস্তারিত অধ্যয়ন অনুধ্যানের অবকাশ রহিয়াছে। জাতির কল্যাণপথের সন্ধান করিতে হইলে এই দুইটি উৎসমূলে সর্বাগ্রে অভিনিবিষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

নবীন ভারতের কবিকুলচূড়ামণি রবীন্দ্রনাথ ভারতাত্মার বাণীমূর্তি। ভারত-ইতিহাসের আদিকালের সাধনালব্ধ জ্ঞান "যোগঃ কর্মসু কৌশলম্" গান্ধীমহারাজের ত্যাগপূতঃ সেবাময় সত্যময় জীবনে নবরূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। উভয়ের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কাজের মধ্যে ভারতধর্মের অপরূপ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। একই সময়ে এই দুই ভারতঋষির ভারতবর্ষে আবির্ভাব, তাঁহাদের মহাজীবন নাট্যের আপাতবিভিন্নতা সত্ত্বেও মূল বর্ণ ও গন্ধ, ছন্দ ও সুষমা এক অখণ্ড সত্য ও ভারতীয় চেতনার স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত। ভারতের অনাগত যুগের বাণীর সাধকগণ, কর্মের যোগীকুল এই দুই মহাজীবনের পাতা হইতে বিশল্যাকরণী আহরণ করিয়া বর্তমানের শক্তিশেলবিদ্ধ সভ্যতার দেহে প্রাণসঞ্চার করিবেন। ঈশ্বর সেই সুদিন নিকটতর করুন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও মহাত্মা

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে হৃদ্যতা বহুদিনের মহাত্মা গান্ধী পুণ্যশ্লোক গোপালকৃষ্ণ গোখলেকে 'গুরু' বলিয়া অভিহিত করিতেন। গোখলে ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁহারই মাধ্যমে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে আচার্যদেবের সঙ্গে মহাত্মাজির পরিচয় ঘটে। এই পরিচয় ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হয়। মহাত্মা গান্ধীর রাজনীতি ছিল প্রচলিত রাজনীতি হইতে ভিন্ন ধরণের। তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে গঠনমূলক, তথা রচনাত্মক কার্যকে বরাবর উচ্চ স্থান দিয়েছেন। এই রচনাত্মক কার্যব্যপদেশেই অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ঐকান্তিক সহযোগিতা স্থাপিত হয়। আচার্যদেব আমৃত্যু খদ্দর প্রচলন, গ্রাম উন্নয়ন, শিল্প সংগঠন, জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা রূপায়ণ প্রভৃতি কার্যে একান্ত ভাবে নিযুক্ত থাকিয়া এই সহযোগিতার ভিত্তিকে দৃঢ় ও প্রসারিত করিয়াছিলেন।

বেলগাঁও কংগ্রেসে (১৯২৪) খদ্দর নীতি গৃহীত হয়। বস্তুতঃ ইহার পূর্ব হইতেই মহাত্মা গান্ধী খদ্দর আন্দোলন আরম্ভ করেন। দেশবাসী প্রথমে ইহার গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে নাই। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রও এ বিষয়ে সন্দিগ্ধ ছিলেন। কিন্তু ১৯২১ সনে

খুলনার দুর্ভিক্ষে ত্রাণ কার্য করিতে গিয়া তিনি বুঝিতে পারেন বর্তমান অবস্থায় একমাত্র চরকার দ্বারা আমাদের দেশের কর্মহীন লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর নরনারীর সামান্য কিছু আয় করা সম্ভব। এ সম্পর্কে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর তারিখে কলিকাতার 'সুর সভার' প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে প্রফুল্লচন্দ্রের অভিভাষণটি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন—

I confess when Mahatma Gandhi first promulgated his cult of Charka I looked askance and shook my head. Any one has only to visit the Banga Lakshmi Mills and watch the revolution of the spindles per minutes and see what modern machinery can achieve. I must confess I have to revise my estimate of Charka, especially in view of the lessons I have gained from the Khulna famine··· ··· ··· ···I am of opinion that the Charka should prove the salvation. (ক্রণিকল ১০ অক্টোবর ১৯২১)।

একবার কোন বিষয়ে প্রফুল্লচন্দ্রের প্রত্যয় জন্মিলে সমগ্র মন প্রাণ দিয়াই তিনি তাহা করিতেন। চরকার প্রতি তাঁহার বিশ্বাস এতই দৃঢ় হয় যে, ইহা লইয়া রবীন্দ্রনাথের সহিত বাক্-বিতণ্ডা করিতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ চরকার প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ সমীচীন বোধ করেন নাই। বিশেষতঃ স্বরাজ সাধনার সঙ্গে চরকার সম্পর্ক বিষয়ে তিনি সন্দিহান ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন "চরকার সঙ্গে স্বরাজকে জড়িত করে স্বরাজ সম্বন্ধে দেশের জনসাধারণের বুদ্ধিকে ঘুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে।" স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীও শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের এই বিষয়ক মতবাদের প্রতিবাদ করেন। রবীন্দ্রনাথের চরকা বিষয়ক এক প্রবন্ধের সমালোচনা করিয়া গান্ধীজি লেখেন—

"Swaraj has no meaning for the millions if they do not know how to apply their enforced idleness."

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, চরকা লইয়া মতবিরোধ সত্ত্বেও

কবির সঙ্গে বিজ্ঞান সাধকের সম্প্রীতি কোন দিন ক্ষুণ্ণ হয় নাই। রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবে প্রফুল্লচন্দ্রের ভূমিকা এবং প্রফুল্ল-জয়ন্তী উৎসবে রবীন্দ্র-নাথের ভূমিকা হইতেই ইহা স্পষ্ট হয়। ক্ষুদ্র হইলেও অসামান্য গুরুত্বপূর্ণ আরও একটি ঘটনা—এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে। প্রফুল্লচন্দ্রের খুলনা দুর্ভিক্ষ ত্রাণ তহবিলে রবীন্দ্রনাথ ৫০০৲ টাকা প্রেরণ করেন। আলফ্রেড থিয়েটারে বক্তৃতা দিয়া তিনি উক্ত টাকা সংগ্রহ করেন। প্রফুল্লচন্দ্রের কার্যের প্রতি ইহা কবির শ্রদ্ধার নিদর্শন রূপে স্বীকৃত।

খদ্দর প্রচারে আচার্যদেব সত্যই ক্লান্তিহীন ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীও আচার্যের খদ্দর সমর্থন বিশেষ মূল্যবান মনে করিতেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে 'ইয়ং ইণ্ডিয়ায়' গান্ধীজি লেখন—"Dr. P. C. Ray's frank recognition of charka is a valuable acquisition." ডক্টর পি. সি রায়ের খোলাখুলি চরকা সমর্থন মূল্যবান।

বাংলা দেশে খদ্দর সহ সকলপ্রকার গঠনমূলক কর্মের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল খাদি প্রতিষ্ঠান। ইহা সংগঠনে প্রফুল্লচন্দ্রের অবদান সম্পর্কে দেশবাসী সম্যকরূপে সচেতন ছিলেন না। কিন্তু এই খাদি প্রতিষ্ঠান বস্তুতঃ আচার্যের উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয়। জীবনের শেষ-ভাগে তিনি প্রতিষ্ঠানের সোদপুরস্থ কেন্দ্রে মধ্যে মধ্যে অবস্থান করিতেন। বেঙ্গল কেমিক্যালে প্রফুল্লচন্দ্রের যে শেয়ার ছিল তাঁহার অধিকাংশ তিনি খাদি প্রতিষ্ঠানে দান করেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই জানুয়ারি 'দি ফরওয়ার্ড'-এ আচার্যদেবের স্বাক্ষর যুক্ত নিম্নলিখিত আবেদনটি প্রকাশিত হয়।

"KHADI PRATISTHAN"

I am orgranising Khadi work in Bengal through Khadi Pratisthan. Arrangements have been made to supply kapas, hand spinning machines and all spinning appliances from the Pratisthan. Besides this, Khadi production and distribution are also being opened. Those who have surplus stock

of Sudha Khadi for disposal or those who want to keep a stock of Khadi for sale or need help for Sudha Khadi production will please communicate with the Secretary, Khadi Pratisthan, 39, Charakdanga Road, Narikeldanga, Calcutta.

আবেদনখানি হইতেই সুধী পাঠক অনুমান করিতে পারিবেন খদ্দর প্রচলনে কি অপরিসীম নিষ্ঠার সঙ্গে আচার্যদেব ব্রতী হইয়াছিলেন।

কেবল মাত্র খাদি প্রতিষ্ঠান নহে, বাংলার অনেক ছোট বড় খদ্দর কেন্দ্র প্রফুল্লচন্দ্রের অকৃপণ সাহায্য লাভ করিয়াছিল। প্রফুল্লচন্দ্র নীরব দাতা ছিলেন। আত্মপ্রচার গোপনে নিপুণ এই ঋষির ডান হাত দান করিত কিন্তু বা হাতটি পর্যন্ত তাহা টের পাইত না। ফলে সব কথা জানিবার উপায় নাই। সামান্য কিছু যাহা জানা গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের অভয় আশ্রম আচার্যের আশীর্বাদ ও অর্থ সাহায্য লাভ করিয়াছিল।

বঙ্গদেশে খদ্দর আন্দোলনে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি প্রফুল্লচন্দ্র গন্ধীজিকে এ বিষয়ে যে পত্র লেখেন নানা কারণে তাহা এই দুই মহাপুরুষের সম্পর্ক জানিবার পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পত্রখানি নিম্নে মুদ্রিত হইল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সহকর্মী খুলনা দুর্ভিক্ষ ত্রাণ সমিতির সদস্য কুঞ্জলাল ঘোষ মহাশয়ের সৌজন্যে ইহার একটি নকল পাইয়াছি। মহাত্মার তারবার্তা পাইয়া আচার্যদেব এই পত্রখানি লেখেন।

My dear Mahatmaji,

I purposely abstained from going to Sassoon Hospital on a pilgrimage or even writing to you, as I thought that so long as you were confined to bed you should not in any way be disturbed. But your kind wire induces me to break the vow I impose upon myself.

I confess I have been watching all the rejoicings and outbursts of enthusiasm in Bengal on the occasion of your release with mixed fillings. Our people are nothing if not emotional and sentimental, and the frothy effervescence will soon subside leaving not a trace behind. Of the thousands who are flocking to the public meeting to attend the Gandhi celebrations, barely one per cent is clad in Khaddar. What a contrast to the sight which greeted my eyes at Coconada where I found thousands, drawn from the humblest classes and coming from the remotest villages, flocking to Gandhinagar and full 90 per cent of them were clad in pure home spun ! Nor do I find any serious and sustained effort to remove the course of untouchability. Everyone is for a royal road to Swaraj and would avoid the thorny and terious path. It is not for me to pronounce any opinion on the advisability or otherwise of the return by Congressmen to the Councils ; but this much I may be permitted to say that if a portion of the energies which have been spent over this office had been diverted to the constructive programme sketched out by you, the way to Swaraj would have been by this time considerably shortened.

You will probably remember that when the Malavya Conference was in session at Bombay it was my privilege and pleasure to sit by your side for hours together for two consecutive days ; and I promised to do my utmost to carry the message of Khaddar to my Bengalee countrymen and so also to take practical steps towards its production. Thanks to the co-operation and devoted services of a band of self-less workers. I have been able to do a little ; but the work is up-hill and requires almost infinite patience and superhuman

efforts to achieve success. The more, however, I work in this direction the more convinced I am becoming that in Charka lies the economic salvation of India. And in my Coconada address on the "Message of Khaddar" I tried to elaborate this point. It gladdens me to find that in your letter to the Maulana Sahib you have laid particular stress on the Charka as the only remedy for India's growing pauperism.

I must stop here and should not intrude further upon your repose. I need scarcely add that my heart yearns after you; but for the present, I must deny myself the pleasure of paying you a visit.

May God soon restore you to full health so that you may once again guide the future destiny of your nation.

University College of Science,
92. Upper Circular Road.
Calcutta 11-2-24.

Yours very sincerely,
Sd/- P. C. Ray.

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে খদ্দর প্রচলন ও অন্যান্য বিষয় লইয়া অনেক চিঠিপত্রের আদান প্রদান হয়। কিন্তু সেগুলি আজকাল দুষ্প্রাপ্য। আচার্যদেব নিজে কিছু যত্ন করিয়া রাখিতেন না শুনিয়াছি। তাঁহার স্বজেলাবাসী (খুলনা) কয়েকজন সেবক সামান্য কিছু যাহা রাখিয়াছিলেন তাহাও পাকিস্থান হইবার পর বিনষ্ট হইয়াছে। কাহারও নিকট কিছু থাকিলেও এখন পাওয়া সহজ নহে। উপরোক্ত কুঞ্জলাল ঘোষ মহাশয় রক্ষিত কিছু কাগজ পত্রের মধ্যে খুলনা দুর্ভিক্ষের সময় আচার্যদেবকে লিখিত মহাত্মার একখানি পত্র পাইলাম। পত্রখানিতে আচার্যদেবের প্রতি মহাত্মা গান্ধীর গভীর শ্রদ্ধা প্রকটিত হইয়াছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও মহাত্মা গান্ধীর সম্বন্ধ নির্ণয়ে পত্রখানির মূল্য অনস্বীকার্য। অতএব ইহা এখানে প্রকাশিত করিলাম। পত্রখানি পূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই।

Erode
25th September, 1921

Dear Dr. Ray,

I received your letter only this morning. As you will see from the stamps on the envelop it had a chequered career.

Between now and the date of your letter much time has elapsed I observe too that you have large subscription from Jamal Bros. and Birla Bros. What is the position now ? How is it that big Zemindars of Bengal do not bear such burdens ? Whilst it is good that all India shares the burden with Bengal why should the latter not shoulder the whole when she is well able to ?

I do not want to have a long chat with you and feel for myself that you are the same simple, noble soul I knew in 1901. and on my part to assure you that I had not gone down during all these twenty years since we met.

Yours sincerely.
Sd/- M. K. Gandhi

গান্ধীজি লিখিত এই সিম্পাল এণ্ড নোবল সোল প্রফুল্লচন্দ্র মহাত্মাকে কি ভাষায় আখ্যাত করিতেন তাহার পরিচয় অপ্রতুল নহে। একটি মাত্র উদাহরণ এখানে উল্লেখ করিব। কোকনাদে খাদি ও হস্তশিল্পে প্রদর্শনী উদ্বোধনে (২৫শে ডিসেম্বর ১৯২৪) আচার্যদেব যে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন তার উপসংহারে তিনি বলেন—

"As I conclude, my eyes are turned to Yarveda gaol—inside the iron bars of which lies encased the mortal frame of the patriot—Saint of modern India the purest and noblest soul that ever drew breath, he who thought and preached and lived on the gospel of India's salvation".

ইহার পর কোনো মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

মহাত্মার কটিবাস আমরা দেখিয়াছি। কেবল আমরা নই, বিংশ শতাব্দীর সারা পৃথিবী বিস্ময়ে তাহা দেখিয়াছে। কিন্তু গান্ধীজির এই কটিবাস গ্রহণের সংকল্প আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের দ্বারা যে দৃঢ় হয় তাহা বহুজন বিদিত নহে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই অক্টোবর তারিখের অমৃত বাজারে 'My Loin Cloth' শীর্ষক গান্ধীজির একটি প্রবন্ধ নবজীবন পত্রিকা হইতে পুনঃ প্রচারিত হয়। তাহার একস্থানে আছে—

"When on behalf of the famine Stricken at Khulna I was twitted that I was burning cloth utterly regardless of the fact that they were dying of hunger and nakedness I felt that I should content myself with a mere 'loin cloth' sending all my shirt and dhoti to Dr. Ray for the Khulna famine."

মহাত্মা গান্ধীর কটিবাস ঐতিহাসিক ঘটনা। সে ঘটনার পটভূমিকায় ইহা নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ।

মহাত্মা গান্ধী ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র উভয়েই ঐতিহাসিক পুরুষ। মহাত্মা মূলত রাজনীতিক আর প্রফুল্লচন্দ্র জ্ঞান তাপস—সমাজ সেবী। ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজির আবির্ভাবের পর রাজনীতি ও সমাজ সেবার মধ্যে খুব স্পষ্ট ভেদ রেখা টানা সম্ভব হয় নাই। কোন পরাধীন জাতির পক্ষে বোধ হয় তাহা করাও সম্ভব নহে। সেবার ক্ষেত্রে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রও সীমাবদ্ধ থাকিতে পারেন নাই। জাতীয় শিক্ষা পরিষদে এক বক্তৃতায় তাঁহাকে বলিতে শুনি—

"The effect of the modern syestem of university education in which the Indian children were brought up, was that it killed and repressed our national consciousness and made us totally forget our existence as a nation". রাজনৈতিক চেতনার প্রধানতম পথ তো ইহাই।

১৩ই ডিসেম্বর ১৯২১ তারিখের এক পত্রে তিনি দেশবন্ধুর সহধর্মিণীকে লিখিতেছেন—

"I can assure you however dear sister, that in saving my favourite science I have only one idea in my mind, namely, that through her I should serve my country ··· ··· I have no other object in my life."

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র খাঁটি বৈজ্ঞানিক ছিলেন। স্বদেশের উন্নতিকল্পে বিজ্ঞান সাধনা একান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিয়াই তিনি প্রথমজীবনে ইহাতে ব্রতী হন। জীবনের শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞান সাধনায় রত থাকিয়া তিনি স্বদেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর রচনাত্মক কার্যের মধ্যে তাঁহার জীবন দর্শনের স্পর্শ পাইয়াছিলেন এবং আপাত-দৃষ্টিতে আধুনিক বিজ্ঞান প্রসূত যন্ত্রপাতি এবং চরকার মধ্যে অসামঞ্জস্য বা বৈসাদৃশ্য মনে হইলেও, বস্তুতঃ, স্বদেশসেবার পক্ষে উভয়েরই প্রয়োজনীয়তা অসামান্য। ভারতবর্ষের বিপুল জনসমাজের অর্থনীতিক উন্নতি সাধনে চরকা যে পরম সহায় হইতে পারে মহাত্মা গান্ধীর এই প্রত্যয় ক্রমে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রেরও বিশ্বাসে পরিণত হয়। স্বদেশপ্রেম উভয়েরই কার্যের নিয়ামক এবং এই দিক দিয়া তাঁহারা ভিন্ন পথের পথিক হইয়াও সত্যকার সতীর্থ।

পড়াশুনা

জনৈক পাশ্চত্ত্য লেখক মন্তব্য করিয়াছেন,— কোন অঞ্চলের সাধারণ গ্রন্থাগার হইতে কি ধরণের বই পাঠকেরা পড়িবার জন্য নেন তাহা দেখিয়াই সেখানকার জনসাধারনের রুচি ও নীতি সম্পর্কে একটা নির্ভর-যোগ্য ধারণা করা যায়। ব্যক্তিমানুষের জীবনেও এই মন্তব্যটি সমভাবে প্রযোজ্য। আমরা আমাদের রুচি অনুযায়ী পড়াশুনা করি। দার্শনিক ইম্যানুয়েল কাণ্ট সারাজীবনে মাত্র তিনটি দিন উপন্যাস পাঠে ব্যয় করিয়াছিলেন। এই তিনটি দিনের জন্যও তাঁহার কত দুঃখ। আবার অনেকে আমরা গল্প উপন্যাস গোয়েন্দা-কাহিনী ছাড়া অন্য কিছু পড়িই না। সুতরাং মানুষ কি পড়ে তাহা জানিলে মানুষটিকে জানা ও বুঝা সহজতর হয়। আমরা তাই এখানে গান্ধীজির পড়াশুনা লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনার দ্বারা তাঁহাকে জানিবার চেষ্টা করিব। ইহা হইতে জীবন গঠনের পাথেয়ের সন্ধান মেলে।

প্রারম্ভে একটা কথা বলা দরকার। সূর্যোদয়ের বহুপূর্বে, সাধারণত রাত্রি চারি ঘটিকা হইতে গান্ধীজির দৈনন্দিন কাজকর্ম সুরু হইত। তখন হইতে রাত্রে শয্যাগ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র সময়টাতে নানা কাজের এমনই চাপ ছিল যে তিনি পড়াশুনা করিবার পর্যাপ্ত সময় পাইতেন না। অথচ পড়িবার জন্য তাঁহার এত প্রবল আগ্রহ ছিল যে স্নানের পূর্বে তৈল মাখার সময় এমন কি পায়খানাতে বসিয়াও তিনি কিছু কিছু

পড়াশুনা করিতেন। এক সময়ে তেল মাখিতে তাঁহার একঘণ্টা সময় ব্যয় হইত। অপরে তাঁহাকে তেল মাখাইয়া দিতেন। এই সময় গান্ধীজি একখানি প্রাকৃতিক চিকিৎসার বই পড়িতেন। পায়খানায় বসিয়া খবরের কাগজ দেখিতেন বা বাংলা শিখিতেন। অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে ইহা তাঁহার 'গান্ধী চরিত' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। একদিকে গান্ধীজির সময়ের অভাব অপর-দিকে কেতাবী জ্ঞানের উপর তাঁহার আস্থাহীনতা – এই উভয় কারণে সাধারণ্যে একটা ভাসা ভাসা ধারণা আছে যে মহাত্মা গান্ধীর পঠিত বইয়ের সংখ্যা বোধ হয় বেশী নহে। কিন্তু আসলে তিনি বিচিত্র বিষয়ে বিস্তর পড়াশুনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পঠিত নানা বিষয়বস্তুর বিপুল সংখ্যক পুস্তকের কথা মনে করিলে বিস্ময়ে হতবাক হইতে হয়। জীবনভোর কাজের মধ্যে আকণ্ঠ ডুবিয়া থাকিয়া তিনি এত পড়িলেন কেমন করিয়া! আবার যেমন তেমন করিয়া পড়া নয়। গান্ধীজি বলিয়াছেন "অল্প পুস্তক যাহা পড়িয়াছি তাহা আমি ভালরকম হৃদ্গত করিয়াছি এ কথা বলিতে পারি।"

অনেকগুলি বই আধখামচা করিয়া পাঠ করা অপেক্ষা একখানা বই ভালভাবে পড়িলে অধিক জ্ঞানলাভ হয়। গান্ধীজি স্বাভাবিক বিনয়ে অল্প পুস্তক পাঠের উল্লেখ করিলেও বস্তুতঃ তিনি বিপুল সংখ্যক বই ভালভাবে পড়িয়াছেন। এক্ষেত্রেও গান্ধীজি মহাবিস্ময়কর মানুষ। তাঁহার নিজের রচনাবলী, মহাদেব দেশাইয়ের ডায়েরি, প্যারেলালজি প্রভৃতির লেখা হইতে গান্ধীজির অধ্যয়ন বিষয়ে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। এ বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা ও গবেষণা করিলে গান্ধীজীবনের ক্রমবিকাশের উপর নূতন আলোকপাত হইতে পারে। এই প্রবন্ধের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। সুতরাং কয়েকটী নির্বাচিত বিষয় ও অল্প কিছু বই লইয়াই এখানে আমরা আলোচনা করিব।

মহাত্মা গান্ধী নিজের পড়াশুনায় বিষয়ে যারবেদা জেল হইতে একখানি পত্রে (১৩ই জুলাই ১৯৩২) লেখেন ঃ

I would surely like to read literature At School I could not go beyond the School lessons. After that I have been so busy with onething or another that there was little time to read outside prison. In prison only I was able to read something. But I do not think I have lost much on this account. For, if I could not read, I could think a great deal, and the school of life is any way superior to the School of books. গান্ধীজি বই পড়িতে ভালবাসিতেন। স্কুলে পাঠ্য পুস্তকের বাহিরে কিছু পড়িবার সুযোগ পান নাই। তাহার পর এ-কাজে সে-কাজে এতই ব্যস্ত হইয়া পড়েন যে জেলের বাহিরে পড়িবার অবসর ঘটিত না। গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকায় ২৪৯ দিন এবং ভারতে ২০৮৯ দিন—মোট ২৩৩৮ দিন কারাবাস করেন। জেলের এই দিন গুলিতে তিনি কিছু কিছু পড়াশুনা করেন। এজন্য তাঁহার কোন অনুতাপ ছিল না। পড়িবার সুযোগ না হইলে চিন্তা করিতেন এবং জীবন হইতে পাঠগ্রহণ বই পড়া অপেক্ষা তিনি শ্রেয়তর মনে করিতেন। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবও প্রায় অনুরূপ কথা বলিয়াছেন—পড়ার চেয়ে শোনা ভাল, শোনার চেয়ে দেখা ভাল। এই স্তরের মানুষের বেশী পড়াশুনার প্রয়োজন হয় না। তথাপি গান্ধীজির পড়াশুনা বিস্তর।

ছাত্রজীবনে পাঠ্যপুস্তক ভিন্ন আর যে বিশেষ কিছুই পড়েন নাই গান্ধীজি তাহা আত্মজীবনীতে অকপটে বিবৃত করিয়াছেন। গল্পের বই পড়া কিশোর বয়সের নানা নেশার অন্যতম। গান্ধীজির তাহাতেও কোন আকর্ষণ ছিল না। সম্ভবতঃ 'শ্রবণের পিতৃভক্তি' পুস্তিকাখানি তাঁহার স্কুলের পড়ার বাহিরে পঠিত প্রথম পুস্তক। অন্ধ মাতাপিতার প্রতি শ্রবণের অনন্যসাধারণ সেবা কিশোর গান্ধীর চিত্তে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ঐ সময়ে তিনি হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান লইয়া রচিত যাত্রাভিনয় দেখেন। পিতৃভক্ত শ্রবণ ও সত্যাশ্রয়ী

হরিশ্চন্দ্রের মধ্যে গান্ধীজির প্রতিবিম্ব আমরা এখন সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাই না কি?

কয়েকখানি ছোট বড় ধর্মগ্রন্থ তিনি এই সময় হয় নিজে পাঠ করেন নতুবা অপরের কণ্ঠে শোনেন। সে সকল বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকখানি হইল—রামরক্ষা, রামচরিত মানস, তুলসীদাসের রামায়ণ এবং বিষ্ণুর সহস্রনাম। বিশ্বেশ্বর লোধা নামক জনৈক ভক্তের সুমিষ্ট কণ্ঠে তিনি রামায়ণ পাঠ শোনেন। মুগ্ধ হইয়া তিনি তুলসীদাসের রামায়ণকে ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের মর্যাদা দেন। ছাত্রাবস্থায় রাজকোটে অবস্থানকালে তিনি ভাগবত পাঠ শোনেন। ইহাও এক দুলর্ভ সৌভাগ্য। এই প্রসঙ্গে শ্যামল ভট্টের নীতি কবিতার কথাটিও মনে পড়ে। আত্মজীবনীতে গান্ধীজি এই কবিতা হইতে কয়েক পঙক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতেই বুঝিতে পারি শ্যামল ভট্ট তাঁহার উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মনুসংহিতা তিনি অনুবাদে পড়েন। ইহা তাঁহার চিত্তে সংশয়ের সঞ্চার করে। তিনি নাস্তিকতার দ্বারা প্রলুব্ধ হইলেন। সবকিছুই স্বীয় বুদ্ধির আলোকে বিচার করিবার প্রবণতা তাঁহাকে পাইয়া বসে। জনৈক আত্মীয়ের নিকট তিনি এ বিষয়ে কিছু প্রশ্ন উপস্থিত করিলে চিরাচরিত উত্তর পাইলেন—"বয়স হইলে এই সকল প্রশ্নের উত্তর বুঝিতে পারিবে।" এই উত্তরে গান্ধীজির চিত্ত শান্ত হইল না। তিনি আপন বুদ্ধিতেই সিদ্ধান্ত করিলেন—"এই জগৎ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং নীতিমাত্রেরই প্রতিষ্ঠা সত্যে।" সত্যসন্ধ গান্ধীর জীবনে সত্যের অনুসন্ধান পূর্বেই সুরু হইয়াছিল।

মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও কর্মে যে সকল পুস্তকের প্রভাব সর্বাধিক সেগুলি দৈবক্রমে তাঁহার হাতে আসিয়াছে। এমন কি পরবর্তী জীবনে যে শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা তিনি নিত্য অধ্যয়ন করিতেন তাহাও তিনি প্রথম পাঠ করেন ছাত্রাবস্থায় বিলাতে অবস্থানকালে জনৈক থিয়োসফিষ্ট

বন্ধুর নির্দেশে। গীতার আদর্শে গান্ধীজি স্বীয় জীবন গঠন করেন। স্থিতপ্রজ্ঞের শ্লোকগুলি ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিত্য প্রার্থনার মন্ত্র হয় জীবনের হতাশাপীড়িত ও সন্দেহজর্জর মুহূর্তগুলিতে তিনি গীতার মধ্যে আশ্রয় খুঁজিতেন,—পাইতেনও। গীতা-নির্দেশিত জীবন যাপনের জন্য তাঁহার তীব্র আকুতি ও সন্নিষ্ঠ সাধনা গভীর শ্রদ্ধা ও পরম বিস্ময়ের উদ্রেক করে। ভারতীয় হিন্দুর নিকট গীতা অতি পবিত্র ও অমূল্য ধর্মগ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত। গান্ধীজি বলিতেন—"I am Hindu first and therefore a true Indian." সর্বাগ্রে আমি হিন্দু এবং সেজন্যই আমি খাঁটি ভারতীয়। আর খাঁটি হিন্দুর জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় গীতা গ্রন্থের দ্বারা।

গান্ধীজি ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন, কিন্তু ধর্মের গোঁড়ামী ছিল না। ভারতীয় হিন্দুর ন্যায় গীতা তাঁহার নিত্য পাঠ্য ছিল, কিন্তু অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ হইতেও তিনি নিয়মিত পাঠ করিতেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-বিধ্বস্ত নোয়াখালির গ্রামে গ্রামে পদযাত্রাকালে (১৯৪৬-৪৭) গান্ধীজির গীতাপাঠের সূচী ছিল নিম্নরূপ ঃ

অধ্যায়	১, ২	—শুক্রবার
”	৩, ৪, ৫	—শনিবার
”	৬, ৭, ৮	—রবিবার
”	৯, ১০, ১১, ১২	—সোমবার
”	১৩, ১৪, ১৫	—মঙ্গলবার
”	১৬, ১৭	—বুধবার
”	১৮	—বৃহস্পতিবার

বিশেষ বিশেষ দিনে সম্পূর্ণ গীতা পাঠের ব্যবস্থা থাকিত। এই রকম একটা চিহ্নিত দিন ছিল প্রতি ইংরেজি মাসের ২২ তারিখ। ২২শে ফেব্রুয়ারি (১৯৪৪) গান্ধীপত্নী কস্তুরবা বন্দী অবস্থায় ইংরেজ কারাগারে (আগা খাঁ প্রাসাদে) পরলোক গমন করেন। কস্তুরবার স্মরণে তাঁহার ইংরেজি মৃত্যু তারিখটিতে পুরা গীতাখানি পঠিত হইত।

গান্ধী-শিবিরে গীতাপাঠের এই সূচী গৃহীত হইবার পূর্বেও গান্ধীজি প্রত্যহ একটু একটু করিয়া পনের দিনে সাতশত শ্লোকের পূর্ণ গ্রন্থখানি সমাপ্ত করিতেন। গীতা গ্রন্থকে তিনি মাতৃস্বরূপা এবং সদ্‌গুরু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অনাসক্তিযোগ বা গীতাবোধ গ্রন্থখানি গীতামহামন্ত্রের গান্ধী ভাষ্য। গান্ধী-চরিত্র অনুধাবনে যত্নশীল মানুষকে এই বইখানি গভীর অভিনিবেশ সহকারে পড়িতেই হইবে।

মহাত্মা গান্ধীর পিতৃদেব শেষ বয়সে গীতাপাঠ করিতেন। তখন ইহা গান্ধীজির উপর কোন প্রভাবই বিস্তার করিতে পারে নাই। পূর্বেই আমরা জানিয়াছি, বিলাতে থিয়োসফিষ্ট বন্ধুদের নিকট গীতার মাহাত্ম্য শুনিয়া তাঁহাদেরই আহ্বানে স্যার এড্‌উইন আর্ণল্ডের গীতার ইংরেজি অনুবাদ 'দি সঙ সিলেটিয়ান' প্রথম পাঠ করেন। ক্রমান্বয়ে তিনি অনুবাদে ও সংস্কৃতে আরও অনেকগুলি গীতা পড়িয়াছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকিবার সময় তিনি গীতা কণ্ঠস্থ করিতে প্রয়াসী হন। ত্রয়োদশ অধ্যায় পর্যন্ত তাঁহার মুখস্থ ছিল। এ জন্য তিনি একটি অভিনব পন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কয়েকটি শ্লোক একখানি কাগজে লিখিয়া স্নানের ঘরের দেওয়ালে ঝুলাইয়া দিতেন; দাঁত মাজা এবং স্নান করিবার সময় সেগুলি বারংবার আবৃত্তি করিয়া মুখস্থ করিতেন। গান্ধীজি ছোটবেলায় সংস্কৃত তেমন শেখেন নাই। পরিণত বয়সে চর্চার দ্বারা সংস্কৃতের জ্ঞান বাড়ান এবং মুখ্যতঃ দক্ষিণ ভারতের পণ্ডিতদের নিকট নির্ভুল উচ্চারণ শেখেন।

লণ্ডনে গীতা পাঠের সঙ্গে থিওসফী আন্দোলনের কিছু বইপত্র পড়েন। ইহার মধ্যে মাদাম ব্লভাটস্কীর A Key to Theosophy বইখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আধ্যাত্মিক জ্ঞান-লাভের বা ঈশ্বর-দর্শনের এই পদ্ধতির মধ্যে তিনি কোন প্রেরণা পাইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। প্রায় সমসময়ে তিনি বাইবেল প্রথম পাঠ করেন। প্রথম অংশ পড়িয়া কোন আনন্দ পান না, কষ্টে উহা পড়েন। কিন্তু সারমন অন দি মাউণ্ট তাঁহাকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল।

বিলাতে বিদ্যার্থী গান্ধী পাঠ্যাতিরিক্ত যে বইখানি প্রথম পড়েন তাহা হইল নিরামিষ আহার-তত্ত্বের ক্ষুদ্র একখানি পুস্তক। আহার ও স্বাস্থ্য বিষয়ে গান্ধীজি বিস্তর পড়াশুনা করিয়া নিজের মত গঠন করেন। অবশ্য গান্ধীজি কেবল পুস্তকের উপর নির্ভর করিতেন না। তিনি নিজে পরীক্ষা করিয়া নিঃসন্দেহ হইতে না পারিলে কোন কিছু প্রকাশ করিতেন না। ইহার বিস্তারিত আলোচনা বর্তমান প্রসঙ্গে অপ্রয়োজনীয়। তবে গান্ধীজির Key to Health, Diet and Diet Reform, প্রভৃতি পুস্তকে যে তথ্যাদি পরিবেশন করিয়াছেন তাহার ভিত্তি হইল—নিজের বাস্তব ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার সহিত আহারতত্ত্ব ও খাদ্যাখাদ্য সম্পর্কে বিস্তর পড়াশুনা।

নিরামিষ আহার প্রসঙ্গে হেনরি সল্টের এ প্লী ফর ভেজিটেরিয়ানইজম বইখানি গান্ধীজি প্রথম পড়েন। তিনি লিখিতেছেন: "সল্টের পুস্তক আহার [নিরামিষ] সম্বন্ধে আমার জানিবার ইচ্ছা বাড়াইয়া দিল।" নিরামিষ আহার বিষয়ে তিনি যত বই সংগ্রহ করিতে পারিলেন সবই বিশেষ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করেন। ইহার সহিত তাঁহার একটি ব্যক্তিগত সমস্যা জড়িত ছিল। বিলাতযাত্রাকালে মাতৃদেবীর নিকট তিনি তিনটি প্রতিশ্রুতি দেন। তাহার একটি ছিল,—মাংস বা আমিস আহার করিবেন না। শীতপ্রধান দেশে মাংস আহার না করিয়া কেহ সুস্থ থাকিতে পারেন না বলিয়াই সাধারণের ধারণা ছিল। সেজন্যই তাহারা গান্ধীজিকে মাংস খাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেন। নিরামিষ সুখাদ্যের অভাব এবং এই পীড়াপীড়ি প্রভৃতি মিলিয়া মাতৃদেবীকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়া চলা গান্ধীজির নিকট ক্লেশকর কার্য বলিয়া মনে হইতেছিল। কিন্তু সল্টের বইখানা পড়িয়া তিনি যেন অকূল সমুদ্রে কূল পাইলেন। এতদিন কর্তব্যবুদ্ধির দাবিতে বস্তুতঃ নিরানন্দ চিত্তে যাহা করিতেছিলেন আজ তাহার একটা দৃঢ় নৈতিক ভিত্তি তিনি লাভ করিলেন। তিনি কেবল নিরামিষ আহারেই যে সন্তুষ্ট রহিলেন তাহা নহে, নিরামিষ আহার

আন্দোলনের সহিত সক্রিয়ভাবে যুক্ত হইয়া পড়িলেন। এ বিষয়ে অপর যে বইখানার কথা তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হইল হাওয়ার্ড উইলিয়মের 'দি এথিকস্ অব ডায়েট'। এ বইখানিতে বিভিন্ন যুগের জ্ঞানী, গুণী ও মহাপুরুষদের আহার্যের বিবরণ ও খাদ্য সম্পর্কে তাঁহাদের বক্তব্য আছে। পিথাগোরাস, যিশু প্রভৃতি মহাত্মাগণ যে নিরামিষ আহার করিতেন লেখক তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ঔষধের পরিবর্তে আহার বা পথ্যের পরিবর্তন করিয়া আরোগ্যলাভের পদ্ধতি বিষয়ক কুহ্নে, ডাঃ এলিনসন, জস্ট প্রভৃতির বই পাঠ করিয়া গান্ধীজি প্রাকৃতিক চিকিৎসা বিষয়ে উৎসাহী হন।

বিলাতে থাকিতে থাকিতেই গান্ধীজি 'মুখ-সামুদ্রিক বিদ্যা'—অর্থাৎ মুখ দেখিয়া মানুষের মনের কথা জানিবার জ্ঞান সম্পর্কে কয়েকখানা পুস্তক পাঠ করেন। বিচিত্র বিষয়ে পড়াশুনা করিবার আগ্রহ গান্ধী-জীবনে শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। বিলাতে আহারতত্ত্ব, ভাষা শিক্ষা, ধর্ম চর্চা, প্রভৃতি বস্তুতঃ একই সময়ে গান্ধীজি করিতে থাকেন; ব্যারিষ্টারি পড়া তো ছিলই। থোরোর কোন কোন লেখার সহিত এই সময় তাঁহার পরিচয় ঘটে। যারবেদা জেলে (১৯৩২) তিনি গভীর অভিনিবেশ সহকারে জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা করিতেন। তখন তিনি মহাদেব দেশাইকে বলিয়াছিলেন :—জ্যোতিষ চর্চা বাস্তবিকই আমাদের দৃষ্টিকে উদার করে। "It broadens our outlook."

ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গান্ধীজি ফ্রেডারিক পিঙ্কটের সহিত দেখা করিতে যান। পিঙ্কট আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহাকে বলেন : "তোমার ব্যাধি আমি বুঝিয়াছি। তোমার সাধারণ পড়াশুনা খুব কম।...তুমি ভারতবর্ষের ইতিহাস পড় নাই। প্রত্যেক ভারতবাসীরই ভারতের ইতিহাস জানা আবশ্যক। তাঁহার নির্দেশে গান্ধীজি কে. ও. মলিসনের ১৮৫৭'র বিদ্রোহের ইতিহাস পড়েন। গীবনের 'ডিক্লাইন অ্যাণ্ড ফল অব রোমান এম্পায়ার' প্রভৃতি অন্যান্য ইতিহাসের বইও তিনি পরে পাঠ করিয়াছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থানকালে মহাত্মা গান্ধী ধর্ম ব্যাপারে বিশেষ সংকটে পড়েন। খ্রীষ্টান ধর্মযাজকগণ তাঁহাকে খ্রীষ্টধর্মের দিকে টানিতে চাহেন। মুসলমানেরা চাহিলেন তিনি মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করুন। কিন্তু গান্ধীজি সিদ্ধান্ত করেন ঃ "আমার নিজের ধর্ম যতদিন না সম্পূর্ণভাবে জানিতেছি ততদিন অন্য ধর্ম গ্রহণ করিবার কথা ভাবিব না।" তিনি পক্ষপাতশূন্য হইয়া সবকিছু পড়িবার ও জানিবার কার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন ঃ মিস্ হ্যারিস ও মিস্ গেবের আগ্রহাতিশয়ে প্রতি রবিবার তাঁহার অধীত পুস্তকাদি লইয়া তাঁহাদের সহিত আলোচনা করিতেন। কোটস্ নামক জনৈক কোয়েকার বন্ধুর আগ্রহেও গান্ধীজি বহু ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন। আত্মজীবনীর প্রথমখণ্ডে (বাংলা) ইহার উল্লেখ আছে। তখন তিনি ডাক্তার পার্কারের নীতিবর্ধক বই 'সিটি টেম্পলের টীকা', পিয়ারসনের 'মেনি ইনফলিবল প্রুফস্' ও বাটলারের 'এনালজি' পাঠ করেন। গান্ধীজির কথায় "বাটলারের 'এনালজি' খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং কঠিন বই। উহা বুঝিতে হইলে চার পাঁচবার পড়া দরকার। নাস্তিককে আস্তিক করিবার উদ্দেশ্যেই ইহা লিখিত।" কিন্তু বইটি যত্ন করিয়া পড়া সত্ত্বেও গান্ধীজির উপর তাহা বিশেষ কোন ছাপ রাখিতে পারে না। তিনি একান্তভাবে ভগবদ্বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু হিন্দুধর্মশাস্ত্রের সহিত নিবিড় পরিচয়েব অবকাশ ঘটে নাই বলিয়া মধ্যে মধ্যে তিনি ধর্মসংকটে পড়িতেন।

প্রিটোরিয়াতে থাকিবার সময় গান্ধীজি হিন্দুধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নে লিপ্ত হন। কবি রায়চাঁদ ভাই তাঁহার সংশয়াকুল চিত্তের কথা জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে কয়েকখানি শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠান। এই বইগুলির মধ্যে যোগবাশিষ্টের 'মুমুক্ষু প্রকরণ', হরিভদ্র সুরীর 'ষড় দর্শন সমুচ্চয়' ও 'পঞ্চীকরণ' 'মণিরত্নমালা' প্রভৃতি ছিল। হিন্দুধর্মশাস্ত্র পাঠের ফলে তাঁহার ধর্মবিশ্বাস দৃঢ় হয়। অন্যান্য ধর্মের গ্রন্থও তিনি অবশ্য পাঠ করিতে থাকেন। সেলের 'কোরানের' অনুবাদ তিনি এই সময় পড়েন। ধর্মবিষয়ক পুস্তকাদি পাঠ ও আলোচনার অবসরে তিনি

মহামতি টলষ্টয়ের 'দি কিংডম অব গড ইজ উইদিন ইউ' বইখানি পড়িয়া একেবারে অভিভূত হইয়া যান। আত্মজীবনীতে পাই: উহার ছাপ আমার হৃদয়ে বিশেষভাবে মুদ্রিত হইয়া গেল। এই পুস্তকের স্বাধীন চিন্তাধারা, প্রগাঢ় নীতিবোধ ও সত্যের উজ্জ্বল প্রকাশের মধ্যে তিনি যেন এতদিন যাহা ব্যাকুল হৃদয়ে অনুসন্ধান করিতেছিলেন তাহাই পাইলেন। তাঁহার অশান্তচিত্তে শান্তি আসিল। ইতিপূর্বে এডওয়ার্ড মেটল্যাণ্ডের 'দি নিউ ইনটারপ্রিটেশান অব বাইবেল', 'দি পারফেকট ওয়ে অর দি ফাইণ্ডিং অব ক্রাইস্ট' প্রভৃতি বই পাঠ করিয়া শান্তি পান নাই। এই স্থানে তিনি নর্মদাশঙ্করের 'ধর্মবিচার' ম্যাকস্‌মুলারের 'হিন্দুস্থান কি শিখাইতে পারে' (What Hindusthan can teach), থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি প্রকাশিত উপনিষদের অনুবাদ, ওয়াশিংটন আরভিং রচিত 'মহম্মদ চরিত', কার্লাইলের 'মহম্মদ স্তুতি' এমন কি জরথুস্ত্র-এর বচন ও আর্ণল্ডের 'লাইট অব এশিয়া' প্রভৃতি পাঠ করিবার অবকাশ পান।

দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর গান্ধীজি কিছুকাল গোখ্‌লের সহিত কলিকাতায় ছিলেন। তখন তিনি যে সকল পুস্তকাদি পাঠ করেন তাহার মধ্যে ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের কেশবচন্দ্র সেনের জীবনীর কথা তিনি আত্মজীবনীতে উল্লেখ করিয়াছেন। এই সময়েই তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজ ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বইপত্র পড়িয়া বুঝিতে চেষ্টা করেন। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ, ভগিনী নিবেদিতা প্রমুখ মনিষীদের রচনা অল্প কিছু তিনি পরে পড়েন। বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' গান্ধীজি যত্নের সহিত পাঠ করেন। একই সঙ্গে মতিলাল নভুর 'রাজযোগ'ও পড়িয়া ফেলেন। গান্ধীজি একদা 'জিজ্ঞাসু মণ্ডল' নামে একটি ছোট্ট মণ্ডলী গঠন করিয়া ধর্মসংক্রান্ত পুস্তকাদি সমবেত পাঠের আয়োজন করেন। এই মণ্ডলীতেই পতঞ্জলির 'যোগ দর্শন' তিনি পড়িয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

গান্ধীজি সপরিবারে যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় বাস করিতেছিলেন তখন

আসন্নপ্রসবা কস্তুর বাঈকে সাহায্য করিতে পারেন এমন কোন আত্মীয়া সেখানে ছিলেন না। তৎকালীন অবস্থায় ইংরেজদের সাহায্য গ্রহণ করা জাতীয় সম্মানের পরিপন্থী বলিয়া গান্ধীজি মনে করেন। সুতরাং তিনি নিজেই ধাত্রী-বিদ্যার বই পড়িতে সুরু করিলেন। আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন "ডাক্তার ত্রিভুবন দাসের 'মায়ের জন্য উপদেশ' নামক পুস্তক পড়িলাম। সেই বই পড়িয়া এবং এ-দিক সে-দিক হইতে যাহা শিখিয়াছিলাম তাহার সাহায্যেই আমি দুইটি শিশুকে আঁতুড়ে সাহায্য করিয়াছিলাম বলা যায়।"

মহাত্মা গান্ধী চিকিৎসা করিতে ভালবাসিতেন। অতএব চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কিছু বই যে তিনি অবশ্যই পড়িয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ কি। একদা তিনি কস্তুরবার কঠিন পীড়ায় জল-চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। রোগ নিরাময় হইতেছে না দেখিয়া তিনি ডাল ও নূন আহার বন্ধ করিতে নির্দেশ দিলেন। কস্তুরবা ইহাতে রাজি হইতেছেন না দেখিয়া স্বীয় বক্তব্যের সমর্থনে একখানা বই আনিয়া তাঁহাকে পড়িয়া শোনান। কস্তুরবার সহিত সমবেত কণ্ঠে কবিতা পাঠ এবং তাঁহাকে ধর্মগ্রন্থ পড়িয়া শোনানোর কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে। দক্ষিণ-আফ্রিকাতেই গান্ধীজি ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ করেন। বিস্তর পড়াশুনার ফলেই তাঁহার হৃদয়ে এই ব্রত গ্রহণের বাসনা জাগ্রত হয়। জীবনযাত্রা সরল করিবার দিকে তাঁহার আগ্রহ সর্বজনবিদিত। দক্ষিণ-আফ্রিকায় ইহার সূচনা। এই সময়ে তিনি নিজের জামা কাপড় নিজে কাচিতে সুরু করেন। ধোপার বিদ্যা তিনি আয়ত্ত করেন। বই পড়িয়া ধোপাগিরি তিনি মন্দ শেখেন নাই। একদা দক্ষিণ-আফ্রিকায় গান্ধীজি গোখলের একখানি উত্তরীয় ইস্ত্রি করিয়া দিয়াছিলেন এ কথা আনন্দমিশ্রিত গর্বের সঙ্গেই আত্মজীবনীতে উল্লিখিত হইয়াছে।

পুঁথিগত বিদ্যার প্রতি গান্ধীজির আস্থা কম ছিল। তিনি নিতান্ত প্রতিকূল সমালোচনা সত্ত্বেও পুত্রদের বইপড়া বিদ্যা শিক্ষার দিকে উৎসাহী হন নাই। গান্ধীজি লিখিতেছেন "আমার পুত্রেরা পুস্তকের বিদ্যায়

কাঁচা রহিয়াছে।" কিন্তু তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল, সে জন্য দেশের কিছু লাভ হইয়াছে। স্বীয় বিদ্যার্থী-জীবনের স্মৃতি রোমন্থন করিয়া তিনি লিখিয়াছেন: "আমার শিক্ষকেরা পুস্তক হইতে আমাকে যাহা শিখাইয়াছিলেন তাহা সামান্যই আমার মনে আছে। কিন্তু বই ছাড়া যাহা শিখাইয়াছেন তাহার এতটুকুও ভুলিয়া যাই নাই।" বইয়ের বিদ্যায় গান্ধীজির এই অনীহা সত্ত্বেও আমরা দেখিয়াছি তিনি নানা বিষয়ে গভীর অধ্যয়ন করিয়াছেন। এবং অধ্যয়নের দ্বারা তিনি অল্প বিস্তর প্রভাবিত হইয়াছেন। কেবল নিজেই পড়েন নাই। ভাল কিছু পড়িলে অপরকে তাহা পড়িবার জন্য বলিতেন। যারবেদা জেলে **Adam's Peak to Elephanta** এবং মিথিলা শরণের 'অনঘ' তিনি মহাদেব দেশাইকে পড়িতে বলিয়াছিলেন। অপব দিকে মহাদেব ভাই লিখিয়াছেন একদা আলোচনা প্রসঙ্গে গান্ধীজি গুজরাটী উপন্যাস হইতে বাক্যাংশ উদ্ধৃত করেন। ইহা হইতে অনুমান কবা যায়, অল্প হইলেও তিনি উপন্যাস পাঠ বর্জন করেন নাই।

এখন যে পুস্তকখানির কথা আমরা আলোচনা কবিব সে সম্পর্কে গান্ধীজি আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন—"এইখানাই আমার জীবনে মহত্ত্বপূর্ণ পথ গ্রহণ করিবার উপযুক্ত পরির্তন আনিয়া দিয়াছিল। আমার হৃদয়ে যে গভীর বিশ্বাস নিহিত ছিল আমি তাহারই কতকগুলি প্রতিবিম্ব এই বইখানিতে দেখিতে পাইলাম।" গান্ধীজি বলিয়াছেন "সব কবি সকলের উপর সমান প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন না, কেননা সকলের ভাবনা একরকমে গঠিত নয়।' গান্ধী জীবন ও কর্মসাধনার ক্ষেত্রে এই বইখানি বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। পুস্তকখানি হইল রাস্‌কীনের 'আন্ টু দিস লাষ্ট'। গান্ধীজি 'সর্বোদয়' নাম দিয়া একখানি গুজরাটী অনুবাদ প্রকাশিত করেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে যে, সর্বোদয় প্রকাশের পূর্বেই তিনি আর একটি অনুবাদের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। প্লেটোর 'দি অ্যাপোলজির' সার সংক্ষেপ করিয়া তিনি তাঁহার 'ইণ্ডিয়ান ওপিনীয়ন'

পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। মানুষ হিসাবে আমাদের কর্তব্য কি তাহাই ছিল ইহার মূল কথা। দক্ষিণ আফ্রিকায় নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও সর্বোদয়ের আদর্শে গান্ধীজি একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। রাসকীন যে ভারতবর্ষে দূর্লভখ্যাতির অধিকারী হইয়াছেন তাহার মূলে মহাত্মা গান্ধীর প্রযত্ন স্মরণীয়।

'আন টু দিস লাস্ট' এর গুজরাটী অনুবাদের নাম 'সর্বোদয়' তাহা একটু আগেই বলিয়াছি। সর্বোদয়ের সিদ্ধান্ত ঃ

১। সকলের হিতে নিজের হিত নিহিত।

২। উকিল ও নাপিতের কাজের মূল্য একই রকম হওয়া চাই। কেননা জীবিকা উপার্জনের অধিকার উভয়ের সমান।

৩। শ্রমিক ও কৃষকের জীবনই আদর্শ জীবন।

নাটাল যাইবার পথে পড়িবার জন্য বন্ধু পোলক সাহেব গান্ধীজিকে এই বইখানি উপহার দেন। দৈবক্রমে হাতে আসা বইখানি গান্ধী-জীবনের আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়া দিল। গাড়িতেই তিনি বইখানি পড়িয়া অভিভূত হইয়া পড়েন এবং "পুস্তকে লিপিবদ্ধ নির্দেশ অনুযায়ী আচরণ করিতে কৃতনিশ্চয়" হন।

যারবেদা জেলে আটক থাকিবার সময় রাসকীনের অপর বিখ্যাত বই **Fors Clavigera** বা হাতুড়িপেটা শক্তি মহাত্মা গান্ধী পাঠ করিবার সুযোগ পান 'গান্ধীজির জীবন ও দর্শন' প্রবন্ধে (রবীন্দ্রভারতী প্রকাশিত 'গান্ধীমানস') অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন লিখিয়াছেন—"গান্ধীজি রামরাজ্যের সমর্থন পেয়েছেন রাস্‌কীনের **Fors Clavigera**তে।" এই বইয়ের আলোচনার ভিত্তিতে গান্ধীজির **Indian Home Rule** রচিত বলিয়া মনে হয়।

জেলই গান্ধীজির বই পড়ার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র ছিল তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। যারবেদা জেলে গান্ধীজির পড়াশুনার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়, মহাদেব ভাইয়ের দিনলিপিতে। কত বিচিত্র বিষয়ের প্রতি গান্ধীজির আকর্ষণ ছিল তাহা বুঝাইবার জন্য যারবেদা জেলে

পঠিত কয়েকখানা পুস্তকের নামমাত্র উল্লেখ করিতেছি। Upton Sinclair-এর সামাজিক অনিষ্টকর বিষয়ের উপর লিখিত The Wate Parade ; প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সময়ে Sir Samuel Hoare-এর রাশিয়ার অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ বিখ্যাত বই - The Fourth Seal , Munder-এর Astronomy Without a Teliscope ; Gibbon-এর বিশ্ববিখ্যাত বই Decline and Fall of Roman Empire ; Woodroffe এর একটি অশ্লীল (?) বই ; কীর্তিকারের—Studies in Vedanta ; বিড়লাব—Indian Currency, Goetheএর—Faust Kingsley'র —Westward Ho ! ইহা ছাড়া এই বন্দীশালায় কয়েকখানি উর্দ্দু পাঠ্যপুস্তকও তিনি বিশেষ গুরুত্বেব সহিত পাঠ কবেন। ঐ বইগুলির দ্বারা সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ানো হইতেছিল। মহাদেব দেশাইয়ের দিনলিপি হইতে জানা যায় জেলেই গান্ধীজি উর্দ্দু, জ্যোর্তিবিদ্যা এবং কারেন্সির উপর এত বই সংগ্রহ করিয়াছিলেন যে, তাহাই একটি পাঠাগার হইয়া উঠিয়াছিল। এইখানেই তিনি নানা ভাষ্যে ঈশোপনিষদও যত্নের সহিত পাঠ করিতেন।

একটিমাত্র প্রবন্ধের পরিসরে গান্ধীজিব বই পড়া বিষয়ে উপযুক্ত আলোচনা অসম্ভব। আমি কেবলমাত্র পাঠকের মনোযোগটিকে গান্ধীজিব বিপুল ও বিচিত্র পড়াশুনার প্রতি আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিলাম। পড়াশুনা, জীবনভোর সৎগ্রন্থ পাঠ ও আলোচনা ভিন্ন বড় হইবার আর কোন উপায় নাই বলিয়া মনে হয়।

মানবজীবন হইতে শিক্ষাগ্রহণটা কি তাহা সচরাচর বুঝা সুসাধ্য নহে। তবে মানুষকে বুঝিতে জানিতে তাঁহার চিঠিগুলি গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া স্বীকৃত। প্রতিদিন শতশত চিঠি গান্ধীজির নিকট আসিত। তাহার প্রায় প্রত্যেকটির তিনি উত্তর দিতেন। একসময়ে সত্তর-আশিখানা চিঠি কখন কখন তিনি প্রত্যহ নিজ হাতে লিখিয়াছেন।

তাঁহার প্রাপ্ত পত্রের দৈর্ঘ এবং পত্রাদির সহিত প্রেরিত সংবাদ-পত্রাদির ক্লীপিং কম দিল না। একস্থানে মীরাবেনের পঁচিশ পৃষ্ঠাব্যাপী

চিঠির উল্লেখ পাইয়াছি। গান্ধীজির চিঠিও অনেক সময় খুব দীর্ঘ হইত। ল্যুই ফিশার বলিয়াছেন Gandhi wrote long letters, some of which were pamphlet length। প্রয়োজনেই গান্ধীজি দীর্ঘ চিঠি লিখিতেন। কিন্তু তাহার মধ্যে একটিও অবান্তর কথা থাকিত না বলিলেই চলে। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রাক্কালে বড়লাট আরউইনকে লেখা চিঠির কথা আমরা অনেকেই স্মরণ করিতে পারি। তাঁহার চিঠির ভাষা সুন্দর ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট এবং তথ্যনির্ভর হইত। চিঠিকে তথ্য নির্ভর করিতেও তাঁহাকে বিস্তর বই-পত্র-পত্রিকা যে পড়িতে হইত তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রবন্ধ-নিবন্ধ-টীকা-টিপ্পনী যে তিনি কত লিখিয়াছেন তাহা ইয়ত্তা করা যায় না।

গুজরাটী মহাত্মার মাতৃভাষা। দেশের স্কুলে ইংরাজি এবং লণ্ডনে অবস্থানকালে লাটিন ভাষা তিনি শেখেন। দেশে ফিরিয়া হিন্দী, উর্দু ও তামিল ভাষাও তিনি শিক্ষা করেন। গান্ধীজি জীবনসায়াহ্নে বাঙলা শিখিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি বাঙলা সামান্য লিখিতে ও পড়িতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বাঙলা ভাষায় রচিত গান্ধীজির চিঠিপত্র অপরে লিখিয়া দিতেন। উপরের পাঠটুকু তিনি নিজহাতে বাঙলায় লিখিয়া বাঙলাতেই নাম সহি করিতেন।

প্রবন্ধ শেষ করিবার পূর্বে গান্ধীজির পুস্তক নির্বাচন বিষয়ে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজনীয় বোধ হইতেছে মহাত্মা গান্ধী হাতের নিকট যাহা পাইতেন সাধারণত তাহাই পড়িতেন। কিশোর বয়সে গান্ধীজির বিবাহ হয়। সে সময় 'দম্পতি প্রেম', 'মিতব্যয়িতা', 'বাল্যবিবাহ', প্রভৃতি পুস্তিকা তিনি পড়েন। গান্ধীজি লিখিতেছেন ঃ "এই ধরণের কোন নিবন্ধ আমার হাতে আসিলেই আমি পড়িয়া ফেলিতাম। আমার অভ্যাস ছিল যে, যাহা পড়ি তাহার মধ্যে যাহা ভাল না লাগে তাহা ভুলিয়া যাই। আর যাহা ভাল লাগে তাহা কার্যে পরিণত করার চেষ্টা করি।" প্রয়োজনবোধে মধ্যপথেও পাঠ করা বন্ধ করিয়া দিতেন। Woodroffe-এর একখানা বইয়ের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে।

ইন্দুলাল যাজ্ঞিক একখানি বই গান্ধীজিকে পড়িতে দেন। কিয়ৎদূর অগ্রসর হইবার পর গান্ধীজি উহা পাঠ করা সমীচীন মনে করেন নাই। তখনই উহা বন্ধ করেন। ভাল বইয়ের কথা শুনিলে তাহা চেষ্টা করিয়া সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিতেন। মহাদেব ভাইয়ের দিনলিপি হইতে ইহা জানা যায়। জেলের গ্রন্থাগারের বইপত্রের তিনি খোঁজ করিতেন। এইভাবে রোমাঁ র‍্যলাঁর রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ জীবনী, Imitation of Christ, জেমস্ জীনসের বই প্রভৃতি তিনি খুঁজিয়া পাতিয়া আনিয়া পড়েন বলিয়া জানা যায়। এ কথা কে অস্বীকার করিবে যে গান্ধীজির জ্ঞানস্পৃহা ছিল অনন্যসাধারণ এবং পুস্তক পাঠের মধ্যে তাহা তৃপ্তি খুঁজিত বলিলে অন্যায় বা অসত্য বলা হইবে না।

দক্ষিণ আফ্রিকার কারা গ্রন্থাগার হইতে গান্ধীজি হেনরি ডেভিড থোরোর প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ Civil Disobedience সংগ্রহ করিয়া পড়েন। ঐ দেশের কারাগারেই তিনি কার্লাইলের French Revolution পাঠ করেন। কত বিচিত্র বিষয়ে তাঁহার অনুরাগ ছিল! জেল হইতে পুত্রকে লিখিত চিঠিতে অনুবোধ করিতেছেন: একখানা বীজগণিত পাঠাইও। যে কোন বই হইলেই চলিবে। সংস্কৃত ও অঙ্ক শেখা তিনি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিতেন।

নূতনকে জানিবার আগ্রহেই তিনি অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর নিকট ফ্রয়েডীয় দর্শন সম্পর্কে জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি কার্ল মার্কসের 'ক্যাপিটাল' এবং বিপ্লবোত্তর রাশিয়া সম্পর্কে কিছু বইপত্র পড়েন। বিশ্ববিশ্রুত বই ক্যাপিটাল পড়িবার পর গান্ধীজির মন্তব্যটি চমৎকার:

"I think I could have written it better, assuming, of course, that I had the leisure for the study he has put in."

গান্ধী মার্কসের মত পড়াশুনা করিবার অবসর পাইলে মার্কস্ যাহা লিখিয়াছেন তদপেক্ষা সুন্দর বা নিপুণভাবে তাহা তিনি লিখিতে

পারিতেন। মার্কস এবং গান্ধী কোনদিন কোন রাষ্ট্রের কর্ণধার হন নাই, অথচ উভয়েই সর্বাধিক আলোচিত, বিতর্কিত মানুষ · যুগ মানব।

শুধু পড়া নয়। অধীত বিদ্যাকে প্রয়োগ করিবার কৌশল জানাকে গান্ধীজি প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিয়াছেন। পূর্বে এ বিষয়ে গান্ধীজির একটি ছোট মন্তব্য আমরা পাইয়াছি। কিশোরলালজির নিকট লিখিত একটি চিঠিতেও (১-৭-১৯৩২) গান্ধীজি এই সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন ঃ

"To my mind there is one think needful for every one of us—viz that we should thing over what we have read, digest it and make it an integral part of our daily life.

ইহাই তো অধ্যয়নের সত্যকার কাম্য ফলশ্রুতি। আবার বইতে লেখা আছে বলিয়া সবকিছু বেদবাক্যের মত মানিবার মূঢ়তা সম্পর্কে তিনি আমাদেব সাবধান করিয়া দিয়াছেন।

"Every thing written in books must not be considered authentic. Anything that is immoral or inhuman must not be believed no matter in what sacred book it occurs.

অর্থাৎ পবিত্রগ্রন্থেও নীতিহীন এবং অমানবীয় কিছু মুদ্রিত থাকিলে তাহা বিশ্বাস করিবার দরকার নাই। গান্ধীজি যন্ত্রদানবের নিকট 'নমো যন্ত্র' বলিয়া যোড়করে দাঁড়ান নাই, আবার 'নমো-গ্রন্থ' বলিয়া গ্রন্থ-কীট হ'ন নাই। নিজের বিবেকবুদ্ধি নীতি ও মনুষ্যত্ব-বোধের ক্ষেত্রে যেখানে বিরোধ ঘটিয়াছে সেখানে গান্ধীজি আপোষ করেন নাই। তিনি স্বীয় জীবনের ন্যায় নীতি ও সত্যবোধের আলোকে দশদিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া চলিতেন। অবশ্য তিনি স্বাভাবিক বিনয়ের সহিত সর্ব্বদাই বলিয়াছেন ঃ "নূতন কোন নীতি বা মতবাদ সৃষ্টি করিয়াছি ইহা আমি দাবি করি না।" ইহা সত্ত্বেও হিংসাজর্জর

সংশয়বিদ্ধ পৃথিবীতে প্রতিদিনকার ক্ষুদ্র বৃহৎ সামান্য অসামান্য প্রয়োজন মিটাইবার একটা নূতন কল্যাণময় মানবিক পথের সন্ধান তিনি দিয়া গিয়াছেন। এই পথ নির্ণয়ে ও সেই পথে চলিতে বই পড়া জ্ঞান তাঁহাকে অনেকখানি সাহায্য করিয়াছিল বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে কি? গান্ধীজির বই পড়ার উপরে অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনের একটি মনোরম মন্তব্য উল্লেখ করিয়া আজিকার আলোচনা শেষ করি। "শাস্ত্র তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে, দেশ বিদেশের মনীষীদের লেখা তিনি পড়েছেন; তাঁর নিজের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও সত্যনিষ্ঠা তাঁকে পরিচালিত করেছে; বইপড়া জ্ঞান নয়। আবার বই না-পড়া জ্ঞানও নয়।"

—:০:—

সর্বোদয় সাহিত্য

১।	আমার জীবন কাহিনী (২য় সং) গান্ধীজি	৩·০০
২।	পরমবান্ধব রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী	১·০০
৩।	আচার্য বিনোবা (২য় সং)	২·৫০
৪।	মিঠেকড়া (ছোট গল্প)	২·৭৫
৫।	মুক্তির আনন্দ (শিশুনাটিকা)	০·৭৫
৬।	শিশুদের গান	·৪০
৭।	গীতা প্রবচন (৬ষ্ঠ সং) বিনোবা	২·০০
৮।	কোরান সার (বিনোবা)	১·৫০
৯।	আমাদের জাতীয় শিক্ষা	৪·৫০
১০।	মহাজীবন (গীতি নাট্য)	১·০০
১১।	জীবনব্রত ও নীতি ধর্ম (গান্ধীজি	১·০০
১২।	ঈশাবাস্য বৃত্তি (বিনোবা)	১·৫০

আমাদের ভাষা শিক্ষার বই

1.	Learn Bengali Yourself	3·50
2.	„ Hindi „	3·50
3.	Nepali Self-taught	3·80
4.	Assamese Self-taught	3·50
5.	Oriya Self-taught	3·50
6.	Marathi Self-taught	3·50
7.	Punjabi Self-taught	3·50
8.	রাষ্ট্রভাষা প্রবেশ (বাংলা মাধ্যমে)	2·80
9.	„ „ (অসমীয়া „)	2·50
10.	বাংলা ভাষা প্রবেশ (হিন্দী মাধ্যমে)	2·00
11.	„ „ (মারাঠী „)	2·00
12.	„ „ (গুজরাটী „)	2·00
13.	„ „ (নেপালী „)	2·00
14.	অসমীয়া পরিচয় (হিন্দী মাধ্যমে)	2·00
15.	হিন্দী-বাংলা-ইংরাজী-অসমীয়া শব্দবোধ	1·00
16.	প্রারম্ভিক হিন্দী শিক্ষা (বাংলা মাধ্যমে)	0·50
17.	„ „ (অসমীয়া মাধ্যমে)	0·50
18.	প্রারম্ভিক বাংলা শিক্ষা (হিন্দী মাধ্যমে)	0·50
19.	উচ্চতর হিন্দী ব্যাকরণ ও রচনা	3·50
20.	Hindi writing Book	0·60
21.	বাংলা সাহিত্য পাঠ (তিন ভাগ)	
22.	রাষ্ট্রভাষা পাঠমালা (পাঁচ ভাগ)	